যাহাদের জন্য এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে
সেই স্নেহের ছাত্র-ছাত্রীদের
কর-কমলে ইহা
সাদরে অর্পিত
হইল।

ভূমিকা

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আমি অনুভব করিয়াছি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা কিভাবে কার্যকরী হয় তাহা শিক্ষার্থীরা আশানুরূপভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহারা মনোবিদ্যার নানা তত্ত্ব ও তথ্য পড়ে এবং অনেক সময় আয়ত্তও করে কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠ ও কাজে ঐ জ্ঞানের সঞ্চালন (transfer) হয় না। ফলে মনোবিদ্যার জ্ঞান তাত্ত্বিক কোঠাতেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরীক্ষার খাতাতেই উহার কার্যকারীতা শেষ হইয়া যায়। কয়েকজন মেধাবী শিক্ষার্থী হয়ত শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার তাৎপর্য ন্যূনাধিক বুঝিতে পারে কিন্তু অনেকেই মনোবিদ্যাকে দৈনন্দিন শিক্ষার কার্য হইতে আলাদা রাখে। বংশগতি, পরিবেশ, সহজাত প্রবৃত্তি, শিক্ষার সূত্র ইত্যাদি বহু জিনিষ শিক্ষার্থীদের জানিতে হয় কিন্তু এইগুলি জানিবার যাহা আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিশু ও তাহার শিক্ষার প্রণালীকে জানিয়া বিদ্যালয়ের ও শ্রেণীর কার্যক্রম সংগঠন করা, উপযোগী পদ্ধতি উদ্ভাবন করা এবং ব্যক্তিগত বিকাশে সহায়তা করা, তাহা সিদ্ধ হয় না। এই অবস্থার নিরসন করিতে হইলে শিক্ষায় মনোবিদ্যার প্রয়োগকে আরও বিশদ বর্ণনার দ্বারা শিক্ষার্থীদের বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং শিক্ষার পরিস্থিতিতে তাহাদিগকে সজ্ঞানে ইহার অনুশীলন ও উপলব্ধি করিতে হইবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তত্ত্ব অপেক্ষা প্রয়োগের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য স্বীকৃততত্ত্ব ও প্রমাণসিদ্ধ সিদ্ধান্তগুলি সাধারণ শিক্ষক শিক্ষিকার উপযোগী করিয়া বুঝান হইয়াছে এবং সেইগুলি হইতে প্রয়োগ যতদূর অনুসৃত হইতে পারে তাহাই করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ পরীক্ষাগুলির সবিস্তার বর্ণনা মূল পাঠ্যাংশে দেওয়া হয় নাই। সাধারণ শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেশী প্রয়োজন পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত ও সূত্রগুলির সহিত। তত্ত্ব ও গবেষণার বিশদ বিবরণ তাহাদের খুব বেশী কাজে লাগে বলিয়া আমার মনে হয় না। বরং সিদ্ধান্ত ও সূত্রগুলি কিভাবে শিক্ষায় প্রযুক্ত হয় বা শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং শিক্ষার কাজে সাহায্য করে—এই জ্ঞানই

তাহাদের পক্ষে বেশী উপকারী। সেইরূপ, বৈজ্ঞানিকদের নাম মুখস্থ করায় হয়ত পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু বিশেষ কোন কাজে আসে না। শিক্ষক শিক্ষিকার সময় খুব কম; তাহাদের পক্ষে মনোবিদ্যা কার্যকরী হইলেই হিতকর হয়। এইসব বিষয় মনে রাখিয়া বইটি লেখা হইয়াছে।

শিশু সমীক্ষা ও মনোবিদ্যার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। দুইটি বিষয় দুইটি পুস্তকে না লিখিয়া একই পুস্তকের অন্তর্গত করা হইয়াছে কারণ শিক্ষক শিক্ষিকার একই পরিপ্রেক্ষিতে 'শিক্ষায় শিশু সমীক্ষা ও মনোবিদ্যাকে' প্রত্যক্ষ করা দরকার। ইহারা স্বতন্ত্র হইয়া গেলে শিশু পর্যবেক্ষণ গতানুগতিক ও যান্ত্রিক হইয়া যায়, শিক্ষার কার্যে বিশেষ সহায়ক হইয়া উঠে না।

বইটির ভাষা যতদূর সম্ভব সরল ও প্রাঞ্জল রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। আশাকরি প্রবেশিকা অবধি যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে বইটি পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা বাংলা বই পড়িতে চান প্রধানতঃ তাঁহাদের জন্যই বইটি লেখা হইয়াছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপিকা রুথ ষ্ট্রাং (Dr. Ruth Strang) এবং অধ্যাপক জারশিল্ড (Jersild) এর স্নেহচ্ছায়ায় বসিয়া শিশু সমীক্ষা ও শিশু মনোবিদ্যার পাঠ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেইজন্য শিশু সমীক্ষা সম্বন্ধে আমার লেখার উপর তাঁহাদের যে কল্যাণকর প্রভাব থাকিবে তাহা স্বাভাবিক।

পিতামাতা ও কৌতূহলী সাধারণ পাঠকপাঠিকা ছাড়াও নিম্ন-বুনিয়াদী, উচ্চ-বুনিয়াদী ও স্নাতকোত্তর-বুনিয়াদী মহাবিদ্যালয়সমূহের এবং বি. টি. ও বি. এড. কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা এই বই হইতে সাহায্য পাইবেন আশা করি। নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত শিশু সমীক্ষা ও শিক্ষা মনোবিদ্যার যাবতীয় প্রসঙ্গই এই পুস্তকের মধ্যে আছে।

পুস্তকের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় অনবধানতাবশতঃ "শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কয়েক পৃষ্ঠা" এই নাম মুদ্রিত হইয়াছে। আশা করি পাঠক পাঠিকারা ভুলটিকে ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন। তাড়াতাড়িতে সম্পূর্ণ পুস্তকটি প্রকাশ করা গেল না। প্রথম ভাগ বাহির হইল, দ্বিতীয় ভাগ শীঘ্রই বাহির হইবে।

পুস্তক লেখায় আমার উৎসাহদাতা আমার অসংখ্য ছাত্রছাত্রী। আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান শান্তি রঞ্জন সান্যালের প্রেরণা ও অক্লান্ত ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পাইলে এই পুস্তক প্রকাশ করা আদৌ সম্ভব হইত না। সে আমার পাণ্ডুলিপি পড়িয়া, প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়া ও নানাভাবে সাহায্য করিয়া আমায় চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছে। বহু ইংরাজি পুস্তক ছাড়াও কয়েকটি বাংলা পুস্তক হইতে বিশেষ করিয়া শ্রীঅরুণ ঘোষ এবং শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ ও শ্রীমতী শান্তি দত্তের পুস্তক হইতে পরিভাষা ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি। তাড়াতাড়িতে বানান ও ব্যাকরণের কিছু ভুল থাকিয়া গেল, পরবর্তী মুদ্রণে ভুলগুলি সংশোধন করা হইবে।

১৬ই জুলাই, ১৯৬২
স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী মহাবিদ্যালয়,
বাণীপুর,
পোঃ অঃ বৈগাছী, ২৪ পরগণা।

রণজিৎ দে

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—আগ্রহ ও মনোযোগ

দ্বিতীয় অধ্যায়—বুদ্ধি

তৃতীয় অধ্যায়—সামাজিক অভিযোজন ও আচরণ সমস্যা

প্রাক বিদ্যালয় শিশুদের আচরণ সমস্যা

আক্রমণাত্মক আচরণ।

ইহার প্রকৃতি—শিশুদের মধ্যে কিভাবে ইহা প্রকাশ পায় —সমাধানের উপায়।

ক্রোধোন্মত্ততা — বায়না — অতিরিক্ত ক্রন্দন — শয্যা-মূত্র।

অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা।

গৃহে শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত—শিশু ও বয়স্কদের শৃঙ্খলার উপলব্ধি—আত্মনিয়ন্ত্রণ কিরূপে সৃষ্টি করিতে হয়—সমস্যার বিশ্লেষণ —শাস্তি বনাম পিতামাতা—শিশু সম্পর্ক—শাস্তির পরিণাম —পুরস্কারের পরিণাম।

আঙ্গুল চোষা — ভ্রাতা ভগ্নীর প্রতি ঈর্ষা — সমাজ হইতে সরিয়া আসা—শিশুরা কি করিয়া তাহাদের সমস্যা সমাধান করে।

নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের আচরণ সমস্যা

আচরণ সমস্যার প্রকৃতি—আচরণ সমস্যার কারণ।

সমস্যামূলক আচরণকে অভিপ্রেত বৃদ্ধি ও বিকাশের দিকে লইয়া যাওয়া।

বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি ও বিলম্বে আসা—ইহার কারণ—সমস্যা সমাধানের উপায়—শৃঙ্খলা—সামাজিক অভিযোজন —স্বাস্থ্য।

খাওয়া লইয়া সমস্যা—ক্লান্তি—দুর্ঘটনা ও রোগ—চক্ষুর কষ্ট।

তোৎলামী।

প্রাক্-কৈশোর বালকবালিকাদের আচরণ সমস্যা

সমস্যার প্রকার—আচরণ সমস্যার কারণ।

দৈহিক কারণ—বিদ্যালয়ে অসাফল্য—পিতামাতার মনোভাবের প্রভাব—সামাজিক সম্বন্ধ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা —বিদ্যালয়ের বাহিরের প্রভাব—সমস্যার বহু কারণ।

সমস্যা সমাধানের উপায়।

প্রথম অধ্যায়

শিশু পর্যবেক্ষণ

শিশু মনোবিদ্যা পাঠ করিবার প্রয়োজনীয়তা।

আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি শিশুকেন্দ্রিক। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দানে বিশ্বাসী সকল শিক্ষাব্রতী স্বীকার করেন যে, কেবলমাত্র বিষয়ের জ্ঞানই শিক্ষকের পক্ষে যথেষ্ট নহে, যে শিশুদের তিনি শিখাইবেন তাহাদের সম্বন্ধেও সম্যক জ্ঞান তাঁহার থাকা অপরিহার্য। শিক্ষক এই জ্ঞান শিশু-মনোবিদ্যা অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া লাভ করিতে পারেন।

শিশু মনোবিদ্যার পুস্তক পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষককে শিশু পর্যবেক্ষণেও দক্ষ হইতে হইবে। পুস্তকের অধীত জ্ঞানকে একদিকে যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইতে হইবে অন্যদিকে যাহা শুধু চোখে দেখিয়া বুঝা যাইতেছে না তাহার সত্য ব্যাখ্যা পুস্তকে খুঁজিতে হইবে। এইরূপে নিজের অভিজ্ঞতা এবং পুস্তকের জ্ঞানকে মিলাইয়া লইতে পারিলে ক্রমে ক্রমে শিশুদের আচরণের রহস্য বোধগম্য হইতে থাকে।

শিশুকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিবার নাম 'শিশু পর্যবেক্ষণ'। শিশুর দেহ ও মন বাড়ন্ত। সে একভাবে থাকে না। এই বাড়ার যে ধরণ বা ধাঁচ (pattern) শিশু পর্যবেক্ষণের তাহাই হইতেছে মূল লক্ষ্য। দেখা গিয়াছে এই ধরণ প্রত্যেক শিশুর পক্ষে বিভিন্ন। শরীর ও মনের বৃদ্ধি ও বিকাশ সমস্ত শিশুর একরকম ভাবে হয় না—প্রত্যেকে তাহার নিজস্ব ভঙ্গীতে ও ছন্দে বিকশিত হইয়া উঠে। ব্যক্তিগত বিকাশের যে স্বাতন্ত্র্য তাহা শিশুমনোবিদ্যার একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। শিশু পর্যবেক্ষণের দ্বারা শিশুর বিকাশের স্বতন্ত্র ধারাকে লইয়া পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষক তাহার সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে সহজ, স্বাভাবিক ও অনায়াস করিতে পারেন।

শিশু পর্যবেক্ষণে মনোবিদদের লক্ষ্য প্রধানতঃ শিশুর বিকাশের

ধারা, বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আচরণের পরিবর্তন অধ্যয়ন করিয়া সেগুলির সমানীকরণ (generalization) করা ও সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা এবং ইহার সাহায্যে বয়স্ক লোকের আচরণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা। কিন্তু শিক্ষকের লক্ষ্য শিশুদের শিক্ষাদানে সাহায্য করা। সেইজন্য শিশু পর্যবেক্ষণের দ্বারা তিনি বুঝিতে চেষ্টা করেন বিকাশের বিভিন্ন স্তর এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বিদ্যালয়ের কার্যক্রম কিরূপ রাখিতে হইবে, শিক্ষাদান পদ্ধতি কি ধরণের হইবে এবং পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষোপকরণ কিভাবে নির্বাচন করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে শিশু পর্যবেক্ষণ ও শিশু সহায়তা (child guidance) ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধযুক্ত। শিশু পর্যবেক্ষণের দ্বারা সমস্ত রকম শিশুদের উপযোগী করিয়া বিদ্যালয়ের কার্যক্রম (curriculum) গঠিত হয়। ইহার মধ্যে শিল্প কাজ, হাতের কাজ, সঙ্গীত ও চিত্রকলা, খেলাধূলা, উৎসব অনুষ্ঠান এবং পাঠ্যপুস্তক, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণ ইত্যাদির সমাবেশ করা হয়। শিশুসহায়ক বিশেষ শিশুর পরিপক্কতা (maturity), সামর্থ্য ও আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের বিবিধ কাজ ও পাঠ্যসূচী হইতে তাহার উপযোগী কাজ ও পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করিতে সাহায্য করেন। এই ব্যাপারে শিশুকে তিনি প্রত্যক্ষ নির্দেশ না দিয়া নিজের চেষ্টাতেই তাহার শক্তি সামর্থ ও অনুরাগ বিরাগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে উৎসাহ দেন এবং যতদূর সম্ভব তাহার সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ী কাজ ও পড়াশুনা স্বাধীনভাবে পছন্দ করিতে দেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে শিশু সহায়তা শিশু পর্যবেক্ষণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

শিশু পর্যবেক্ষণ অস্বাভাবিক ও অপরাধমূলক আচরণের উৎপত্তি ও কারণ নির্ণয়ে সাহায্য করে। শিশুদের মধ্যে যে দুষ্ক্রিয় আচরণ দেখা যায়, তাহার সফল সামাধান পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে।

শিশু পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে শিক্ষক নিজের শৈশবের কথা স্মরণ করিতে পারেন এবং ক্রমশঃ তিনি নিজেকেও ভাল ভাবে বুঝিতে পারেন এবং তাহার ফলে তিনি শিশুদের সহিত যেইরূপ মনোভাব পোষণ করেন ও ব্যবহার করেন

তাহার কারণও স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং ইহার ফলে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও মধুর হইতে পারে।

শিশু পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি।

শিশুর সম্বন্ধে সম্যক ও সঠিক ধারনা লাভ করিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতির সাহায্য লওয়া দরকার হয়। শিশু মনোবিদ্যায় যথেষ্ট জ্ঞান না থাকিলে শিশুকে অনবরত দেখিলেও তাহার সম্বন্ধে ভুল বিচার করা ও তাহাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে এবং ফলে তাহার বিকাশ ব্যাহত হইতে পারে বা অস্বাস্থ্যকর বা অস্বাভাবিক পথে যাইতে পারে।

এই পর্যন্ত অনেক প্রকারের শিশুপর্যবেক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি পিতামাতা বা শিক্ষক অনায়াসে অনুসরণ করিতে পারেন। কতকগুলি এইরূপ যে তাহার জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষণের আবশ্যক হয় এবং অপরগুলির জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য দরকার হয়। নিম্নে কতকগুলি কার্যকরী পদ্ধতির উল্লেখ করা হইবে। শিক্ষকের পক্ষে এইগুলি জানাই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

সুবিধার জন্য প্রথমে শিশু পর্যবেক্ষণের মুখ্য পদ্ধতি সমূহের একটি তালিকা দেওয়া হইল। পরে প্রত্যেকটির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইবে।

শিশু পর্যবেক্ষণের মুখ্য পদ্ধতি সমূহের তালিকা।

১। স্বাভাবিক অবস্থায় শিশু পর্যবেক্ষণ।

২। নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় শিশু পর্যবেক্ষণ।

৩। পারিবারিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ ও শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের ইতিহাস সঙ্কলন।

৪। শিশুর কথাবার্তা এবং তাহার লেখা, আঁকা ছবি ও অন্যান্য হাতের কাজের অধ্যয়ন।

৫। কতকগুলি বিশেষ কৌশল প্রয়োগ; যথা—

শিশুকে সম্পূর্ণ বাক্য ও গল্প পূরণ করিতে বলা হয় বা ছবি দেখাইয়া বা গল্প

বলিয়া তাহার মন্তব্য জিজ্ঞাসা করা হয়। এইগুলির সাহায্যে শিশুর অনুভূতি ও অন্য ব্যক্তিদের সহিত তাহার সম্বন্ধ কিরূপ তাহা জানা যায়।

৬। শিশু ও তাহার পিতামাতার সহিত কথাবার্তা।

৭। শিশুর সামাজিক সম্পর্ক জানার কৌশল (sociometric techniques)।

৮। নাটন।

৯। নানা রকমের অভীক্ষা।

১০। শিশু-স্বাস্থ্য নির্ধারণ ও শিশু-চিকিৎসা।

ইহা ছাড়া নানাভাবে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ও তাৎপর্যপূর্ণ করিবার জন্য শিক্ষককে প্রগতিপঞ্জী, সম্মেলন প্রভৃতির সাহায্য লইতে হইবে।

১। স্বাভাবিক অবস্থায় শিশু পর্যবেক্ষণ।

শিক্ষকের পক্ষে এই পদ্ধতিরই প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। শিশুকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে জানাই এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য। শিশু যখন তাহার পিতামাতার সঙ্গে থাকে অথবা একলা থাকে, তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বা খেলা করে এইরূপ দৈনন্দিন নানা অবস্থায় শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে।

পর্যবেক্ষণ করিবার আগে কি কি জিনিষ দেখিতে হইবে তাহা মোটামুটি ঠিক করিয়া যাওয়া ভাল। অনেক শিক্ষক শিশুর ঋণাত্মক দিকটাই লক্ষ্য করেন বা খুব তুচ্ছ জিনিষ লক্ষ্য করেন কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করিয়া যান।

পর্যবেক্ষণের বিশেষ লক্ষ্য।

১। শিশুকে প্রথম দেখিয়া কি ধারণা হয়। বেশ হাসিখুশী ও লোককে সহজেই ভুলাইতে পারে অথবা তাহার মেজাজ ও স্বভাবের জন্য লোকে তাহাকে ভালবাসিতে পারে না।

২। শিশুর স্বাস্থ্য কিরূপ। কোন অপুষ্টি বা রোগ লক্ষণ আছে কিনা।

৩। শিশুর আত্মবোধ কিরূপ। সে কি নিজেকে কোন কাজের উপযুক্ত নহে বা হীন ভাবে। সে তাহার নিজের চেহারা, বিদ্যালয়ের কাজে তাহার দক্ষতা ও সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মেলামেশায় যতটা সে পটু তাহাতেই সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট। সে কি তাহার বয়সের অনুপাতে বেশী আত্মকেন্দ্রিক।

৪। বাধা পাইলে, আশাভঙ্গ হইলে বা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখে সে কিরূপ ব্যবহার করে—রাগিয়া যায়, ভাঙ্গিয়া পড়ে, না, যে ভুল সে করিয়াছে তাহা শুধরাইয়া লইয়া নূতন উদ্যমে সে সফলতার দিকে আগাইয়া যায়। বাধাবিঘ্ন বা অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া সে কি সহজেই অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করে, না, নিজের চেষ্টায় বাধা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে।

৫। শিশু তাহার কাজ কিভাবে করে—অনিচ্ছুকভাবে, না, আগ্রহভরে; একলা, না, অন্যের সহিত। সে কি পুরস্কার পাইবার লোভে কাজ করে, না, কাজ করার মধ্যেই সে আনন্দ পায়। যে কাজ সে আরম্ভ করে তাহা কি সম্পূর্ণ করে।

৬। যখন কোন কাজে শিশু সফল হয়, সে কি তাহার সফলতার কথা পাঁচজনকে বলিয়া বেড়ায়; সে কাজ সম্পূর্ণ হইবার পর অন্য কাজে নিজেকে নিয়োগ করে, অথবা যাহা করিতে পারিয়াছে তাহারই পুনরাবৃত্তি করে।

৭। শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলিতে পারে, না, আড়ষ্ট ভাব দেখায়। একা একা খেলে, না, অন্যদের সঙ্গে খেলে; খেলার সাথীরা তাহার চেয়ে বড়, ছোট, না, সমবয়সী। বেশীর ভাগ জিনিষকেই সে মজা মনে করে কি, তাহার খেলার সামগ্রী, পুতুল ইত্যাদি, কি, পোষা জীব জন্তুর প্রতি তাহার ব্যবহার কেমন।

৮। শিশু সহযোগিতা ও অপরকে সাহায্য করার ভাব দেখায় কি। তাহার বই ও খেলনা অপরের সঙ্গে ভাগ করিতে চায় কি।

৯। অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে শিশু কিভাবে মানাইয়া চলে। দলের মধ্যে তাহার ব্যবহার কেমন। সে কি অন্যের সুখ-দুঃখ বুঝিতে পারে। অন্য শিশুরা তাহার প্রতি কিরূপ আচরণ করে। দলের উদ্দেশ্য সে কি মানিয়া লয় এবং তদনুযায়ী কাজ করে।

১০। কোন্ কোন্ বিষয়ে সে বেশী আগ্রহী।

১১। অপরিচিতদের প্রতি এবং বয়স্ক লোকদের প্রতি সে কিরূপ ভাব দেখায়। বড়দের উপর সে কি অতিরিক্ত নির্ভরশীল, বন্ধুভাবাপন্ন, শত্রু-ভাবাপন্ন বা উদাসীন।

১২। কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহার বিশেষ সামর্থ্য প্রকাশ পায়। তাহার শব্দজ্ঞান, সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা, মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা, সম্বন্ধ বিচার কিরূপ। লেখাপড়া করার শক্তি কতদূর জন্মিয়াছে। কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহার অসামর্থ্য বা অসুবিধা প্রকাশ পায়।

১৩। শিশুর উপর যখন বড়দের কোন কাজের নির্দেশ না থাকে তখন সে কি করে। সে কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কাজে প্রবৃত্ত হয়। সে কি কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত লাগিয়া থাকে, তাহার মধ্যে কি সৃজনাত্মক গুণ প্রকাশ পায়।

১৪। সে কি সুনিয়মকে বুঝিতে পারে ও মানিয়া চলিতে প্রস্তুত থাকে।

১৫। শিশুর জীবনে কি কি সমস্যা দেখা দিয়াছে সেইগুলি সমাধানের উপায় কি।

১৬। শিশুর পরিবেশ কি তাহাকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিতেছে, না, ইহার মধ্য হইতে তাহাকে বিফলমনোরথ ও হতোদ্যম হইতে হইতেছে।

উপরের তালিকা অনুযায়ী কোন শিশুকে পর্যবেক্ষণ করিলে তাহার শারীরিক, বৌদ্ধিক, প্রক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি বহু বিষয়ের তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। তবে শিক্ষককে একথা মনে রাখিতে হইবে যে এইগুলি কেবল তাঁহার সাহায্যের জন্য দেওয়া হইল। তাঁহার পক্ষে কোন বাঁধাধরা নিয়মে চলার প্রয়োজন নাই। তাঁহার প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁহার পর্যবেক্ষণ প্রণালী উদ্ভাবন করিতে পারেন। তাহা ছাড়া পর্যবেক্ষণ বেশ খোলা মনে হওয়া দরকার। পূর্ব ধারণায় ভারাক্রান্ত থাকিয়া পর্যবেক্ষণ করিলে নূতন জিনিষ দেখা যায় না, সেইজন্য শিশুর আচরণে যদি নূতন কিছু দেখেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা লক্ষ্য করিবেন ও তাহার তাৎপর্য বুঝার চেষ্টা

করিবেন। শিশুর উপর তাঁহার নিজের প্রভাব কিভাবে পড়িতেছে সে বিষয়েও তাঁহাকে সজাগ থাকিতে হইবে।

শিশুদের জগতে প্রবেশ করার একটি সহজ পথ হইতেছে তাহারা যখন স্বাভাবিকভাবে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে তাহা মন দিয়া শোনা। ইহাতে তাহাদের মনের গতিবিধি, ইচ্ছা অনিচ্ছা, অনেক কিছু জানিতে পারা যায়।

গৃহ সংযোগের দ্বারা শিশুর গৃহ ও সমাজ, পরিবেশের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায় এবং তাহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মূল কোথায় তাহার সন্ধান বহু ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

২। নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় শিশু পর্যবেক্ষণ।

বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন আচরণ করিতে পারে। শিক্ষক যদি মনে করেন একই অবস্থায় বিভিন্ন শিশু কিরূপ আচরণ করে তাহা হইলে তাঁহাকে অন্য অবস্থাগুলি সরাইয়া লইয়া শুধু একটি মাত্র অবস্থাকেই রাখিতে হয়—ইহাকেই নিয়ন্ত্রিত অবস্থা বলে ; যেমন বিভিন্ন ছবি দেখিয়া সে সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন করিলে শিশুরা যে সমস্ত উত্তর দিবে সেইগুলিকে পরস্পরের সহিত তুলনা করা যায় না। কিন্তু যদি একই ছবি প্রত্যেক শিশুকে দেখান হয় এবং একই প্রশ্ন করা হয় তাহা হইলে শিশুদের উত্তরগুলি পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া দেখা যায়। এইখানে একই ছবি এবং একই প্রশ্নের দ্বারা শিশুদের নিয়ন্ত্রিত অবস্থার মধ্যে রাখা হইয়াছে। এইভাবে একই নির্দেশ সহ একই কাজ শিশুদের করিতে বলা যাইতে পারে এবং তাহাদের কাজ করার প্রণালী লক্ষ্য করা যাইতে পারে—যেমন কেহ হয়ত কাজটি করিতে আরম্ভ করিল কিন্তু শেষ করিল না, কেহ অনিচ্ছাসত্ত্বে করিল, কেহ কাজ করায় আনন্দ পাইল। এইখানে কেহ বলিতে পারিবে না যে, কোন শিশুকে এমন নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যাহাতে সে কাজটি সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছে, অন্যকে সেইভাবে নির্দেশ না দেওয়ায় সে কাজটি সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই বা কাজটি এমন ধরণের যাহাতে একজন আনন্দ পাইয়াছে এবং বিরক্তিকর কাজের জন্য অন্য শিশুর কাজ করার ইচ্ছা ছিল না, কারণ নির্দেশ ও কাজ অবিকল এক ছিল। এখানে

উদ্দীপক এক, কিন্তু সাড়া বিভিন্ন হইয়াছে এবং বিভিন্ন সাড়ার তুলনা করিয়া শিশুদের আচরণ বৈলক্ষণ্য নির্ধারিত হইতে পারে।

কেবলমাত্র শিশুদের আচরণের বর্ণনা প্রস্তুত করাই শিশু পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য নহে। শিশুর ব্যক্তিগত জীবনে ও তাহার সমাজে তাহার আচরণের কি পরিণাম হইতে পারে তাহাও বিচার করিতে হইবে। শিশুর আচরণ কি তাহার মনে হীনতাবোধ জাগায়, না, তাহাতে সে বেশ সপ্রতিভ মনে করে? তাহার আচরণে কি তাহার দলের ঐক্য বৃদ্ধি পায়? তাহার আচরণ কি অন্যের উপর অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করে? তাহার আচরণ সংগঠনমূলক, না, ধ্বংসাত্মক? এইভাবে শিশুর আচরণের পরিণামকে বিচার করিতে হইবে।

শিশু পর্যবেক্ষণের শেষে যে বিবৃতি তৈয়ারী করা হইবে তাহা যেন বাস্তবধর্মী হয় অর্থাৎ শিশুর অচেরণের যথাযথ বর্ণনাই শুধু মাত্র থাকে শিক্ষকের মতামত বা ইচ্ছা অনিচ্ছা যেন তাহাতে মিশাইয়া দেওয়া না হয়।

৩। পারিবারিক অবস্থার তথ্যসংগ্রহ ও শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের ইতিহাস সঙ্কলন।

শিশুর অতীত জীবন জানিতে পারিলে তাহার ভবিষ্যৎ বুদ্ধি ও বিকাশে শিক্ষক সহায়তা করিতে পারেন।

পিতামাতার নিকট হইতে অনেক প্রয়োজনীয় খবর পাওয়া যাইতে পারে। এই কাজ সাধন করিতে হইলে প্রথমে পিতামাতার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার, তাঁহাদের কথা মনোযোগ দিয়া শোনা উচিত এবং মতামতকে মর্যাদা দেওয়া উচিত। শিশুর সহিত পিতামাতার সম্পর্ক, পিতামাতার পরস্পরের প্রতি মনোভাব ও শিশুর প্রতি মনোভাব ও আচরণ গতজীবনে দারিদ্র ও শোকের সময়, পিতামাতার পেশা বা বৃত্তি, শিশুর পূর্বের অসুখ-বিসুখ, দুর্ঘটনা, তাহার আগ্রহ ও কাজকর্ম, তাহার খেলার সঙ্গী সাথী, লেখাপড়া শেখার ক্ষমতা, অন্য শিশুদের সহিত সম্পর্ক ইত্যাদি অনেক বিষয়ের সংবাদ পিতামাতার কাছ হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা ও গৃহের জীবন, শিশুর বিদ্যালয়ে আচরণ

ও লেখাপড়া শেখার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। অতীত অভিজ্ঞতা ও গৃহপরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া শিশুর বিকাশকে কিভাবে অব্যাহত রাখা যায় তাহার জ্ঞান এই পদ্ধতি দ্বারা লাভ করা যায়।

৪। শিশুর কথাবার্তা এবং তাহার লেখা, আঁকা ছবি ও অন্যান্য হাতের কাজের অধ্যয়ন।

শিশু নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করিতে থাকে। শিশুর জগতে প্রবেশ করিতে গেলে তাহার কথাবার্তা, তাহার লেখা, আঁকা ছবি ও অন্যান্য হাতের কাজের অধ্যয়ন করা দরকার।

শিশুর হাতের লেখা, বানান, রচনা, অঙ্ক, ছবি ইত্যাদি যে সব কাজ সে বিদ্যালয়ে করে সেইগুলিতে যদি তারিখ দিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে তাহার হাতের লেখা, শব্দজ্ঞান, বাক্যবিন্যাস, প্রকাশ করার স্পষ্টতা, সাধারণ জ্ঞান, অঙ্ককষা ও সৃজনাত্মক কাজে আত্মপ্রকাশের প্রগতির ধারাটি বুঝা যায়। অনেক সৃজনাত্মক কাজের মধ্য দিয়া শিশুর মধ্যে অভাবিত শক্তির প্রকাশ পায়। শিশুর নাটকীয় খেলা, তাহার গড়া জিনিষ, তাহার স্বপ্ন, লেখা গল্প, রঙ তুলি দিয়া আঁকা ছবি—এই সবের মধ্য দিয়া শিশুর পরিপক্কতা, বাস্তব জ্ঞান এবং আবেগময় জীবনের সাম্য ও অসাম্যের অনেক নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। যেমন দেখা যায় খুব অল্পবয়সী শিশুকে মানুষের ছবি আঁকিতে বলিলে, মাথাটি গলাহীন অবস্থায় দেহের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়, হাত বুক বা পেট হইতে বাহির করে এবং দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য ঠিক থাকে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহাবয়ব সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া উঠে, জামা কাপড় পরায় ইত্যাদি। তেমনি ঘর-বাড়ী আঁকিতে গিয়া কাছের দূরের জিনিষ দেখাইতে পারে না। দৃশ্যপটের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের সমাবেশ অবাস্তব ও আয়তন অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং ঘরের মধ্যে কি আছে তাহা দেওয়ালকে উপেক্ষা করিয়াই দেখান হয়; পরে ঘরবাড়ী ও দৃশ্যপটের ছবি বাস্তবধর্মী হইয়া উঠে। প্রথমে ছবি আঁকার মধ্যে বাস্তবের প্রতিফলন অপেক্ষা শিশুর ইচ্ছা ও কল্পনাই পরিস্ফুট হয় এবং পরিপক্কতার সঙ্গে সঙ্গে ছবি বাস্তবধর্মী হয়। সুতরাং বেশী বয়সেও যদি দেখা যায় ছবি

আঁকার মধ্যে বাস্তবের প্রতিফলন তাহার বয়স অনুযায়ী হইতেছে না তাহা হইলে তাহার যথারীতি বৌদ্ধিক ও প্রক্ষোভিক পরিপক্বতা হয় নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে।

একটু বয়স্ক ছেলেমেয়েদের তাহারা সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর হইতে রাত্রিতে শুইতে যাইবার পূর্ব পর্যন্ত কোন্ সময় কি করে তাহার দৈনিক তালিকা প্রস্তুত করিতে বলা যাইতে পারে। এইরূপ কয়েকটি দৈনিক তালিকা দেখিলে শিশুর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কিরূপ তাহা বুঝা যায়। এইরূপ দৈনিক তালিকায় দেখা যাইতে পারে পিতামাতারা শিশুর কাজকর্ম দেখাশুনা করে কিনা, পড়াশুনা করার উপর বেশী জোর দেয় কিনা, সঙ্গীত নৃত্য ও অন্যান্য ললিতকলা চর্চার উপর ও অন্যান্য কর্মের উপর পিতামাতার উপদেশ ও নজর আছে কিনা ; অথবা দেখা যাইতে পারে শিশুর উপর পিতামাতার তত্ত্বাবধান বিশেষ কিছু নাই ; সে স্বাধীনভাবে নানারকম বন্ধুদের সঙ্গে মিশিতে পারে, নিজের মনোমত কাজ খুঁজিয়া লইয়া তাহাতে লিপ্ত হইতে পারে।

দৈনিক তালিকার অন্তর্গত তথ্যগুলি গোপন রাখা হইবে, এইসম্বন্ধে আশ্বাস পাইলে এবং স্বইচ্ছায় সঠিকভাবে তালিকা লিখিতে অনুপ্রাণিত হইলে, তবে তালিকাগুলি কার্যকরী হইতে পারে।

আত্মজীবনী পড়িয়া আমরা লেখকের অনেক মনের কথা জানিতে পারি। ৭ম, ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মজীবনী লিখিতে বলা যাইতে পারে। তবে খুব বড় আত্মজীবনী লিখিতে তাহারা পছন্দ নাও করিতে পারে। তবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাহারা তাহাদের মনোভাব লিখিয়া জানাইতে পারে।

সবচেয়ে বেশী আমি কোন্ কোন্ জিনিষ পাইতে ইচ্ছা করি, কোন্ কাজ করিতে আমি সবচেয়ে ভালবাসি। কোন্ কাজ আমি সবচেয়ে বেশী অপছন্দ করি, অন্যের ভিতর কোন্ গুণ দেখিলে আমি তাহার প্রশংসা করি।

নিজের সম্বন্ধে কোন্ জিনিষটি আমার প্রিয়। নিজের সম্বন্ধে কোন্ জিনিষটি আমি পছন্দ করি না। আমার কোন্ গুণটি অন্যেরা অপছন্দ করে।

কিসে আমায় রাগাইয়া তোলে।

বিদ্যালয়ের প্রগতি পত্র পাইলে আমার কি মনে হয়।

বাড়ীতে কোন্ কোন্ পরিবর্তন আমি দেখিতে চাই।

কি কারণে এবং কিভাবে আমায় শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।

এইসব বিষয়ের উপর লিখিলে শিশুদের পীড়িত অনুভূতিগুলি মুক্তির পথ পায় ও মন খোলসা হইয়া গিয়া তাহারা যেমন একদিকে শান্তি পায় তেমনি তাহারা জগতকে কি দৃষ্টি দিয়া দেখিতেছে সে সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়।

৫। বিশেষ কৌশল।

অসম্পূর্ণ বাক্য পূরণ করা।

নিম্নপ্রকারের অসম্পূর্ণ বাক্য গঠিত হইতে পারে ঃ

একবার আমি খুব রাগিয়া গিয়াছিলাম কারণ..............

একবার আমি খুব ভয় পাইয়াছিলাম যখন..............

একবার আমি আমার উপর সুবিচার করা হয় নাই মনে করিয়াছিলাম যখন..............

যে বিষয়ে আমার খুব আশ্চর্য লাগে তাহা হইতেছে..................

এইরূপ অসম্পূর্ণ বাক্য পূরণ করিতে গিয়া শিশুরা তাহাদের মনোভাব, অনুভূতি প্রভৃতি স্বাভাবিক ও সঠিকভাবে প্রকাশ করে—যাহা সোজাসুজি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিতে চাহিবে না। অসম্পূর্ণ বাক্যের মত অসম্পূর্ণ গল্পও বলা যাইতে পারে এবং শেষ অংশটা শিশুকে বানাইয়া বলিতে বলা হয়—ইহাতে শিশুর ইচ্ছা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

যেহেতু এইসব কৌশলের দ্বারা শিশুর ইচ্ছা, আত্মবোধ, গৃহ ও সমাজ-পরিবেশের প্রতি, নিজের দলের প্রতি, শিক্ষকের প্রতি তাহার মনোভাব ব্যক্ত হয় সেইহেতু শিশুর প্রত্যক্ষগোচর আচরণের ও মন্তব্যের গূঢ় ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

শিশুরা কিসে কিসে আগ্রহী তাহা জানার জন্য একটি প্রশ্নতালিকা করিয়া শিশুদের উত্তর দিতে বলা যাইতে পারে। আগ্রহ ও ব্যক্তিত্বের অভীক্ষাগুলি সবই বিদেশী ; আমাদের দেশে এইবিষয়ে এখনও কোন ভাল অভীক্ষা প্রচলিত হয় নাই, সেইজন্য শিক্ষকগণ এইগুলির দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে হয় না।

৬। শিশু ও তাহার পিতামাতার সহিত কথাবার্তা।

শিশুর পিতামাতার সহিত কথোপকথনের দ্বারা পরিবারের সহিত শিশুর কিরূপ সম্বন্ধ সে বিষয়ে ভাল বোধ হইতে পারে। শিক্ষক যদি সুকৌশলে কথাবার্তা চালাইতে পারেন তাহা হইলে পিতামাতারাও নিজেদের ও শিশুকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন।

শিক্ষককে এইকথা মনে রাখিতে হইবে যে তিনি শিশুর পিতামাতাকে উপদেশ দিতে যান নাই, তিনি তাঁহাদের কথা শুনিতে গিয়াছেন। যদি তিনি প্রত্যক্ষভাবে নিজের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁহাদের ধারণা ও মতামতকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অর্জন করিতে পারিবেন না এবং ইহার পর শিশুর মধ্যে বা তাহার পিতামাতার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনা দুষ্কর হইয়া পড়িবে। শিশুর সম্বন্ধে সবদিক দিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাবিতে শিক্ষক তাঁহাদের উৎসাহ দিবেন; তাঁহারা যখন তাঁহার মন্তব্য শুনিতে চাহিবেন তখন তিনি আপন মন্তব্য বলিবেন।

অর্থাৎ শিশুর পিতামাতার সঙ্গে সংলাপ যেন বেশ সহজ স্বাভাবিক ভাবে হয় এবং সংলাপকারীদের মধ্যে যেন একটা হৃদ্যতার ভাব থাকে। শিক্ষক পিতামাতার মতামতকে মর্যাদা দেন এবং পরিশেষে যেন মনে হয় তাঁহারা ও শিক্ষক উভয়েই শিশুর সম্বন্ধে যাহা জানিতে চাহিয়াছেন তাহার অনেকটা জানা গেল বা কোন সমস্যার সমাধানের সূত্র পাওয়া গেল এবং এই সংলাপজাত জ্ঞানের আলোকে পিতামাতা গৃহে এবং শিক্ষক বিদ্যালয়ে এমন পরিবেশ রচনা করিতে পারেন যাহাতে শিশুর বিকাশ বাধামুক্ত ও সাবলীল হয়।

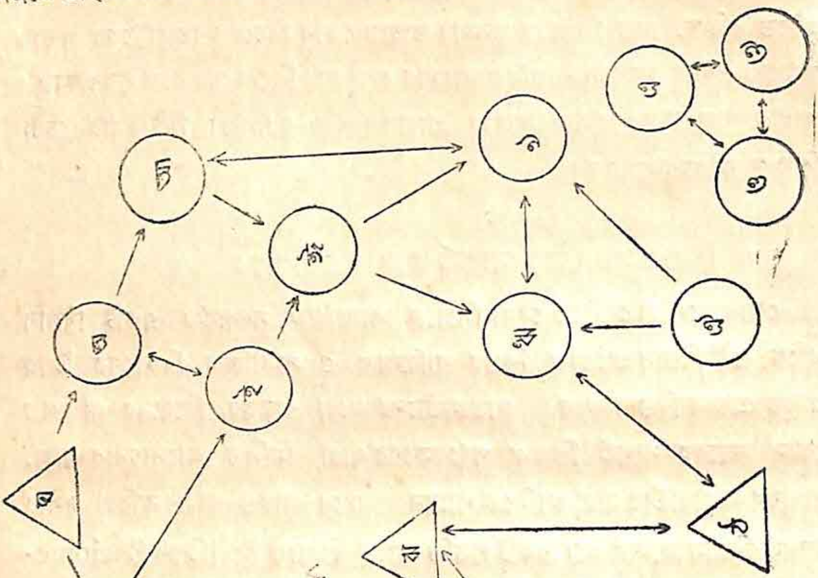
শিক্ষক শিশুর সঙ্গেও কথা বলিবেন। যদি শিশু মনে করে যে শিক্ষক বেশ দরদী এবং তাহার কথা তিনি সহানুভূতির সঙ্গে শুনিবেন তাহা হইলে সে সহজভাবে কথা বলে এবং সে যেরূপ আচরণ করে তাহা কেন করে তাহার প্রকাশ ক্ষমতায় যতটা সম্ভব সেইভাবে বুঝাইয়া দেয়। শিশু অনেক সময় তাহাদের জগৎকে যেমনভাবে সে পাইতে চায় বা দেখিতে চায় সেইভাবে প্রকাশ করে। ইহাকে মিথ্যাচরণ বা কল্পনা বিলাস মনে না করিয়া যদি শিশুকে পূর্ণ অনুমতি দেওয়া যায় তাহার মনের কথা বলিতে, তাহা হইলে শিশুজীবনের অনেক মনের

খবর পাওয়া যায় ; হয়ত শিশুর খেলনা ও পালিত পশুপক্ষী নাই, পরিবারে অন্য শিশুর সঙ্গে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীতা আছে, বাড়ীতে অনাদর পায়, মনোমত জিনিষ হইতে বঞ্চিত, অন্য শিশুদের তুলনায় তাহার কোন বিষয়ে হয়ত পটুত্বের অভাব আছে। এইসব অবস্থায় কাল্পনিক ভাবনায় বা কথায় শিশু মনের ইচ্ছা পূরণ করে। তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া তাহার প্রয়োজনগুলি যথাসম্ভব মিটাইবার চেষ্টা শিক্ষক করিতে পারেন।

৭। শিশুর সামাজিক সম্পর্ক জানার কৌশল।

কোন দলে বা শ্রেণীতে দেখা গিয়াছে সামাজিক সম্পর্কের একটি বিন্যাস থাকে, এই বিন্যাস প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বন্ধুত্বের, বিদ্বেষের বা অন্য কোন ভাবের সম্পর্ক শিক্ষক পর্যবেক্ষণের দ্বারা, মিলিত আলোচনার দ্বারা, সাধারণ কথাবার্তার দ্বারা জানিতে পারেন। তবে আরও ভাল করিয়া দলীয় সম্পর্ক-বিন্যাস জানার জন্য একটি পদ্ধতি আছে তাহাকে ইংরাজিতে Sociometry বলা হয়। এইটি শিক্ষক তাঁহার নিজের শ্রেণীতে ছেলেমেয়েদের উপর প্রয়োগ করিতে পারেন। বিভিন্ন অবস্থায় ও কাজে শিশু তাহার কোন্ কোন্ সাথীদের পছন্দ করে, এই পদ্ধতির দ্বারা জানা যাইতে পারে ; যেমন কাহার পাশে সে বসিতে চায়, কাহার সঙ্গে কাজ করিতে চায়, কাহার সঙ্গে খেলিতে চায়, কাহার সঙ্গে বেড়াইতে চায়। একটি উদাহরণ লওয়া যাউক। ধরা যাউক কোন শিক্ষক জানিতে চান তাহার শ্রেণীর প্রত্যেক শিশু কাহার কাহার সঙ্গে খেলিতে পছন্দ করে। প্রথমে প্রত্যেক শিশুকে একটি করিয়া কাগজের টুকরা দিতে হইবে এবং তাহাকে নির্দেশ দিতে হইবে সে যেন পর পর তিনজনের নাম লেখে, যাহাদের সঙ্গে সে খেলিতে ভালবাসে। প্রথম নামটি তাহারই হইবে যাহার সঙ্গে সে খেলিতে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে, তাহার পর তাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পছন্দের শিশুর নাম লিখিবে এবং কাগজের নীচের কোণে তাহার নিজের নামটি লিখিবে। তাহার পর শিক্ষক কাগজের টুকরাগুলি তাহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লইবেন এবং প্রত্যেক শিশুর নাম তালিকাভুক্ত করিয়া কে কয়বার তাহাকে

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার পছন্দ করিয়াছে তাহা বাহির করিবেন এবং এক-নজরে এই সম্পর্ক-বিন্যাস দেখিবার জন্য নিম্নরূপ একটি পরিলেখ অঙ্কন করিবেন।



পরিলেখ ১। প্রত্যেক বালিকা বৃত্তের মধ্যে স্বরবর্ণের দ্বারা ও প্রত্যেক বালক ত্রিভুজের মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রত্যেককে দুইজন সাথীর নাম লিখিতে বলা হইয়াছিল যাহাদের সঙ্গে তাহারা খেলিতে ভালবাসে।

পরিলেখ ১ এ বালকদিগকে ত্রিভুজের মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বারা ও বালিকাদের বৃত্তের মধ্যে স্বরবর্ণের দ্বারা দেখান হইয়াছে। ধরা যাউক তাহারা ৭ম শ্রেণীতে পড়ে। পরিলেখে দেখা যাইতেছে 'ক', 'খ' ও 'চ' এর সঙ্গে খেলিতে ভালবাসে, শরচিহ্ন দিয়া এই সম্পর্ক দেখান হইয়াছে। 'খ', 'ক' ও 'ছ' কে খেলার সাথীরূপে লইতে চায়, যেহেতু 'ক' ও 'খ' পরস্পরকে পছন্দ করে, সেইহেতু দুইমুখো তীর দিয়া দেখান হইয়াছে। পরিলেখে দেখা যাইতেছে 'জ' বালক ও '৯' বালিকা খেলার সাথী হিসাবে বিশেষ প্রিয়। 'জ' কে পাঁচবার ও '৯' কে চারবার পছন্দ করা হইয়াছে। ইহাদের 'মধ্যমণি' বলা যাইতে পারে। অন্যদিকে 'ঘ' ও 'ঞ' বালক এবং 'ঐ' বালিকাকে কেহ পছন্দ করে নাই, ইহাদের 'নিঃসঙ্গ' বলা যাইতে পারে। 'এ', 'ও' এবং 'ঔ' এই তিনজন বালিকা পরস্পরকে পছন্দ করে কিন্তু দলের অন্যদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। শ্রেণীর মধ্যে এইরূপ ছোট দল পাকানকে 'ঘোঁট' বলা যাইতে পারে। পরিলেখে আরও দেখা যাইতেছে যে বালক ও বালিকাদের মধ্যে তেমন যোগাযোগ নাই। প্রধানতঃ খেলার সাথী নির্বাচন সমলিঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। এই বিষয়ে বালকরা যদিও বা কিছু উদার কিন্তু বালিকারা খুব গোঁড়া। 'গ', 'ঘ' ও 'ঠ' এই তিনজন বালক বালিকাদের খেলার সাথীরূপে পাইতে চায় কিন্তু 'ঋ' ছাড়া আর কোন বালিকাই বালকদের সঙ্গে খেলিতে চায় না।

এইভাবে অন্যান্য সম্পর্ক-বিন্যাসের, যেমন খেলার সাথী, কাজের সাথী, বেড়ানর সাথী প্রভৃতির পরিলেখ আঁকা যাইতে পারে। এইভাবে সম্পর্ক-বিন্যাস জানিয়াই শিক্ষক ক্ষান্ত থাকিবেন না। শিশুর পছন্দ অপছন্দের হেতু কি তাহাও পরে তাঁহাকে জানিতে হইবে এবং যে সব শিশু সামাজিক বিকাশে পিছাইয়া পড়িয়া আছে তাহাদের সাহায্য করিতে হইবে।

এইরূপ সমাজ সম্পর্ক-বিন্যাস, ইংরাজিতে যাহাকে বলা হয় Sociogram, তৈয়ারীর কাজে শ্রেণীর বা দলের পূর্ণ সহযোগিতা পাইতে হইলে তাহাদের কাছে ইহার একটি বাস্তব মূল্য থাকা চাই। অর্থাৎ তাহারা যাহাদের বিভিন্ন

অবস্থায় পছন্দ করে সমাজিক সম্পর্ক-বিন্যাস তৈয়ারী হইবার পর তাহাদের মনোমত সাথীদের সঙ্গে মিলিত হইবার সুযোগ দিতে হইবে। তাহাদের পছন্দ অপছন্দ যেন সম্পূর্ণ গোপন থাকে তাহার আশ্বাস দিতে হইবে। দলের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব পরিলক্ষিত হইলে অপছন্দের সম্পর্ক-বিন্যাসও তৈয়ারী করা যাইতে পারে।

খুব নিম্নশ্রেণীর শিশুরা লিখিতে জানে না, তাহাদের লইয়া এ বিষয়ে কাজ করিতে গেলে এক একজনকে নির্জনে ডাকিয়া তাহাদের পছন্দ অপছন্দ জানা যাইতে পারে।

শিক্ষককে মনে রাখিতে হইবে যে সম্পর্ক-বিন্যাস অনেকদিন স্থায়ী নাও হইতে পারে। কোন শিশু যদি অন্যদের তাহার জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করে বা উপহার বিতরণ করে তবে আগে তাহাকে যাহারা পছন্দ করিত না তাহারাও তাহাকে পছন্দ করিতে আরম্ভ করিতে পারে। আবার কোন শিশু যদি অন্য শিশুদের বিরক্তিকর কোন কাজ করে তাহা হইলে অন্যদের ভালবাসা সে হারাইতেও পারে। যাহা হউক শিক্ষকের শিশু পর্যবেক্ষণে সম্পর্ক-বিন্যাসও যথেষ্ট সাহায্য করে একথা সত্য।

দলের মধ্যেই সামাজিক বিকাশ সম্ভব, সেইজন্য শিক্ষক সম্পর্ক-বিন্যাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যক্তিগত শিশুর সামাজিক বিকাশের জন্য দলকে কাজে লাগাইতে পারেন। যেমন যে শিশু নিঃসঙ্গ সে যাহাদের পছন্দ করে তাহাদের সঙ্গে তাহাকে মিলিতে মিশিতে বা কাজ করিতে সুযোগ দিতে হইবে। নিঃসঙ্গ শিশুর মধ্যে যে গুণ বা দায়িত্ববোধ আছে, সেইগুলি আবিষ্কার করিয়া তাহার ব্যবহার করিতে তাহাকে শিখাইতে হইবে, ফলে তাহার গুণের আদর বা সেবার মহিমা অন্য শিশুরা স্বীকার করিবে এবং তাহাকে দলের একজন করিয়া লইবে। এইভাবে 'ঘোঁট' পাকাইয়া যাহারা বসিয়া আছে তাহাদের আগ্রহ বিস্তার করিয়া অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা ও কাজকর্ম করিতে প্রণোদিত করিতে হইবে। যাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক নেতৃত্ব-শক্তি আছে তাহাদের গণতান্ত্রিকভাবে সেই শক্তি প্রয়োগ করিতে শিখাইতে হইবে

৮। নাটন।

দেখা যায় বাহিরের জগতের বস্তু ও ঘটনার যে ছাপ শিশুমনে পড়ে তাহা সে নানাভাবে প্রকাশ করিতে চায়। কথা বলিয়া, গল্প বলিয়া, ছবি আঁকিয়া বা অভিনয় করিয়া শিশুমানসে বাস্তবের যে প্রতিচ্ছবি পড়িয়াছে তাহা সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করে। সকলেই দেখিয়াছেন রেলগাড়ী দেখিয়া 'রেলগাড়ী' খেলা করে, 'চোর-পুলিশের' খেলা, 'রাজা-রাণীর' খেলা, 'ঘরকন্নার' খেলা, 'বাবা মা'র খেলা, 'মাষ্টার মশাই' খেলা, আজকাল সভা বা নির্বাচন (election) দেখিয়া শুনিয়া তাহার খেলা—এইরূপ নানারকম খেলাচ্ছলে অভিনয় শিশুরা করিয়া থাকে। যাহা কিছু তাহারা দেখে, শোনে, পড়ে সবই তাহারা যে অনুভূতি দিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মাধ্যমে সে প্রকাশ করিতে চায়। বাস্তবের সঙ্গে কতটা এইসব অভিনয়ের মিল আছে তাহা প্রধান জিনিষ নহে; তাহারা এই সব হইতে কি অভিজ্ঞতা লাভ করিল তাহারই স্বচ্ছ স্বাভাবিক প্রকাশ হয় এই সব অভিনয়ের মধ্য দিয়া। শিক্ষক যদি শিশুদের এই স্বাভাবিক প্রেরণাকে কাজে লাগাইয়া এমন সব ভূমিকায় তাহাদের নামাইতে পারেন যেগুলির অভিনয়ের মধ্য দিয়া তাহারা তাহাদের সামাজিক সম্বন্ধ ও তাহাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য তাহারা যাহা চায় তাহা নাটকীয় ভঙ্গীতে সহজভাবে ব্যক্ত করিতে পারে। এইরূপ ফল পাইবার আশা করিলে অভিনয়ের ভাব, ভাষা, ভঙ্গী ও আঙ্গিকসজ্জা যতটা পারা যায় শিশুদের দ্বারাই রচিত হওয়া উচিত—শিক্ষকের নির্দেশ যত কম থাকে ততই ভাল।

৯। **নানারকমের অভীক্ষা।**

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে নানারকম অভীক্ষার প্রচলন আছে। নির্দিষ্ট নির্দেশসহ নির্দিষ্ট কাজ অভীক্ষা গ্রহণকারীকে করিতে বলা হয় এবং তাহার কাজের ফলকে নির্দিষ্ট প্রণালীতে পরিমাপ ও ব্যাখ্যা করা হয়। এই অভীক্ষাগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে এইগুলি এইরূপ বৈজ্ঞানিকভাবে নির্মিত যে অভীক্ষার নির্দিষ্ট বিষয় করিতে গিয়া অভীক্ষা গ্রহণকারী নিজের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় অল্প সময়ে দিতে পারে। অনেক সময় শিশুদের বহুকাল

ধরিয়া পর্যবেক্ষণের সুযোগ থাকে না বা সুশিক্ষিত পর্যবেক্ষকের অভাব, সেইরূপ স্থলে উপযুক্ত অভীক্ষার দ্বারা অল্প সময়ে শিশুদের আচরণ সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়।

বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও অর্জিত জ্ঞান পরিমাপ করিবার জন্য অনেক রকমের পাশ্চাত্য অভীক্ষা প্রচলিত আছে।

শিক্ষক পরীক্ষার সাহায্যে শিশুর লেখাপড়া শিখিবার সামর্থ্যের পরিমাপ গ্রহণ করেন। তাঁহার এই কাজে বুদ্ধি ও অন্যান্য সামর্থ্যের অভীক্ষাগুলি পরিপূরক হিসাবে কাজ করিতে পারে এবং তাঁহার লওয়া পরীক্ষার ফলের সহিত এই সকল অভীক্ষার সাফল্যাঙ্কের মিল বা অমিল দেখিয়া তাঁহার পরীক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে বিচার করিতে পারেন।

এই সকল অভীক্ষাগুলি রচনা করা, প্রয়োগ করা, সাফল্যাঙ্ক বাহির করা ও ব্যাখ্যা করা বহুকালব্যাপি শিক্ষাসাপেক্ষ। তাহা ছাড়া বাংলাদেশে এইরূপ অভীক্ষা নাই বললেই হয়। সেইজন্য এই অভীক্ষাগুলির সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমানে নিষ্প্রয়োজন।

১০। শিশুর স্বাস্থ্য নির্ধারণ ও শিশু চিকিৎসা।

অধিকাংশ বিদ্যালয়েই কোন স্বাস্থ্য পরীক্ষক বা চিকিৎসক থাকেন না। সুতরাং শিক্ষককে শিশুদের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের মান কিরূপ সে সমন্ধে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা অবহিত থাকিতে হইবে। অবশ্য ব্যাধির চিকিৎসা শিক্ষকের সাধ্যও নয় এবং কর্তব্যও নয়। তিনি শিশুর উচ্চতা ও ওজন, অঙ্গভঙ্গী, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণ শক্তির পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন। উচ্চতা মাপিবার যন্ত্র পাওয়া না গেলে দেওয়ালে একটি ফুট ইঞ্চির স্কেল আঁকা যায় এবং জুতা খুলিয়া শিশুকে স্কেলের দিকে পিঠ করিয়া সম্পূর্ণ সোজা হইয়া দাঁড় করাইতে হইবে এবং মাথার শীর্ষস্থানের উপর দিয়া একটি কাঠি স্কেলের উপর লম্বভাবে রাখিয়া শিশুর উচ্চতা নির্ণয় করিতে হইবে। যদি ওজন মাপিবার যন্ত্র না পাওয়া যায় তাহা হইলে নিকটবর্তী কোন মুদীর দোকানে বন্দোবস্ত করিয়া শিশুদের ওজন করাইয়া আনিতে হইবে। প্রতি মাসে বা

তিনমাস অন্তর শিশুদের উচ্চতা ও ওজনের একটি ধারাবাহিক বিবরণী রাখিলে পিতামাতা ও শিক্ষক শিশুদের বৃদ্ধির ধরণটি বুঝিতে পারিবেন।

শিশু যখন বসিয়া থাকে, দাঁড়ায়, চলাফেরা করে, দৌড়ায়, খেলা করে তখন যদি দেখা যায় তাহার আঙ্গিক সংস্থান বা ভঙ্গী স্বাভাবিক নহে, বাঁকিয়া চুরিয়া দাঁড়ায়, খেলিবার সময় আড়ষ্ট হইয়া খেলে, কুঁকড়াইয়া বসে তাহা হইলে শিক্ষকের ইহার কারণগুলির অনুসন্ধান করা উচিত। অনেক সময় ক্লান্তি, অপুষ্টি, মন্দস্বাস্থ্য, হীনতাবোধ, অতিরিক্ত গর্ব বা আত্মবিশ্বাসের অভাবের ফলে শিশুকে অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গী করিতে দেখা যায়।

দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির নানারূপ পরীক্ষার উপায় আছে কিন্তু সেইগুলির বন্দোবস্ত অধিকাংশ বিদ্যালয়ে করা সম্ভব নহে, সেইজন্য শিক্ষককে নিজের পর্যবেক্ষণের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। দূর হইতে ব্লাকবোর্ডের লেখা শিশু দেখিতে পাইতেছে কি না, শিক্ষকের কথা সে পরিষ্কার শুনিতে পারিতেছে কি না, মাঝে মাঝে তাহার পরীক্ষা করা দরকার এবং যদি দৃষ্টি বা শ্রবণ শক্তির অল্পতা ধরা পড়ে তাহা হইলে অবিলম্বে তাহাকে উপযুক্ত ডাক্তারের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য।

যদি বিদ্যালয়ের নিজস্ব চিকিৎসক থাকেন তাহা হইলে স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করিতে পারেন। প্রতিরোধক ব্যবস্থা ও সুচিকিৎসার প্রতি তিনি পিতামাতা ও শিক্ষকের অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি বিদ্যালয়ে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনায় সাহায্য করিতে পারেন। একটি কার্যকরী স্বাস্থ্য বিবরণী রাখিবার প্রণালী উদ্ভাবন করিতে পারেন এবং পিতামাতা ও শিক্ষককে শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত রাখিতে পারেন এবং তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের জন্য সুপারিশ করিতে পারেন।

শিশু পর্যবেক্ষণের দ্বারা শিক্ষক শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের বিশিষ্ট ধরণটি সম্বন্ধে এবং যে অবস্থা বা কারণগুলি তাহার বৃদ্ধি ও বিকাশকে ব্যাহত বা পঙ্গু করিতেছে সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করেন। কিন্তু জ্ঞানলাভই শিশু পর্যবেক্ষণের একমাত্র লক্ষ্য নহে। এই জ্ঞানের সাহায্যে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশকে অব্যাহত রাখাই তাঁহার চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধন সুষ্ঠুভাবে করিতে

হইলে উপরে বর্ণিত বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা তিনি যে তথ্যগুলি সংগ্রহ করিবেন তাহাদের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

তাঁহার কাজের সুবিধার জন্য একটি প্রগতি পত্রে তিনি শিশু বা তাহার পিতামাতার সঙ্গে যে কথাবার্তা কহিয়াছেন তাহার সারাংশ লিখিয়া রাখিবেন। শিশুর হাতের কাজের নমুনাগুলি এবং যে পরীক্ষাগুলি তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। বৎসরের মধ্যে দুইবার বা তিনবার তিনি এই তথ্যগুলি একত্রে সমাবেশ করিয়া একটি ঐক্যসূত্র বাহির করিবার ও ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহার ফলে তিনি বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারা কোন্ পথে চলিয়াছে তাহার সন্ধান পাইবেন ও প্রয়োজনবোধে প্রত্যেক শিশুর জন্য পরামর্শ দিতে বা সুপারিশ করিতে পারিবেন।

যে সব ক্ষেত্রে শিশুকে বিশেষ ভাবে জানা দরকার হইয়া পড়ে, যেমন সে যদি বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও লেখা পড়ায় পিছাইয়া পড়িতে থাকে বা তাহার আচরণ বিদ্যালয়ের একটি সমস্যার বিষয় হইয়া পড়ে তাহা হইলে শিক্ষক কর্তৃক রক্ষিত প্রগতি পত্রের বিবরণী অপেক্ষা শিশুর সম্বন্ধে আরও বেশী গূঢ় অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং তাহার অতীত ও বর্তমান জীবনকে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিতে হয়। এইভাবে সংগৃহীত সমস্ত তথ্যের ঐক্য সাধন ও ব্যাখ্যার দ্বারা মূলীভূত কারণের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাকেই ব্যক্তিগত জীবনের গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়ন বা ইংরাজিতে case study বলা হয়।

শিক্ষক, পিতামাতা, চিকিৎসক, ধাত্রী এবং শিশুর সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মিলিত সম্মেলনে তাঁহারা তাঁহাদের সংগৃহীত তথ্যগুলি সকলের গোচরে উপস্থাপিত করেন এবং মিলিতভাবে তাঁহারা শিশুর আচরণের ব্যাখ্যা করেন। এই অলোচনার দ্বারা সকলেই উপকৃত হন এবং শিশুর বিকাশের আপাতঃ বিভিন্ন দিকগুলির সমন্বয় সাধন হয়। শিশুকে এইরূপে সমগ্রভাবে অধ্যয়ন করিলে তাহার বৃদ্ধি ও বিকাশের সহায়ক অবস্থা ও উপায়গুলির কার্যকরীভাবে প্রবর্তন করা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ

সাধারণতঃ দুই বৎসর বয়সের শেষাশেষি বা তিনবৎসর বয়সের প্রথমে শিশু নার্সারী স্কুলে ভর্তি হইতে আসে। তাহার জীবনের প্রথম দুই বৎসরে সে দেহে ও মনে খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার সমাজ পরিবেশ অর্থাৎ তাহার নিজের পরিবার ও প্রতিবেশীদের সমাজের রীতিনীতি ও আদব-কায়দা কিছুটা বুঝিয়াছে এবং মানিয়া চলিতে শিখিয়াছে। এই সময় হইতে প্রথম শৈশবের একান্ত পরনির্ভরশীলতা ত্যাগ করিয়া সে কিছুটা স্বাধীন ও আত্মনির্ভর হইতে চায় এবং যতটা পারে নিজের কাজকর্ম নিজের চেষ্টাতে করিতে চায়। তবে বাবা, মা এবং বড়দের স্নেহ আদর সে ভোগ করিতে চায় এবং কখন কখনও তাহাদের উপরও নির্ভরশীল থাকিতে চায়। এই অবস্থায় সবে তাহার একান্ত পরনির্ভরতা ছাড়িয়া স্বাধীন হইবার প্রেরণা জাগিতেছে, সুতরাং সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব—যথেষ্ট পরিমাণ পিতামাতার উপর নির্ভরশীলতারও তাহার প্রয়োজন আছে। তবে মোটের উপর সে ক্রমশঃ আত্মনির্ভরতার পথে আগাইয়া চলিতে থাকে। এখন সে পরিবারের মা, বাবা, ভাই, বোন ছাড়াও অন্য সাথীদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উপযোগী হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যালয়ের লেখাপড়া এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম কাজ-কর্মের জন্য তাহার দেহ মন তৈয়ার হয় নাই। সেইজন্য তাহাকে নার্সারী স্কুল বা প্রাক্ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। এখানে সে তাহার দেহ ও মনের উপযোগী পরিবেশ পায় এবং বিদ্যালয়ে যাইবার জন্য যোগ্যতা অর্জন করিতে থাকে।

বুঝিবার সুবিধার জন্য এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণীবিভাগের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য শৈশব কালকে নিম্নরূপে আমরা তিনভাগে ভাগ করিয়া লইব ঃ

বিদ্যালয়ের শ্রেণীবিভাগ	বৃদ্ধির কাল	বয়স
প্রাক্ বিদ্যালয়	শৈশব	২ বা ৩ হইতে ৫ বৎসর
১ম শ্রেণী হইতে ৩য় শ্রেণী	বাল্য	৬ হইতে ৮ বৎসর
৪র্থ শ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী	প্রাক্ কৈশোর	৯ হইতে ১৩ বা ১৪ বৎসর

শৈশব

শারীরিক বৃদ্ধি ঃ

এই সময় শিশুরা উচ্চতায় ও ওজনে বেশ তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকে। দৈর্ঘে শিশু কতটা বাড়িবে তাহা অবশ্য নির্ভর করে সে কতটা দীর্ঘ হইবে সেই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উপর। কিন্তু সে কত ভারী হইবে তাহা নির্ভর করে তাহার খাদ্য, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদির উপর। দুই বৎসর বয়সে শিশুর যাহা উচ্চতা ছিল পাঁচ বৎসর বয়স হইতে হইতে তাহা হইতে তাহার দ্বিগুণ উচ্চতা হইয়া যায়—প্রায় তিন ফুট চার ইঞ্চি সে দীর্ঘ হয়।

ভূমিষ্ট হইবার সময় শিশুর যাহা ওজন থাকে এক বৎসর বয়সে তাহার ওজন তদপেক্ষা দ্বিগুণ হয়। দুই এবং তিন বৎসর বয়সে প্রতিবৎসর প্রায় আড়াই সের করিয়া তাহার ওজন বাড়িতে থাকে, ইহার পর তাহার ওজন বৃদ্ধি কিছুটা কমিয়া আসে এবং পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাহার ওজন জন্মগ্রহণের সময়কার ওজন হইতে পাঁচগুণ বেশী হয়।

উচ্চতার সঙ্গে ওজনের একটি সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করিয়া উচ্চতা-ওজন তালিকা স্বাস্থ্য বা ডাক্তারী বইতে দেওয়া থাকে। সেই তালিকার সহিত কোন শিশুর বৃদ্ধি না মিলিলেই ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। শিশুর আয়তন, পরিপক্কতা ও দৈহিক বৃদ্ধির সামঞ্জস্য ও রোগ প্রতিরোধক শক্তি যদি বংশগতি ও স্বভাব অনুসারে হয় তাহা হইলে চিন্তার কোন কারণ নাই। তবে যদি বেশ কয়েকমাস ধরিয়া শিশুর কোনরূপ বৃদ্ধি না হইতে দেখা যায় তাহা হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত।

দেহাবয়বের বিভিন্ন অংশের অনুপাতের এই সময় পরিবর্তন হইতে আরম্ভ করে। জন্মপূর্ব ও কচি অবস্থায় মাথা এবং বুক খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং হাতপায়ের তুলনায় মাথা এবং বুকের অংশ বেশী বড় দেখায় কিন্তু এই সময় মাথা ও বুকের বৃদ্ধি পূর্বাপেক্ষা কমিতে থাকে এবং হাত পায়ের বৃদ্ধি বাড়িতে থাকে। ইহার ফলে পাঁচ বৎসর বয়সে শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুপাত প্রায় বয়স্কদের মত হইয়া যায়।

এই বয়সে অঙ্গভঙ্গীর বিকৃতি দেখা দিতে পারে। কুঁজা হইয়া দাঁড়ান, ঝাঁকিয়া বাঁকিয়া চলা ইত্যাদি দেখা দিলে বুঝিতে হইবে শিশুর স্বাস্থ্যহীনতা, অপুষ্টি, বা অন্য কারণ ঘটিয়াছে। সুচিকিৎসা ও যত্ন লইলে এই আঙ্গিক বিকৃতিগুলি দূর করা যায়।

শিশুদের তেজ উৎপাদনকারী খাদ্য খাইতে দিতে হইবে। আয়তন ও কর্ম-চাঞ্চল্য অনুসারে ১,৩০০ হইতে ১,৪০০ ক্যালোরী শিশুদের প্রত্যহ প্রয়োজন হয়। খাদ্য সম্বন্ধীয় পুস্তকে প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যের কত ক্যালোরী মূল্য আছে তাহা দেওয়া থাকে। তাহা দেখিয়া শিশু কত ক্যালোরী গ্রহণ করিতেছে জানা যাইবে এবং প্রয়োজন হইলে তাহার খাদ্যের পরিবর্তন করিতে হইবে। যদি দেখা যায় উপযুক্ত খাদ্য খাইতে দিয়াও শিশু নিস্তেজ ও কর্মহীন হইয়া পড়িতেছে তাহা হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া দরকার।

আড়াই বৎসর বয়সের সময় দুধ দাঁতের শেষ দাঁতগুলি অর্থাৎ কষ দাঁতগুলি উঠা উচিত। এই বয়সে শিশুর সম্পূর্ণ কুড়িটি দুধ দাঁত থাকিবে। শেষের দাঁতগুলি উঠিবার সময় শিশু মাড়ীতে কিছু যন্ত্রণা ভোগ করে। আড়াই বৎসর ও পাঁচ বৎসর বয়সে শিশুদের দন্তক্ষয় রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। খাইবার পর নিয়মিত দাঁত মাজা বা মুখ ধোওয়া অভ্যাস করিলে কিছুটা উপশম হইতে পারে।

শিশুর বৃদ্ধিকে অব্যাহত ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে তাহাকে পুষ্টিকর ও রুচিকর খাদ্য দিতে হইবে। তাহার খাদ্য সে যেন বেশ হাসিখুশী অবস্থায় খাইতে পারে। এইসময় তাহাকে খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি, রাগারাগি, জবরদস্তী যেন না করা হয়। পুষ্টিকর খাদ্য মাত্রই শিশু পছন্দ নাও করিতে পারে, সুতরাং খাদ্যকে এমনভাবে রাঁধিতে হইবে এবং পরিবেশন করিতে হইবে যাহাতে শিশু খাইতে আগ্রহবোধ করে এবং সুখ ও শান্তির সহিত খাদ্য উপভোগ করিতে পারে। স্নেহ ও বিচক্ষণতার সহিত শিশুকে নানারূপ পুষ্টিকর খাদ্যের সহিত পরিচিত করা যায় এবং পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস গঠন করা যায়। জোর-জবরদস্তী করিয়া খাওয়াইবার ফলে শিশুর খাদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া যায় এবং তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার ভয় থাকে। শিশু বাড়ীর ভিতরে ও বাহিরে যে

খেলাধূলা ও কাজকর্ম করে এবং সে যে পরিমাণ বিশ্রাম পায় তাহা যেন তাহার পক্ষে যথোপযোগী ও পর্যাপ্ত হয়। কিছু পরিমাণ সূর্যকিরণ তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল কিন্তু বেশী পরিমাণ অহিতকর। তাহার খেলার সঙ্গী-সাথী যেন থাকে এবং কিছু সময় পিতামাতার কাছে সে যেন থাকিতে পায়।

শিশুরা এইসময় স্বাধীনতা, শাসন ও সহায়তা এই তিনটিই উপযুক্ত পরিমাণে পাইতে চায়।

মাঝে মাঝে বন্ধুভাবাপন্ন ডাক্তারের দ্বারা শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা হওয়া দরকার। অনেক শিশু ডাক্তারের কাছে যাইতে ভয় পায়। তাহাদের লইয়া ডাক্তার-রোগী অভিনয় করিলে ক্রমে ক্রমে ভয় কাটিয়া গিয়া ডাক্তারের কাছে যাইবার আগ্রহ জন্মাইতে পারে।

ক্রিয়াত্মক (motor) সামর্থ্যের বিকাশ।

আমরা জানি শিশুরা সদাচঞ্চল। শিশু চঞ্চল না হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার মাংসপেশীগুলি দ্রুত পরিপক্বতা লাভ করিতে থাকে ও তাহাদের সুষম বৃদ্ধির পক্ষে কর্মচাঞ্চল্য একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেইজন্য শিশু শ্রমসাধ্য কাজ করিয়া প্রভূত সন্তোষ লাভ করে। দুই বৎসর বয়সের মধ্যেই শিশু চলিতে, দৌড়াইতে ও উঁচু জায়গায় চড়িতে শিখে। এই নব অর্জিত শক্তির সাহায্যে সে নূতন স্থানে যাইতে পারে, অন্য ব্যক্তিদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারে, এবং নব নব অভিজ্ঞতা লাভ করে। প্রত্যেক জিনিষই তাহার কাছে মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়ায় এবং প্রত্যেকের সম্বন্ধে তাহার কিছু করিবার থাকে। আবার কোন জিনিষেই সে নিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, একবস্তু হইতে অন্য বস্তুতে সে ক্রমাগত ছটফট করিয়া ঘুরিতে থাকে।

শিশু যতই বড় হইতে থাকে ততই তাহার মাংসপেশীগুলির সাহায্যে যে কাজগুলি করে তাহাদের গতি, নির্ভুলতা ও শক্তি বাড়িতে থাকে। প্রথমে শিশু টলিতে টলিতে হাঁটে, বার বার পড়িয়া যায় কিন্তু যত বড় হইতে থাকে তত সে দৃঢ়ভাবে সমানতালে পা ফেলিয়া চলিতে পারে। সিঁড়িতে উঠানামা করিতে, চড়িবার কিছু পাইলে চড়িতে, লাফাইতে, এবং ট্রাইসাইকেল থাকিলে

তাহা চড়িয়া বেড়াইতে শিখে ও খুব আমোদ পায়। এই সময় মাংসপেশী-গুলির নিয়ন্ত্রণ ও শক্তি তাড়াতাড়ি বাড়ে। তিন বৎসর বয়সে শিশু যত তাড়াতাড়ি দৌড়াইতে, চড়িতে ও লাফাইতে পারে চার বৎসর বয়স হইলে সে অনেক বেশী দ্রুত দৌড়াইতে, উচ্চতর স্থানে চড়িতে ও অধিকতর সুকৌশলে লাফ দিতেও সক্ষম হয়। এই সময় বল খেলিতে শিশুরা খুব ভালবাসে। এখন দৌড়াইতে গিয়া বেশী পড়িয়া যায় না এবং বেশী আঘাত পায় না। বেশী দূর অবধি চলিতে ও দৌড়াইতে সক্ষম হয়। স্বাভাবিক নিয়মেই এই সময় তাহাদের মাংসপেশীগুলি সদা সক্রিয় ও কর্ম চঞ্চল থাকিতে চায়। সারাদিন খেলাধূলা করিয়া তাহারা ক্লান্ত হয় না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই তাহাদের পক্ষে বিশেষ ক্লান্তিকর হইয়া উঠে। এইজন্যই নার্সারী স্কুলে নানারকম খেলা ও ছোটদের উপযোগী কাজকর্মের ব্যবস্থা থাকে।

এই বয়সে ছন্দের জ্ঞান জন্মিতে থাকে। গীতবাদ্যের সঙ্গে হাত দিয়া তাল দিতে পারে ও তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতেও পারে। অপেক্ষাকৃত দ্রুত ছন্দই তাহাদের পক্ষে উপযোগী।

শিশুর সারা দেহে এই যে চাঞ্চল্য ও ছন্দময়তা ব্যাপিয়া থাকে তাহা প্রথমে অনির্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন হইলেও ক্রমে ক্রমে মানসিক ও সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রত্যেক কাজটি উদ্দেশ্যমূলক হইয়া দাঁড়ায়।

দেহের বড় বড় মাংসপেশীগুলি যত তাড়াতাড়ি গতি ও শক্তিতে বাড়িতে থাকে সূক্ষ্ম মাংসপেশীগুলির নিয়ন্ত্রণ ও কর্মদক্ষতা তদপেক্ষা ধীর গতিতে চলে। চোখ ও হাতের বা চোখ ও আঙ্গুলের সমন্বয় আস্তে আস্তে হইতে থাকে। চোখ ও হাত বা আঙ্গুলের সমন্বয়ের অর্থ চোখ দিয়া দেখিয়া হাত বা আঙ্গুলকে কোন কাজ করিতে পরিচালনা করা। যেমন দেখা যায় দুই তিন বৎসরের শিশুরা পেরেক ঠুকিতে খুব আমোদ পায়। পেরেকটিকে আঙ্গুলে ধরিয়া পেরেকের মাথায় হাতুড়ীর ঘা দেওয়া শিশুদের পক্ষে বেশ সূক্ষ্ম চোখ-হাত বা চোখ-আঙ্গুল সমন্বয়ের কাজ। তিন চার বৎসর বয়সে শিশুরা কাগজ হইতে ছবি কাটিয়া লইতে শিখে। পাঁচ বৎসর বয়সে ছোট ছোট যন্ত্রের ব্যবহার শিখে এবং নানারকম জিনিষ তৈয়ারী করে।

শিশুদের তৈয়ারী এইসব মাটি, কাগজ, সোলা, পিচবোর্ড, কাঠ ইত্যাদির জিনিষ সর্বাঙ্গসুন্দর না হইতে পারে, কিন্তু এইসব হাতের কাজের মধ্য দিয়া তাহাদের যে ক্রিয়াত্মক সামর্থ্যের বিকাশ সাধিত হয় তাহার মূল্য যথেষ্ট আছে।

এইসব খেলাধূলার কাজ ছাড়াও নার্সারী স্কুলের শিশু তাহার উপযোগী অনেক গৃহকাজও করিতে চায়। তাহার উপযোগী কাজ দিলে সে মাকে অনেক রকমভাবে সাহায্য করিতে পারে। তাহার পক্ষে আয়না পরিষ্কার করা খুব আনন্দের কাজ। বই ও সাময়িক পত্রিকাগুলি সুষ্ঠুভাবে গুছাইয়া রাখা, গাছে জল দেওয়া, খাবারের সময় থালা বাটি সাজান, টিফিনের সময় ফল বিস্কুট প্রভৃতি অন্যদের বণ্টন করা, শাক, পাতা, পান একটি একটি করিয়া ধোওয়া, পোষা পশুপক্ষীদের খাওয়ান ইত্যাদি অনেক টুকিটাকি গৃহকাজ সে করিতে পারে ও ভালবাসে। এইভাবে নিযুক্ত রাখিলে ঘরের শান্তিও বজায় থাকে এবং শিশুও সত্যকার 'মানুষ' হইয়া উঠিতে থাকে।

তাহার যখন আর একটু বয়স বাড়ে, তখন খেলা হইয়া গেলে খেলনাগুলি নির্দিষ্ট বাক্সে রাখিতে শিখে, কাপড় চোপড় বেশী না ভিজাইয়া হাত মুখ ধুইতে শিখে। এই সময় দুধ ফেলিয়া না দিয়া বাটিভর্তী দুধ লইয়া আসিতে ও কুঁজা হইতে জল গড়াইতে ক্রমশঃ সক্ষম হয়। এই সব সামর্থ্যের অধিকারী হওয়ার ফলে তাহার আত্মসম্মান বাড়িতে থাকে।

মা এই সব ছোট ছোট কাজ শিশুকে করিতে দিবেন। সে ইহাতে পরম সন্তোষ লাভ করিবে এবং বুঝিবে যে সত্য সত্যই সে তাহার মাকে সাহায্য করিতেছে। এই ভাবেই সে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার পথে পদক্ষেপ করিতে পারিবে।

মানসিক বিকাশ

শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনও ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে এবং সে নানারূপ মানসিক শক্তির অধিকারী হইতে থাকে। মনের

বিকাশ তাহার কথাবার্তা ও কাজকর্মের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। মানসিক শক্তিকেই আমরা বুদ্ধি বলিয়া থাকি। শিশুর ভাষাজ্ঞান তাহার মানসিক বিকাশের পরিচয় দেয়। শুধু শব্দজ্ঞান নহে, শব্দ সমূহ সে কিভাবে ব্যবহার করে তাহাদ্বারাও তাহার বৌদ্ধিক বিকাশের ধারণা পাওয়া যায়। ইহাছাড়া নিভু'লভাবে প্রত্যেক অবস্থাকে প্রত্যক্ষ (perceive) করা, বস্তু বা ঘটনার পরস্পরের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া, স্মরণ রাখা, বিচার শক্তির ব্যবহার করা এবং সমস্যা সমাধান করিবার জন্য লাগিয়া থাকা—এই শক্তিগুলিও বুদ্ধির লক্ষণ।

মনোযোগ।

মানসিক শক্তিগুলির মধ্যে একটি প্রধান শক্তি মনোযোগ দিতে পারা। মনোযোগ ছাড়া কোন কাজই হইতে পারে না। মনোযোগ সেই কাজেই দেওয়া যায় যাহার জন্য আমরা একটি তাগিদ অনুভব করি বা অতীত অভিজ্ঞতা হইতে বুঝি যে ইহাতে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সামাজিক চাপেও মনোযোগ দিতে হয়। সাধারণতঃ যে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয় তাহা স্মরণে থাকে। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনোযোগ দিবার ক্ষমতা বাড়িতে থাকে। এই বয়সের শিশুরা কোন একটি খেলায় বা কাজে বেশীক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না। বয়সভেদে সাধারণতঃ সাত হইতে কুড়ি মিনিট পর্যন্ত তাহাদের একটি বিষয়ে মনোযোগ ধরিয়া রাখিতে দেখা যায়। তবে বিষয়টি খুব চিত্তাকর্ষক হইলে কোন কোন শিশু অনেক বেশীক্ষণ সময় পর্যন্ত মনোযোগ দেয়।

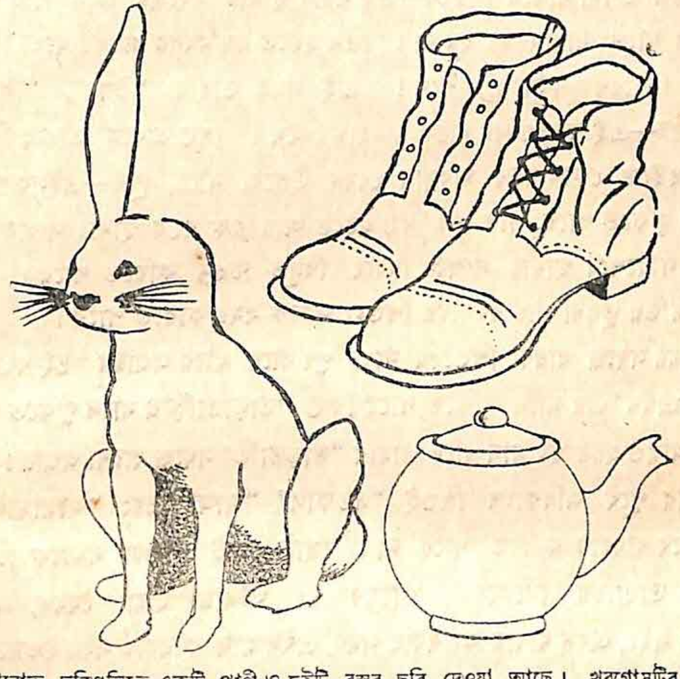
প্রত্যক্ষ।

শিশুরা যাহা কিছু দেখে তাহা সমগ্রভাবে দেখে। যে অংশগুলি দিয়া সমগ্র বস্তুটি গঠিত সেইদিকে তাহাদের নজর থাকে না; সমগ্র জিনিষটিই তাহাদের কাছে অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে। ইহার পরে বড় বড় অংশগুলি তাহাদের প্রত্যক্ষগোচর হইতে থাকে। প্রথম তিন বৎসর পর্যন্ত স্পষ্টভাবে

ও নির্ভুলভাবে কোন জিনিষ অনুভব করিতে পারে না—তাহার প্রত্যক্ষের ভিতর অস্পষ্টতা ও ভুল থাকিয়া যায়। তাহার প্রত্যক্ষের ভিতর কল্পনা ও বাস্তব মিলিয়া মিশিয়া থাকে। ছবির সহিত আসল বস্তুর, জড় পদার্থের সহিত জীবন্ত প্রাণীর সে প্রায়ই গোলমাল করিয়া ফেলে। অভিজ্ঞতা বাড়িবার সহিত তাহার প্রত্যক্ষ স্পষ্ট ও নির্ভুল হইতে থাকে। তখন শুধু বস্তুর আকার নহে, তাহার আয়তন, তাহা মোলায়েম, শক্ত বা খস্‌খসে কিনা, স্থির অবস্থায় আছে না চলন্ত অবস্থায় আছে, বর্ণ কি, দূরত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান হয়।

চক্ষু, কর্ণ, স্পর্শ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহিরের জিনিষের জ্ঞান পাওয়া যায়। আবার সেই জিনিষগুলির কাছে যাইয়া, ব্যবহার করিয়া আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানগুলিকে অর্থপূর্ণ করিয়া তুলি। এই কাজ সংবেদ-চেষ্টীয় কাজ বলা হয়। এইরূপ সংবেদ-চেষ্টীয় কাজের ফলেই বাহিরের জগতের সঠিক প্রত্যক্ষ লাভ করা যায়। একটি উদাহরণ লওয়া যাউক। বাড়ীর কুকুরটিকে যদি খোকাবাবুকে কেবল দূর হইতেই দেখান হয় এবং তাহাকে স্পর্শ করা বা অন্য উপায়ে তাহার সংস্পর্শে না আসিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে কুকুর সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ পূর্ণাঙ্গ হয় না। সে কেবল দেখে একটা পিণ্ড, যাহা নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়, মেঝে আঁচড়ায় ও ডাকে। কুকুরকে যদি স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় তবে সে জানিতে পারে ইহার স্পর্শ কিরকম ও ইহার উষ্ণতাও বুঝিতে পারে। তাহার পরে যখন সে কুকুরটিকে ধরিয়া তোলে তখন ইহার ওজন, আকার, গড়ন এই সমস্তই জানিতে পারে। তখন আর কুকুর তাহার কাছে নির্বিশেষ পিণ্ড হিসাবে দৃষ্ট হয় না। তাহার পরে যখন সে কুকুরের সঙ্গে খেলা করিতে পারে তখন সে ইহাকে গড়াইতে, চলিতে, দৌড়াইতে দেখে ও গর্জন করিতে, গোঙাইতে ও চীৎকার করিতে শোনে। এইভাবে কুকুর সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে থাকে। এইভাবে সংবেদ-চেষ্টীয় কাজের মধ্য দিয়া শিশুর বহির্জগতের প্রত্যক্ষগুলি পূর্ণাঙ্গ ও অর্থপূর্ণ হয়। কুকুরের সহিত শিশু যে অভিজ্ঞতা লাভ করে সেই অনুষঙ্গ তাহার স্মৃতিতে থাকে এবং পরে কুকুরকে দেখিলে, দর্শনের সহিত অনুষঙ্গের প্রতিরূপ-

গুলিও যুক্ত হইয়া কুকুরের পূর্ণ প্রত্যক্ষ লাভ হয় অর্থাৎ শুধু কুকুরের চেহারা নহে তাহার ওজন, উষ্ণতা, প্রকৃতি প্রভৃতি মনে একসঙ্গে অলক্ষ্যে জাগিয়া উঠে।



উপরোক্ত ছবিগুলিতে একটি প্রাণী ও দুইটি বস্তুর ছবি দেওয়া আছে। খরগোসটির একটি কান নাই, একটি বুটজুতার ফিতা নাই এবং পাত্রটির হাতল নাই। এই অভীক্ষাদ্বারা শিশুদের হারান অংশগুলি বাহির করিতে বলা হয় এবং তাহা দ্বারা তাহাদের সম্বন্ধে দেখিতে পাইবার শক্তির বিচার করা হয়।

সম্বন্ধ দেখা।

সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া মনের একটি শ্রেষ্ঠ শক্তি। জিনিষপত্রের নাম, তাহারা কি দিয়া তৈয়ারী হইয়াছে এবং তাহাদের দ্বারা কি কার্য হয়—এইসব জানিবার পরে শিশুরা ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করে।

ছবির বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একত্রে সাজান, ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ মেলান, যেমন তালার সঙ্গে চাবি, হাঁড়ির সঙ্গে হাতা, গাছের সঙ্গে পাতা ইত্যাদি, বিভিন্ন

ওজনের বস্তু এবং বিভিন্ন দৈর্ঘের রেখার প্রভেদ দেখান—এই সকল সামর্থ্যের ক্রমবিকাশ ঘটিতে থাকে তিন হইতে পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুদের মধ্যে, উপর নীচ, তলা উপর, সামনে পিছনে—এই সকল স্থানীয় সম্বন্ধের জ্ঞান পাঁচ বৎসর বয়সের আগে সাধারণতঃ হয় না। তিন হইতে ছয় বৎসর বয়সের মধ্যে শিশুরা দূরত্ব নির্ধারণ করিতে শিখে। এই সময় তাহারা "উপর", "পিছন", "হইতে"—এই কথাগুলির সঠিক ব্যবহার শিখে। শিশু প্রথমে তাহার নিজের স্থান হইতে কোন বস্তুর অবস্থান যেমন উপরে, নীচে, দূরে—এইসব স্থানীয় সম্পর্ক বুঝিতে পারে, পরে এক বস্তু হইতে আর এক বস্তুর স্থানীয় সম্পর্ক বুঝে এবং পরিশেষে স্থানীয় সম্পর্ক বিষয়ে বিমূর্ত চিন্তন করিতে পারে। দুইটি বস্তুর গতির তুলনা পাঁচ বৎসরের শিশুরা অনেক সময় করিতে পারে।

সময় সম্বন্ধে ধারণা শিশুদের মধ্যে খুব ধীরে ধীরে জন্মায়। দুই বৎসরের শিশু "এখন" এর মানে বুঝিতে পারে কিন্তু "তাড়াতাড়ি"র মানে বুঝিতে পারে না। আরও হয়ত ছয় মাস বাদে তাহার "তাড়তাড়ি" সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়। পাঁচ বৎসরের পূর্বে অধিকাংশ শিশুই "গতকাল" "আজ" এবং "আগামীকাল" শুদ্ধভাবে ব্যবহার করিতে পারে না। ছোট ছোট শিশুরা সময়কে চিহ্নিত করে তাহাদের নিজেদের আচরণ বা ঘটনার দ্বারা যেমন, এখন খেলার সময়, এখন বাবার আসিবার সময়, এখন স্নান করিবার সময় ইত্যাদি।

ধারণা।

প্রত্যক্ষের সাহায্যে ধারণার উৎপত্তি হয়। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, শিশু কুকুরের নিকট হইতে যে বিভিন্ন সংবেদনগুলি পাইয়াছে, অর্থাৎ তাহাকে দেখিয়া, স্পর্শ করিয়া, তাহার উষ্ণতা অনুভব করিয়া, শব্দ শুনিয়া, তাহাকে ঘ্রাণ করিয়া, তাহার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া এবং তাহার সম্বন্ধে শিশুর যে প্রক্ষোভ সঞ্চার হইয়াছে অর্থাৎ কুকুর দেখিয়া সে ভয় পাইয়াছে, বা তাহার আনন্দ সঞ্চার হইয়াছে, এইসব সংবেদন ও প্রক্ষোভ সম্মিলিত হইয়া কুকুর সম্বন্ধে তাহার একটি প্রত্যয় বা ধারণা জন্মায়। ইহার পর কুকুরের কোন প্রতীক, যেমন ছবি বা "কুকুর" এই শব্দটি, যখন সে দেখে বা শুনে তখনই

কুকুর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালব্ধ ভাবমূর্তিটি তাহার মনে আসিয়া উপস্থিত হয়—বস্তুর উপস্থিতি ছাড়াও তাহার প্রতীকের সাহায্যে যে ভাবরূপের জাগরণ হয় তাহাকেই ধারণা বলা হয়। ধারণার স্পষ্টতা আরও নির্ভর করে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর পার্থক্য অনুভব করার উপর। প্রথমে শিশু হয়ত লোমশ ও কোমল জন্তু মাত্রকেই কুকুর বলে, পরে কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির পার্থক্য বুঝিতে পারে এবং তাহাদের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা হয়। যতদিন না পর্যন্ত শিশু ভাষা ব্যবহার করিতে শিখে ও বিভিন্ন বস্তুর নাম না দিতে পারে ততদিন তাহার পক্ষে বস্তুদিগের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরুপণ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। শিশুর যখন বিষয় সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় তখন সে কোন বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে বলিতে ও চিন্তা করিতে পারে। অবশ্য এইরূপ ক্ষমতা প্রাক্ বিদ্যালয় শিশুদের শেষ বয়সেই দেখা যায়।

এই সময় সংখ্যা সম্বন্ধেও শিশুদের ধারণা জন্মাইতে থাকে। দুই বৎসরের শিশুরা "এক" এবং "অনেক" কেবল এই দুইয়েরই তফাৎ বুঝে। তিন বৎসর বয়সে "দুই" এর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে। শিশুরা "এক", "দুই", "তিন" ইত্যাদিকে নাম বলিয়া মনে করে। যদি অনেকগুলি আম পর পর সাজাইয়া রাখা হয় এবং শিশুকে গুণিতে বলা হয় তাহা হইলে সারির প্রথম আমটির সে নাম রাখিবে "এক", দ্বিতীয়টির "দুই"। যদি তাহাকে বলা হয় তিনটি আম আন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সে তৃতীয় আমটি লইয়া আসিবে, কারণ তৃতীয় আমটির নাম "তিন"। সংখ্যা, ওজন ও আয়তনের মাপ সম্বন্ধে এই বয়সে তাহারা যে ধারণা পায় পরবর্তী বিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষার তাহাই ভিত্তিস্বরূপ হইয়া থাকে।

সমস্যা সমাধান।

শিশু যখন অসুবিধায় পড়ে অথবা সে যাহা চায় তাহা তখনি না পায় তখন তাহাকে এই সমস্যাগুলি সমাধান করিবার জন্য ভাবিতে হয়। খেলিতে খেলিতে বলটি যদি আলমারীর তলায় হারাইয়া যায় তাহা হইলে খানিকক্ষণ হাত দিয়া বাহির করার চেষ্টা করে এবং অকৃতকার্য হইলে

একটি লাঠির সাহায্যে বলটি ঠেলিয়া বাহির করে। তাহার নাগালের বাহিরে উঁচু সেল্ফে তাহার প্রিয় খেলনাটি রাখিয়া দিলে সে হয়ত টুলের উপর উঠিয়া তাহা পাড়িয়া লইবে। কাঠের ব্লক দিয়া টাওয়ার গড়িতে গিয়া যদি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায় তবে তাহাকে এমন ভাবে ব্লকগুলি স্থাপন করিতে হয় যাহাতে দৃঢ়ভাবে সেইগুলি বসিয়া থাকে। সোজাসুজি সামনের দিকে যাইতে যদি বাধা পায় তবে সে ঘুরিয়া গিয়া গন্তব্য স্থলে পৌঁছায়। এইভাবে শিশুরা নানাভাবে তাহাদের সমস্যা সমাধান করিতে পারে। তাহারা সাধারণতঃ নিজের চেষ্টায় সমস্যা সমাধান করিতে চায় এবং যে উপায়গুলি কাজে লাগে সেইগুলি মনে রাখে আর অন্যগুলি পরিত্যাগ করে। যেগুলি শিশুদের সাধ্যের মধ্যে বড়রা সেইগুলির সমাধান করিয়া না দিয়া তাহাদেরই করিতে দেওয়া উচিত।

স্মৃতি।

বর্তমানকে বুঝিবার জন্য অতীতের স্মৃতি অত্যাবশ্যক। বয়স বাড়িবার সহিত স্মৃতিশক্তিও বাড়িতে থাকে। এই বয়সের কোন কোন শিশুর মধ্যে একরকম অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি দেখা যায়। তাহারা মনোযোগ দিয়া যে জিনিষের প্রতি কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকে তাহা যেন তাহাদের মানসপটে ফটোগ্রাফের ছবির মত চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া যায়, অনেক বৎসর বাদেও এই ছবি তাহারা আসল জিনিষের মত দেখিতে পায়।

এই বয়সের শিশুদের বুদ্ধির অভীক্ষায় নিম্নোক্ত বুদ্ধির পরীক্ষা থাকে।

তিনবৎসর বয়সে ঃ

অনেকগুলি জীবজন্তু সম্বলিত ছবির কার্ড দেখিয়া পূর্ব পরিচিত জন্তুটিকে বাছিয়া দেওয়া।

তিনটি সংখ্যা পরপর শুনিয়া পুনরাবৃত্তি করা।

চারবৎসর বয়সে ঃ

পূর্ব প্রদর্শিত তিনটি বস্তুর মধ্যে একটিকে লুকাইয়া ফেলিলে, কোন্‌টি হারাইয়া গেল বলা।

চারটি সংখ্যা পরপর শুনিয়া পুনরাবৃত্তি করা। নির্দেশগুলি মনে রাখিয়া ও বুঝিয়া সহজ সহজ আদেশ মানা।

অপ্রিয় অপেক্ষা প্রিয় জিনিষগুলিই স্মরণ থাকে বেশী।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ।

এই বয়সের শিশুদের মধ্যে মানসিক শক্তির তারতম্য দেখা যায়। এমন কি একই পরিবারের মধ্যেও ইহা দৃষ্টিগোচর হয়। এই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদের এক অন্তে আছে উণমানসতা ও অপর অন্তে আছে মনস্বীতা। খুব দুর্বল বুদ্ধি বা উণমানসতা শিশুর মধ্যে দেখা গেলে তাহার দস্তরমত রোগ পরীক্ষা হওয়া উচিত। অনুকূল পরিবেশের মধ্যে শিশু কিভাবে নানা জিনিষ শিখিতে থাকে তাহার বিশদ পর্যবেক্ষণের দ্বারাই শিশুর বুদ্ধি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উপরে যে মানসিক সামর্থ্যগুলির আলোচনা করা হইল ইহাদিগকে একত্রে বৌদ্ধিক বিকাশও বলা যাইতে পারে। মনোবিদরা গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বুদ্ধির পরীক্ষা চালাইয়া যাইতেছেন, কিন্তু কোন সর্বসম্মত বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্ণীত হয় নাই। পরিবেশের সহিত অভিযোজন বা খাপ খাইয়া চলা, শিখিতে পারা এবং বিমূর্ত চিন্তা করিবার সামর্থ্যর উপর বেশীরভাগ বুদ্ধির সংজ্ঞা জোর দিয়াছে।

কথা অপেক্ষা কাজের মধ্য দিয়াই এই বয়সের শিশুদের মনের সক্রিয়তা প্রকাশিত হয়। এই সক্রিয়তা তাহার কাজকর্ম, আচরণ, দৈনন্দিন জীবনের অসুবিধাগুলি দূরীকরণ—এইসবের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, পরিচিত ও বর্তমান অভিজ্ঞতা লইয়াই এখন সে চিন্তা করিতে পারে।

আমরা জানি শারীরিক সংস্থান ও বিকাশের সহিত মানসিক শক্তির বিকাশ নিকট সম্বন্ধযুক্ত। ইহার মধ্যে বুদ্ধির সম্বন্ধ নার্ভতন্ত্রের গঠন ও গুণের সহিত। নার্ভতন্ত্রের গঠন ও গুণ জন্মগত সুতরাং ইহার পরিবর্তন ঘটান সম্ভব নহে। তবে শিশুর বুদ্ধির বিকাশের যতটুকু সম্ভাবনা আছে তাহার সুবন্দোবস্ত নিম্নোক্তরূপে করা যাইতে পারে।

গৃহে শিশু যেন স্নেহপূর্ণ ব্যবহার ও শিক্ষা পায়। তাহার শিক্ষার পথের বাধা যেমন, পিতামাতার প্রতিকূল মনোভাব, পরিবেশের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে, প্রক্ষোভজনিত বিঘ্ন—এই গুলিকে যতদূর সম্ভব দূর করা।

শারীরিক রোগ ও অপুষ্টি থাকিলে তাহার বিহিত করা।

শিশুকে এমন পরিবেশে রাখিতে হইবে যাহাতে সে যেন তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচালনা করিতে পারে এবং কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারে। নার্সারী স্কুলে নানারূপ শিক্ষার বিষয় থাকে এবং সামাজিক মেলামেশার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। সম্ভব হইলে তাহাকে নার্সারী স্কুলে ভর্তি করাইয়া দেওয়া উচিত।

শিশুর সামর্থ্যের বাহিরে কাজ করিবার জন্য চাপ দেওয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সামাজিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশ।

এই বয়সের শিশুর সামাজিক জগত ক্রমশঃ বিস্তৃততর হইতে থাকে। প্রথমে কেবল মায়ের সহিতই তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। ক্রমে বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সংস্রবে আসে এবং তাহার পরে স্থানীয় নিজের সমবয়সী শিশুদের সহিত যোগাযোগ আরম্ভ হয়। অন্য শিশুদের সহিত যোগাযোগ খেলার মাধ্যমেই ঘটিয়া থাকে। শিশু সামাজিক হইয়া উঠে কেন, ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে কাজকর্ম ও খেলাধূলায় লিপ্ত হইবার, অন্যদের সাহচর্য লাভ করিবার এবং অন্যরা তাহাকে তাহাদের একজন বলিয়া স্বীকার করুক এবং তাহার কাজকর্মের অনুমোদন এবং প্রশংসা করুক—এইসকল ইচ্ছা তাহাকে সামাজিক করিয়া তোলে।

শিশু যখন অন্য শিশুর সান্নিধ্যে আসে, সে তখন তাহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখে যেমন সে পরিবেশের অন্য জড়বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করে। এখন সে সামাজিক আদানপ্রদান করিতে তেমন সক্ষম হয় না। দুই বৎসর বয়সের শিশুরা যখন খেলা করে তখন তাহাদের পরস্পরের খেলার মধ্যে কোন যোগ থাকে না, পরস্পরের পাশে বসিয়া তাহারা আপন আপন খেলা খেলিয়া যায়। সঙ্গী যদি খেলাতে হস্তক্ষেপ না করে তাহা হইলে শিশু তাহার সহিত এইরূপ

সমান্তরাল খেলা খেলিয়া যাইতে পারে। সঙ্গী-সাথীরা কাছে থাকিলেও দুই বৎসর বয়সের শিশুদের একলা একলা খেলিবার দিকেই ঝোঁক বেশী থাকে। সাথীরা তাহাদের সহিত খেলিতে চাহিলেও তাহারা সবসময় রাজী হয় না।

কৌতূহলের বিষয় থাকিলে তাহারা প্রায়ই একত্র হয়। অনেক শিশুকে একই জিনিষ অনুকরণ করিয়া করিতে দেখা যায়। চার বৎসর বয়সের পূর্বে প্রতিযোগিতা বা সহযোগিতার কোন অর্থ তাহাদের কাছে থাকে না। পাঁচ বৎসর বয়স হইলে শিশুরা সকলে মিলিয়া প্রায়ই দলগত খেলায় নিযুক্ত থাকে। তবে এই বয়সেও তাহারা ব্যক্তিগত খেলাতেও অনেক সময় কাটায়।

অনুকূল সামাজিক পরিবেশ ও সহায়তা পাইলে শিশুর মধ্যে সামাজিকতার বিকাশ হইতে থাকে।

নিম্নোক্তভাবে তাহার এই বিকাশ ঘটিতে থাকে।

সে ক্রমশঃ অধিক সময় অন্য শিশুদের সঙ্গে থাকে এবং তাহার সাথীর সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। অন্যদের সহিত সম্পর্ক স্থাপনে সে নৈপুণ্য অর্জন করে। জিনিষপত্র অন্যদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ব্যবহার করিতে শিখে এবং অন্য শিশুদের সহিতও জিনিষপত্র লইয়া অধিকক্ষণ সময় ধরিয়া খেলা করিতে পারে। পরিবারের মধ্যে শিশু যদি ভাইবোন বা অন্য শিশুদের খেলিবার সাথীরূপে পায় অথবা সে যদি নার্সারী স্কুলে মানুষ হয় তাহা হইলে তাহার সামাজিক বিকাশ পরিপূর্ণ ও অব্যাহত হয়। এইরূপ খেলাধূলার মধ্য দিয়াই শিশু সামাজিক লেনদেন করিতে শিখে।

কোন কোন শিশুর মধ্যে অতিরিক্ত পরনির্ভরশীলতা দেখা যায়। স্নেহাদরের অভাব ঘটিলে, কচি অবস্থায় কিছু হইতে বঞ্চিত হইলে, অতিরিক্ত রক্ষণাবেক্ষণ-কারী পিতামাতা থাকিলে, সাথীদের সহিত সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করিবার পটুত্বের অভাব থাকিলে অতিরিক্ত পরনির্ভরশীলতা দেখা দিতে পারে। বেশী দিন ধরিয়া কষ্ট সহিতে হইলে বা রোগ ভোগ করিতে হইলে শিশুকে সামাজিক সংস্রব ত্যাগ করিতে দেখা যায়।

শিশুর সঙ্গীসাথী কতজন আছে এবং তাহাদের সহিত সে কতক্ষণ খেলা

করে, ইহাতেই তাহার সামাজিক বিকাশ সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। ইহা হইতেও গুরুত্বপূর্ণ তাহার সামাজিক ব্যবহারের স্বরূপ। তাহার সামাজিক আচরণ সহানুভূতিশীল হইতে পারে অথবা তাহা আক্রমণ বা আক্রোশময় হইতে পারে। সে সব কাজে আগাইয়া যাইতে পারে বা লাজুক হইতে পারে। সে নূতন নূতন খেলা বা কাজের প্রবর্তনা করিতে পারে বা শুধু অন্যকে অনুকরণ বা মানিয়া চলিতে পারে। একই শিশু আবার সহানুভূতি, আক্রোশ ও নেতৃত্ব তাহার আচরণে দেখাইতে পারে, তবে অবস্থাবিশেষে কোন কোন শিশুরা প্রধানতঃ সানুহভূতিশীল এবং কেহ কেহ আক্রমণাত্মক ব্যবহার করে।

সহানুভূতিশীল ব্যবহার।

এই বয়সের শিশু অন্য শিশুর দুঃখকষ্ট খানিকটা বুঝিতে পারে এবং সমব্যথা অনুভব করে। তবে সহানুভূতিশীল ব্যবহার সব সময় তাহার আন্তরিক অনুভূতির দ্যোতক নাও হইতে পারে। পড়িয়া গেলে বাড়ীর লোক হয়ত "আহা", "আহা", করিয়া তাহাকে সমবেদনা দেখায়, অন্য শিশু পড়িয়া গেলে বাড়ীর লোকের অনুকরণে সে "আহা" বলিয়া সহানুভূতি দেখাইতে পারে। যাহা হউক সঙ্গীসাথীদের সহিত একসঙ্গে আনন্দ, দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদি অনুভব করিতে করিতে পরে কোন্ অবস্থায় সাথীরা আনন্দ বা ক্রোধের সময় কিরূপ অনুভব করে শিশুর তাহা বুঝিবার ক্ষমতা জন্মে।

সহানুভূতির সহিত সহযোগিতার ভাবও কিছু কিছু শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। কোন শিশু কিছু করিতে না পারিলে অন্য শিশু তাহাকে সাহায্য করে। দোলায় একজন দুলিলে আর একজন দোলা দেয়। বড়রা তদারক না করিলেও দুইজন শিশু মিলিয়া মিশিয়া কোন সহজ কাজ করিতে পারে।

আক্রমণাত্মক আচরণ।

আক্রমণাত্মক আচরণের স্বরূপ ও বারংবারতা শিশুর পরিবেশ ও বয়সের উপর নির্ভর করে। পরিবারে যদি অধিক সংখ্যক শিশু থাকে এবং উপযুক্ত

খেলনার অভাব থাকে তাহা হইলে ঝগড়াঝাটি বেশী হয়। 'খেলার সামগ্রী কম থাকিলে কাড়াকাড়ি মারামারি বেশী হয় এবং শিশুরা স্বার্থপর ও আক্রমণ-পরায়ণ হইয়া উঠে।

দুই তিন বৎসর বয়সের শিশুদের সামলান প্রায়ই শক্ত হইয়া পড়ে। ভাষা-জ্ঞানের অল্পতা ও শারীরিক অক্ষমতার জন্য সে আশানুরূপ আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না এবং বড়রা কেবল তাহাকে বাধাই দেয়; ফলে তাহার মধ্যে আক্রোশের ভাব প্রবল হইয়া উঠে। লাথি মারিয়া, দাপাদাপি করিয়া, চিৎকার করিয়া, কাঁদিয়া, জিনিষপত্র চতুর্দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, কামড়াইয়া, অবাধ্য হইয়া সে তাহার আক্রোশ ব্যক্ত করে। এই সময় তাহাদের আক্রমণের লক্ষ্য কিছু থাকে না। কেবল অতৃপ্তিজনিত আক্রোশ ব্যক্ত হয়। পরে যখন তাহারা বুঝিতে পারে কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ বস্তু তাহাদের ইচ্ছাপূরণের অন্তরায় তখন তাহাদের আক্রোশ পূর্বের মত অনির্দেশ্য না থাকিয়া বাধাসৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা বস্তুর উপর গিয়া পড়ে।

ছোট ছোট শিশুরা প্রধানতঃ খেলনা লইয়াই ঝগড়া করে। বলপ্রয়োগের দ্বারা তাহারা তাহাদের ঈপ্সিত জিনিষ পাইতে চেষ্টা করে। শিশুদের এই আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তির সামাজিক রূপান্তর ক্রমে ক্রমে ঘটান উচিত। নিজের বয়সের চেয়ে ছোট শিশুদের দেখাশুনার ভার পাইলে শিশু বাহিরের বিঘ্ন হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। শিশুর মধ্যে আক্রমণের ভাবটিকে একেবারে দমন করা উচিত নয়—ব্যক্তি বা বস্তু হইতে সমস্যা সমাধানের দিকে লইয়া যাওয়া উচিত। ইহার ফলে সে তেজস্বী হইতে পারিবে এবং নিজের এবং সমাজের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহস ও শৌর্য দেখাইতে পারিবে।

ঈর্ষা।

পিতামাতার স্নেহ ভালবাসার কাহাকেও অংশীদার হইতে দেখিলে শিশুর ঈর্ষা হয়। দেড় হইতে সাড়ে তিন বৎসর বয়সের ব্যবধানের ভ্রাতাভগ্নীদিগের ভিতর ঈর্ষা প্রায়ই দেখা যায়। ভ্রাতাভগ্নীদিগের মধ্যে বয়সের ব্যবধান

বেশী হইলে আর ঈর্ষার ভাব দেখা যায় না, তখন শিশুর ছোট্ট ভাই বা বোনটি তাহার কাছে প্রীতির বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

বিভিন্নভাবে শিশু ঈর্ষা প্রদর্শন করে। সুযোগ পাইলে কচি ভাই বা বোনটিকে চিমটি কাটিয়া দেয় বা গালে চড় বসাইয়া দেয়। অবাধ্যতা বা একগুঁয়েমীর রূপ লইয়াও ঈর্ষা দেখা দিতে পারে। ইহার ফলে নানারূপ আচরণ সমস্যাও দেখা দেয় যেমন, শয্যামূত্র, বুড়া আঙ্গুল চোষা, যুক্তিহীন আবদার ইত্যাদি।

ভাই বা বোনের প্রতি ঈর্ষান্বিত শিশু যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা পিতামাতার করণীয়। মা শিশুর প্রতি এমন ব্যবহার করিবেন যাহাতে শিশু অনুভব করে যে সেও মার স্নেহ ও আদরের পাত্র।

শিশুর মধ্যে যে আত্মনির্ভর হইবার স্পৃহা আছে পিতামাতা সেই স্পৃহাকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য উৎসাহ দিবেন। শিশু যেন অনুভব করে কচি বাচ্চার তদারক করিতে সে মায়ের অংশীদার।

ভয় এবং উৎকণ্ঠা।

এই বয়সে পিতামাতার ভালবাসা হারানোই শিশুর উৎকণ্ঠার বিষয়। শিশু যাহাকে ভালবাসে সে যদি তাহার আবেগ পূরণের উপর বাধানিষেধ আরোপ করে তাহা হইলে তাহার উপর শিশুর হিংসা উপজাত হয়। যাহাকে সে শ্রদ্ধা করে বা ভালবাসে তাহাকে হিংসা করিবার ফলে তাহার মনে অপরাধের মনোভাব সঞ্জাত হয় এবং ইহা প্রকাশ পায় উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়া।

যে সকল শিশুরা বয়স্কব্যক্তিদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল, যাহাদের মেজাজের কোন স্থিরতা নাই, সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নিরাপত্তার বোধ নাই, যাহারা নিজেদের অধিকার রক্ষা করিতে অসমর্থ, শারীরিক কাজ কর্মে অপটু এবং মন্দস্বাস্থ্য, তাহারা খুবই ভয়প্রবণ এবং ভীতু হয়।

জগতে সত্যকারের বিপদআপদ সম্বন্ধে শিশুরা যতই সচেতন হইতে থাকে ততই তাহাদের ভয়ও বাড়িয়া যায়। সেই কারণে চার পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুরা পূর্বাপেক্ষা বেশী ভয়যুক্ত হয়। তাহারা বুঝিতে পারে

যে, যে সব বিপদআপদের কথা তাহারা শুনিয়াছে তাহার কিছু কিছু তাহাদের জীবনেও ঘটিতে পারে। প্রথমে উঁচু জায়গায় চড়াইয়া দিলে, দৃঢ় অবলম্বন না থাকিলে, অপরিচিত লোক দেখিলে এবং উচ্চ শব্দ শুনিলে শিশুরা ভয় পায়। তিন বৎসর বয়স হইলে এই ভয়গুলি আর থাকে না কিন্তু অন্য রকমের ভয় তাহাদের মধ্যে আসিতে থাকে যেমন, অন্ধকারে ভূতের, চোর ডাকাতের বা জন্তুজানোয়ারের কাল্পনিক ভয়।

সাবধানতা বা সতর্কতা অবশ্য এই বয়স হইতেই শিখা উচিত। তাহাদের সত্যকারের বিপদ-আপদকে বুঝিতে দেওয়া উচিত। রাস্তা পার হইবার সময়, অপরিচিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে এবং এইরূপ নানাবিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করা উচিত।

প্রকৃতভাবে ভয়কে জয় করিতে হইলে ভয়োৎপাদক পরিস্থিতিকে আয়ত্বে আনা যাইবে এমন আত্মপ্রত্যয়ের প্রয়োজন, সাথে অবশ্য থাকা চাই পরিবেশের আনুকূল্য।

সামাজিক আচরণের মধ্যেও শিশুদের ভিতরে পার্থক্য দেখা যায়। দলগত খেলা অপেক্ষা কোন শিশু হয়ত অধিকাংশ সময় একলা একলা খেলিতে ভালবাসে আবার কেহ হয়ত অপেক্ষাকৃত দলগত খেলা পছন্দ করে। কোন কোন শিশু অপরিচিত লোকদের কাছে বন্ধুত্বভাব লইয়া নিঃসঙ্কোচে যায় আবার কোন শিশুর সহিত খুব আদর করিয়া কথা কহিলেও তাহারা কোন জবাব দেয় না।

আশঙ্কাজনক সামাজিক পরিস্থিতিতে শিশুর আচরণ।

শিশু নানাবিধ উপায়ে আশঙ্কাজনক সামাজিক পরিস্থিতি হইতে কাটাইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। শিশুকে বলিয়া রাখা হইয়াছিল সে যেন দিদির দামী পুতুলটি লইয়া খেলা না করে। কৌতূহলবশে দিদির পুতুলটি নাড়াচাড়া করিতে গিয়া পুতুলটি ভাঙ্গিয়া গেল। সে প্রথমে তাহার কার্যের সমর্থন করিল এই যুক্তি দিয়া যে পুতুলটি খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তাহার এই যুক্তি গ্রাহ্য না হওয়ায় সে বলিল, "পুতুলটি আমি কিনিয়াছি, ওটি আমার।" এই

উক্তিরও অসারতা তাহাকে দেখাইলে সে কাঁদিতে থাকিল। তাহার কান্নায় কেহ সহানুভূতি দেখাইল না। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হইতে মুক্তির অন্য সব উপায় ব্যর্থ হওয়ায় পরিশেষে সে স্বীকার করিল, "আমি পুতুলটি ভাঙ্গিয়াছি বলিয়া দুঃখিত, ভবিষ্যতে আর এইরূপ কাজ করিব না।" এই কথার পরে বড়রা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিল।

এইরূপ অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য শিশুরা নানারূপ ছলনা ও কলাকৌশল ব্যবহার করে। অন্যকে দোষারোপ করিয়া, দিবাস্বপ্নে মগ্ন হইয়া সে সন্তোষ পাইতে চেষ্টা করে এবং নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করে। শিশু কেন এইরূপ ছলনার আশ্রয় লয় তাহার কারণ অনুসন্ধান করা বড়দের কর্তব্য এবং এইরূপ ছলনার যাহাতে শিশুর প্রয়োজন না হয় এবং শিশু অবাস্তব যুক্তি ত্যাগ করিয়া বাস্তব বুদ্ধিযুক্ত হয় তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত।

শিশুর সামাজিক বিকাশের সীমা।

খুব কচি অবস্থায় শিশু যখন সম্পূর্ণ অসহায় থাকে তখন সে যাহা খুশী তাহা করিলেও মা আদরের সহিত তাহা উপভোগ ও অনুমোদন করেন এবং তাহার সেবা-যত্ন করিবার জন্য ভাবনা চিন্তা করেন এবং তৎপর থাকেন। কিন্তু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর উপর কিছু বিধিনিষেধ স্থাপন করা হয় এবং তাহার আচরণকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। শিশু যখন বুঝিতে পারে সব জিনিষের একটি সীমা আছে তখন সে আত্মনিয়ন্ত্রণ করিতে এবং অন্যের অধিকারকে মানিতে শিখে। শিশুকে সবরকমের ভয় ও বঞ্চনা হইতে রক্ষা করিলে শিশু আত্মবিশ্বাস ও নিরাপত্তাবোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; তাহার সম্ভাব্য শক্তিসামর্থ্যের বিকাশে সাহায্য করিলে তবে তাহার এই প্রতিষ্ঠা আসে।

কোন কোন পিতামাতা শিশুকে সামাজিক আদবকায়দায় দুরস্ত করিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন। ইহার ফলে শিশু তাহার সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বেশী মাত্রায় আত্মচেতন হইয়া পড়ে এবং ভান করিতে শিখে। আবার কোন কোন পিতামাতা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ততা ব্যাহত হইবে এই আশঙ্কায়

তাহার উপর কোনরূপ সামাজিক বিধিনিষেধ চাপাইতে চাহেন না, ফলে শিশু হইয়া পড়ে অতিরিক্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির। এই দুইয়ের মাঝামাঝি পন্থাই অভিপ্রেত। গৃহের শান্তি, স্বাচ্ছন্দ ও সমাজিক শোভনতা বজায় রাখিবার জন্য শিশুকে নিশ্চয়ই কিছু সামাজিক নিয়মকানুন মানিতে হইবে, শিষ্টাচার সম্পন্ন হইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামাজিক আচরণ সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ইহার ফলে সে কোন্ আচরণের কি পরিণাম হয় জানিতে পারিবে এবং নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করিতে শিখিবে। অন্যদের পক্ষে অনিষ্টকর না হইলে শিশুকে তাহার নিজের পথেই চলিতে দিতে হইবে।

পাঁচ বৎসর বয়সের শেষে শিশু যদি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-নিয়মগুলি মানিতে শিখে, শান্তভাবে খাইতে পারে এবং অন্যকে অনুরোধ করিতে ও নিজের কৃতজ্ঞতা জানাইতে শিখে তাহা হইলে তাহার সামাজিক বিকাশ যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

বাল্য।

শারীরিক বৃদ্ধি।

ছয় হইতে আট বৎসর বয়স কালকে আমরা বাল্যাবস্থা বলিয়াছি। পাঁচ বৎসর বয়স অবধি শিশু খুব দ্রুত বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাল্যকালে সে তাহার বৃদ্ধিকে পরিপাক করে। এই সময় তাহার বৃদ্ধির গতি কমিয়া আসে। এই সময় বাড়িয়া উঠার কর্মতৎপরতা কম হইবার প্রয়োজনীয়তাও আছে। কেননা কৈশোরের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহাকে দ্রুত বাড়িতে হইবে। প্রথম পাঁচ বৎসরে শিশুর যে হারে বৃদ্ধি ঘটে অত দ্রুত বৃদ্ধি জীবনের অন্য সময় আর হইতে দেখা যায় না। শৈশবের বৃদ্ধির গতি যদি বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে সমানতালে ঘটিত তাহা হইলে এ্যানডারসনের হিসাব অনুযায়ী মানুষ উচ্চতায় দুইশত ফুট এবং ওজনে দশ টন হইত। শৈশব হইতে বৃদ্ধি কমিয়া আসিলেও বালক বালিকার শক্তি ও ক্রিয়াত্মক নৈপুণ্য

দ্রুত বাড়িতে থাকে এবং শ্রমসাধ্য দৈহিক কাজকর্মে তাহারা আগ্রহান্বিত হয়। যে বালক বালিকার দৈহিক শক্তি কম তাহাদের মধ্যে ক্রিয়াত্মক পটুত্বেরও অভাব দেখা যায়। সহজে যাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে বিদ্যালয়ের কাজ কর্মেও তাহারা পিছাইয়া থাকে। যে বালক বা বালিকা অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকে তাহার অনেকদিন স্কুল কামাই হয় ফলে লেখাপড়া শেখা বিশেষ ব্যাহত হয়। এইরূপ বিবিধ ব্যর্থতার ফলে তাহার মধ্যে প্রায়ই হীনমন্যতা উৎপন্ন হয় ও নিজেকে অসমর্থ বোধ করে। স্কুলে কম নম্বর পাওয়ার ফলে পিতামাতার সহিত সম্বন্ধও তিক্ত হইয়া যাইতে পারে।

উচ্চতা, ওজন ও বয়স অনুসারে বালক বালিকার বৃদ্ধি একটি ধরণ বা ধাঁচ ধরিয়া চলে। কেহ হয়ত বেশ মোটাসোটা, কেহবা প্রত্যেকে নিজের ধাঁচ অনুযায়ী বাড়িতে থাকে। হঠাৎ যদি এই বৃদ্ধির ধরণের বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কোন প্রতিকূল কারণ ঘটিয়াছে। অপুষ্টিকর খাদ্য, গ্রন্থির গোলমাল, যক্ষ্মা, বেরীবেরী, ম্যালেরিয়া, আমাশয় প্রভৃতির ন্যায় রোগের আক্রমণের জন্য বালকবালিকার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এমনকি তাহারা যদি নিজেদের অবহেলিত বা অনাদৃত ভাবে তাহা হইলেও তাহারা স্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া উঠিতে চায় না।

সেইজন্য দেখা যায় স্নেহ ও আদরের আবহাওয়ার মধ্যে দৈহিক বিকাশও সতেজ ও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়, কিন্তু অনাদর ও অবহেলায় অনেক শারীরিক রোগলক্ষণ দেখা দেয়। অন্য পক্ষে অপুষ্টি, অসুস্থতা, দৈহিক বৈকল্য এবং সাধারণ মন্দ স্বাস্থ্যের ফলে উৎকণ্ঠা, অবসাদ, নিঃস্পৃহতা উৎপন্ন হয় এবং বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় অকৃতকার্য হইতে থাকে। মানসিক বিকাশে পিছাইয়া থাকিলে, ক্রিয়াত্মক নৈপুণ্যের অভাব হইলে এবং স্কুলে অকৃতকার্য হইতে থাকিলে বালক বা বালিকা নিজেকে হীন ও পরিত্যক্ত ভাবে। এই সমস্ত রকমের কারণের কোন একটিই তাহাদের দৈহিক বিকাশের পরিপন্থী হইতে পারে।

উচ্চতা ও ওজন।

পূর্ণবয়স্ক হইলে বালক বা বালিকা যেরূপ উচ্চ হইবে তাহার দুই তৃতীয়াংশ

উচ্চতা সে ছয় বৎসর বয়সেই লাভ করে, এবং তাহার দেহের আয়তন তাহার পূর্ণবয়স্ক আয়তনের দুই পঞ্চমাংশ হইয়া যায়। এই সময় উচ্চতায় ও ওজনে তাহার গড় বৃদ্ধি যথাক্রমে এক হইতে দুই ইঞ্চি এবং দেড় সের হইতে আড়াই সের হয়। ছয় হইতে দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক বালিকার উচ্চতায় গড় বাৎসরিক বৃদ্ধি কমিতে দেখা যায়। একটি ছয় বৎসরের বালক দৈর্ঘে ৩৯ হইতে ৪৯ ইঞ্চি এবং ওজনে ১৯ সের হইতে ২৫ সের পর্যন্ত হইলে তাহার বৃদ্ধি স্বাভাবিক হইতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যদিও বালক বালিকার বৃদ্ধি বংশগতির দ্বারা সীমায়িত থাকে, তবে সেই সীমার মধ্যে তাহাদের বৃদ্ধি যতদূর সম্ভব, তাহার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। পরিমিত সূর্যকিরণ সেবন, মাঠে বা বাগানে খেলাধূলা করা, বিশ্রাম, নিদ্রা, পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ—এইগুলি স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির খুবই সহায়ক। কেহ কেহ তাহাদের ছেলেমেয়েদের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য ঔষধপত্র ও বিশেষ চিকিৎসার সাহায্য গ্রহণ করেন। ইহাতে সাময়িকভাবে কিছু ফল পাওয়া গেলেও দেহ এইসকল বৃদ্ধির বিশেষ উদ্দীপনাকে প্রতিরোধ করে অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত এইসকল উদ্দীপনাসত্বেও দেহ প্রবলবেগে বাড়ে না। দৈহিক বৃদ্ধির যে স্বাভাবিক গতি ও ছন্দ আছে তাহাকে অব্যাহত রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট। বৃদ্ধির গতি বাড়াইবার জন্য অযথা চেষ্টা নিরর্থক।

দন্তোৎগম।

ছয় বৎসর বয়সের সময় বালক বালিকার দুধ দাঁত পড়িয়া যাইতে থাকে। প্রথম স্থায়ী কষদাঁতটি এখন মাড়ী ভেদ করিয়া উঠিতে থাকে। সাত আট বৎসর বয়সে প্রথমে নীচের মাড়ীতে সামনের দাঁতগুলি উঠিতে থাকে।

দৈহিক পুষ্টি।

বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে খুব অপুষ্টির লক্ষণ দেখা যায়। এই সময় তাহারা যাহা তাহা খায় এবং তাহাদের মধ্যে ভিটামিনের অভাব দেখা যায়। গ্রামের এবং সহরের নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা উপযুক্ত পরিমাণে

স্বাস্থ্যবর্ধক ও পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পায় না। অন্যদিকে শিক্ষিত ও স্বচ্ছল সংসারে ছেলেমেয়েদের খাওয়ান লইয়া সমস্যা দেখা যায়। তাহারা দুধ, ডিম, মাংস এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে চায় না, খাবার সম্বন্ধে নানারূপ খুঁৎখুঁৎ করে এবং অনেক আদর আপ্যায়ন করিয়া বা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া তাহাদের খাওয়াইতে হয়। পিতামাতার একমাত্র সন্তান হইলে এইরূপ আচরণ বেশী মাত্রায় দেখা যায়।

সুস্থ বৃদ্ধির পক্ষে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের সবুজ এবং হলুদ রঙের শাকসব্জী, সি-ভাইটামিনযুক্ত টমেটো এবং কাঁচা বাঁধাকপির পাতা, আলু এবং ফল, দই-দুধ-ক্ষীর, মাছ-মাংস-ডিম, কড়াই, বাদাম, ডাল-ভাত-রুটি, ঘি মাখন—এই সব খাদ্য পরিমিতভাবে খাওয়ান প্রয়োজন।

শারীরিক দোষত্রুটি ও অঙ্গ বৈকল্য।

বিদ্যালয়ের বালকবালিকাদের নানারূপ দৈহিক ত্রুটি দেখা যায়। এইগুলি তাড়াতাড়ি সারাইয়া ফেলা দরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের দাঁতগুলির মধ্যে প্রায়ই তিনটি বা তাহার বেশী গর্ত দেখা যায়। এইরূপ দন্তরোগ দেখা দিলে তাহাদের চিনি ও চিনিজাত দ্রব্য কম করিয়া দেওয়া এবং আহারের পর আপেল বা অনুরূপ ফল খাইতে দেওয়া উচিত। প্রত্যেকবার আহারের পরে ভাল করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতে তাহাদের অভ্যস্ত করান উচিত এবং দন্ত চিকিৎসকের কাছে নিয়মিত দন্তচিকিৎসা ও যত্ন লওয়া উচিত।

চোখের ও কানের দোষও বেশ দেখা যায়। শিশু যখন বিদ্যালয়ে প্রথম আসে তখন তাহার দূরের দৃষ্টি বেশ স্বাভাবিক ও পরিষ্কার থাকে। বই কাছে রাখিয়া পড়াশুনা করা তাহার পক্ষে বেশ ক্লান্তিজনক বোধ হয়। প্রায়ই আট নয় বৎসর বয়সের সময় বালকবালিকার চক্ষুর আয়তন ও আকার পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই সময়ের পর হইতে দূরদৃষ্টির ক্ষীণতার প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। দৃষ্টিশক্তির কোনরূপ গোলমাল দেখা দিলেই চক্ষু-চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া উচিত।

অনেক বালকবালিকা টনসিলের বৃদ্ধিজনিত রোগে কষ্ট পায়। টনসিলের জন্য জ্বর, সর্দি, কাশী, ইত্যাদি রোগে ভোগে এবং শারীরিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে ডাক্তারের পরামর্শমত টনসিল অপারেশন করাইয়া ফেলা দরকার।

কম জীবনীশক্তি, পুরাতন আমাশয় ইত্যাদি কারণে বালকবালিকারা চর্মরোগে ভুগিতে পারে। প্রথম হইতেই নিয়মিত চিকিৎসার দ্বারা ইহার প্রতিকার করা উচিত।

অন্ধ ও বধির বালকবালিকা লইয়া যেমন কতকগুলি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় তেমনি তাহাদের মধ্যে অনেক গুণও দেখা যায়। কালা ছেলেমেয়েরা নিজেদের খানিকটা অসহায় ও অস্বাভাবিক ভাবে কিন্তু সাধারণ ছেলেমেয়ে অপেক্ষা তাহারা অনেক বেশী নির্ভীক হয়। তাহাদের শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা লইয়াই সমস্যা উপস্থিত হয়। অল্প শ্রবণশক্তিযুক্ত বালক-বালিকাকে কথাবার্তা বা গানবাজনা শুনিবার জন্য লোকজন বা বাদ্যযন্ত্রের কাছে যাইয়া শুনিবার স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন। অধরোষ্ঠের নড়াচড়া দেখিয়া কিভাবে কথা বুঝিতে হয় তাহা তাহাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। যাহাদের শ্রবণশক্তি অতি ক্ষীণ তাহারা কোন সুনির্বাচিত শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারে।

অসুস্থতা।

বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিবার অন্যতম কারণ শারীরিক অসুস্থতা। বিদ্যালয়ে ছোঁয়াছে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকা উচিত। নিয়মিত টিকা ও ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার বন্দোবস্ত বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে। বালকবালিকারা একেবারে রোগমুক্ত থাকিবে আশা করা যায় না তবে যদি অসুখবিসুখ বারে, কম হয় এবং অল্পকালস্থায়ী হয় তাহাকেই মোটামুটি সুস্থতার লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে। দীর্ঘকালস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক কঠিন পীড়ায় ভুগিলে বালকবালিকা অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে ও সামাজিক সংস্রব হইতে নিজেকে গুটাইয়া আনে।

ক্রিয়াত্মক সামর্থ্য।

কর্মরত হইবার জন্য বালকবালিকার একটি অন্তর্নিহিত তাগিদ থাকে। মিটলম্যানের মতে এই স্বভাবনিহিত তাগিদ বা উদ্দীপনা, কল্পনা এবং কর্তৃত্বের আকাঙ্খা তাহাদের খেলায় প্রবৃত্ত করায়। খেলিতে যাইবার জন্য ছেলেমেয়েরা একটি অস্থিরতা বোধ করে। মনের মত খেলা করিয়া তাহারা সন্তোষ লাভ করে এবং একটি শিথিলতার অবস্থায় আসে।

শিশুর পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে এই ক্রিয়াত্মক উদ্দীপনা পূর্ণতা লাভ করে। এই বয়স অবধি এই উদ্দীপনা অহৈতুকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার পর এই উদ্দীপনার তীব্রতা কমিয়া আসিতে থাকে এবং উদ্দেশ্যমূলক হইতে আরম্ভ করে। কর্মরত হইবার এই প্রবল তাগিদকে দমন করা হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হইতে পারে বা বালকবালিকা আত্মরতি বা অনুরূপ অন্য কোন উপায়ে তৃপ্তি খুঁজিতে চেষ্টা করে। এইজন্যই নার্সারী স্কুলে এবং প্রথম শ্রেণীতে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার উপর এত জোর দেওয়া হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের অধিকাংশ সময় শ্রেণীতে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে বাধ্য করিবার পরিণাম অতীব অহিতকর ও সুদূরপ্রসারী।

এই বয়সে ছেলেমেয়েরা যে সব বিষয়ে তাহাদের সামর্থ্য আছে এবং সুযোগ ও আনুকূল্য পায় সেগুলি করিতে শিখে। অঙ্গসঞ্চালনকারী খেলাধূলায় তাহাদের প্রবল আগ্রহ এই সময়ে অক্ষুণ্ণ থাকে। এখন তাহারা চোখ এবং হাতের সমন্বয় আরও ভাল করিয়া করিতে পারে। এই সময় সহজ শিল্পকাজ যেমন, তকলিতে সূতা কাটা, দারুশিল্প এবং ছবি আঁকা ইত্যাদি তাহাদের করিতে দিলে খুব উৎসাহের সহিত তাহারা করে ও দক্ষতা অর্জন করে। ইহা ছাড়া হাতের লেখাতেও ক্রমশঃ পটুত্ব অর্জন করিতে থাকে। এইবার তাহারা কিছু নিয়মকানুন মানিয়া দলবদ্ধভাবে খেলিতে চায়, তাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনয় করিতেও ভালবাসে।

দৌড়ান, উঁচু জায়গায় চড়া, বল খেলা, লুকাচুরী খেলা, নাচা ইত্যাদি যে সব খেলায় শারীরিক শক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয় সে সব খেলা ছয়, সাত, আট বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা খেলিতে খুব ভালবাসে। এই সময় তাহারা

খুব উঁচু ও কঠিন জায়গায় উঠে এবং অধিক নৈপুণ্যের সহিত নিজেদের ভারসাম্য রাখিতে পারে। এই সময় তাহারা কাল্পনিক ছড়া শুনিতে ও আবৃত্তি করিতে ভালবাসে।

বল লইয়া খেলা ছেলেদের বিশেষ প্রিয় খেলা। তাহারা নিয়মকানুন মানিয়া দলগত খেলা খেলিতে চায় এবং সঙ্গী সাথীরা যাহাতে খেলার নিয়ম মানিয়া চলে সে বিষয়ে সতর্ক থাকে। যে সব কাজকর্মে বড় মাংসপেশীগুলির সঞ্চালন হইতে পারে এবং গতির দরকার হয় সে সব কাজকর্ম করিতে তাহারা ভালবাসে।

মেয়েরা এখন পুতুল লইয়া খেলা করিতে খুব আনন্দ পায়।

ছেলেমেয়েরা কি প্রকারের খেলাধূলা করিবে তাহা নির্ভর করে তাহার দৈহিক পরিপক্কতা, ব্যক্তিত্ব, সঙ্গী সাথীদের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা, অভ্যাসের পরিমাণ, কৃতকর্মে সফলতা ও অসফলতা, কোন খেলায় লিপ্ত হওয়ার সুযোগ-সুবিধা এবং চলিত রেওয়াজ ও প্রথা। দৈহিক পরিপক্কতার ফলে ছেলে-মেয়েরা খেলার কৌশল বা গতিভঙ্গী আয়ত্ব করিতে পারে, যেমন স্কিপিং। অপর পক্ষে কৌশল আয়ত্ব করিবার ফলে শারীরিক বিকাশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। নূতন ক্রিয়াত্মক পটুত্ব অর্জন করিতে পারা সম্বন্ধে যদি বালকবালিকার আত্মপ্রত্যয় না জন্মায় তাহা হইলে তাহারা নিজেদের অযোগ্য ও অসহায় ভাবে। সঙ্গীরা উপহাস করিবে এই ভয়ে নূতন কোন খেলা শিখিতে চায় না কেননা প্রথম প্রথম খেলা শিখিতে গেলেই নিজের অযোগ্যতা ও অপটুতা প্রকাশ পায়। সঙ্গীরা যদি কোন বালক বা বালিকাকে খেলিবার জন্য সহানুভূতির সহিত টানিয়া লয় তাহা হইলে লজ্জা ত্যাগ করিয়া নূতন খেলা শিখিতে উৎসাহিত হয়।

ছেলেমেয়েদের কাজ এবং বিশ্রামের ছন্দের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। দিনের বেলায় তাহারা একটানা বেশীক্ষণ খেলা বা কাজ অথবা একটানা বিশ্রাম তাহারা চায় না। সেইজন্য খেলা বা কাজের মাঝে মাঝে তাহাদের বিশ্রামের দরকার হয়। সেইজন্য বিদ্যালয়ের ৫।৬ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে মাত্র একটি দীর্ঘ বিশ্রামের অবকাশ না রাখিয়া কয়েকটি পূর্ণ বিশ্রামের অবকাশ

থাকে তাহা হইলে বালকবালিকা ও শিক্ষকশিক্ষিকা সকলেরই উপকার হয়। ছেলেমেয়েরা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তাহারা অস্থির হইয়া পড়ে এবং বিদ্যালয়ের কাজে মন দিতে পারে না।

খেলাধূলারদ্বারা নানাভাবে সামাজিক সম্মান ও মনের প্রসন্নতা লাভ করা যায়। খেলায় নৈপুণ্য লাভের সাফল্য, অবদমিত বাসনাকামনার ক্রীড়াচ্ছলে পরিতৃপ্তি, খেলার হর্ষোৎফুল্ল পরিবেশ—এই সবই সামাজিক সম্ভ্রম বাড়ায় ও মনে শান্তি ও সুখকে অক্ষুণ্ণ রাখে। কোন বালক বা বালিকা খেলাধূলায় পারদর্শী হইলে পড়াশুনায় যদি সে কিছুটা অসফল হয় তাহা হইলে তাহার গ্লানি সে কাটাইয়া উঠিতে পারে। জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে সাফল্যের গৌরব বা আনন্দ থাকা দরকার। মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা অতীব প্রয়োজনীয়।

বালকবালিকাদের চোখ ও হাতের সাহায্যে সূক্ষ্ম কাজ করিতে দেওয়ার আগে যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় খেলাধূলা এবং বড় বড় মাংসপেশী সঞ্চালনকারী কাজকর্ম করিতে দেওয়া উচিত। প্রথম শ্রেণীতে হাতের লেখা, সেলাই এবং ছবি আঁকার কাজের মত সূক্ষ্ম কাজ যাহাতে ছোট ছোট মাংসপেশীগুলি ব্যবহার করিতে হয় তাহার জন্য ছেলেমেয়েদের দৈহিক প্রস্তুতি থাকে না। জুতায় ফিতা পরান অনেক ছয় বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের পক্ষে কঠিন কাজ।

প্রাথমিক শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা মাটির কাজ করিতে ভালবাসে। তাহারা মাটি দিয়া থালাবাটি, জন্তুজানোয়ার ও অন্য নানারকম দ্রব্য গড়ে। কাগজ দিয়া তাহারা নানারকম খেলনা তৈয়ারী করে। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে তাহারা কাঠ, কাগজ, কাপড়, রং ইত্যাদি সাহায্যে নানারকম ব্যবহারোপযোগী বা সাজান জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারে।

এইসব হাতের কাজ করিতে করিতে নানা জিনিষ ও বিষয় সম্বন্ধে উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ হইতে থাকে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সেইজন্য এইরূপ হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। প্রথম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা বড় কাঠের বাক্স দিয়া বা পিচবোর্ডের সাহায্যে পুতুলের ঘর তৈয়ারী করে। পিচবোর্ড কাটিয়া দরজা, জানালা তৈয়ারী করে, এমন কি ঘুলঘুলিও রাখে।

রঙ্গীন কাগজ দিয়া দেওয়াল মুড়িয়া দেয় ও অন্যান্য গৃহসজ্জার দ্বারা ঘরটিকে সাজায়। নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা নানারকমের হাতের কাজ করে। তাহারা তাহাদের নিজেদের গ্রাম বা আদর্শ গ্রাম রচনা করে। ছোট পিচবোর্ডের সাহায্যে গ্রামের বাড়ী, বিদ্যালয়, বাজার, ডাকঘর, থানা ইত্যাদি তৈয়ারী করে; রাস্তাঘাট, পুকুর, জলসরবরাহ, ক্ষেতখামার সবই কাগজ, মাটি, রঙ ইত্যাদি দিয়া তৈয়ারী করে। প্রয়োজন হইলে ব্যাটারী, তার ও ছোট ছোট বাল্ব দিয়া রাস্তা ও ঘরবাড়ীতে বৈদ্যুতিক আলোও জ্বালায়। এইসব পরিকল্পনা করিতে ও সাজাইতে গিয়া ছেলেমেয়েদের মৌলিকতা প্রকাশ পায়। এইরূপ হাতের কাজ করিতে করিতে বর্তমান ও প্রাচীন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নের উদয় হয় এবং পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ করিতে গিয়া অনেক পড়াশুনা, মাপজোক, লেখা, চারুকলা ও স্বাস্থ্যবিধির প্রয়োগ করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। ভারতের আদি অধিবাসীদের জীবন কিরূপ ছিল তাহার একটি পরিকল্পনা করিতে গিয়া পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা একবার কোল, ভীল, ওরাও ইত্যাদি অধিবাসীদের ছবি আঁকিয়াছিল, তাহাদের বস্ত্রের ও ব্যবহার্য দ্রব্যের একটি প্রদর্শনী করিয়াছিল এবং ভারতের কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছে তাহা দেখাইয়া একটি মানচিত্র আঁকিয়াছিল। চতুর্থ শ্রেণীর আর একদল ছেলেমেয়ে এস্কিমোদের জীবন দেখাইতে গিয়া তুলা দিয়া তাহাদের শীতকালীন ঘর তৈয়ারী করিয়াছিল। মাটি ও রঙ দিয়া রেনডিয়ার (হরিণ) ও কুকুর-টানা স্লেজগাড়ী ইত্যাদি নির্মাণ করিয়াছিল এবং নানারকম পড়াশুনা করিয়া এস্কিমোদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিবরণ লিখিয়াছিল।

হস্তলিপি।

প্রথম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা লিখিতে পারে না—তাহাদের আঁকা ছবি ও নিজেদের জিনিষপত্রের উপর বড়জোর নিজের নামটা বড় বড় অক্ষরে আঁকিতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ের পর হইতে প্রকৃতভাবে ছেলেমেয়েরা লিখিতে শিখে। হাতের লেখা শিক্ষাকালে দ্রুততার অপেক্ষা স্পষ্টতার

উপরই জোর দেওয়া উচিত। এই সময় পরিষ্কার ও সুন্দর করিয়া হাতের লেখার গড়ন না হইলে সারাজীবনই হাতের লেখা খারাপ থাকিয়া যায়। বর্ণগুলি বিভিন্ন আকারে লিখিবার কৌশল আয়ত্ব করিবার পর হাতের লেখার মধ্যে নিজস্বতা আসে। চোখ ও হাতের সমন্বয় না ঘটায় প্রাথমিক শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা হাতের লেখায় ইচ্ছা থাকিলেও সুদক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু অত্যুৎসাহী শিক্ষক ও পিতামাতারা খুব অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের হাতের লেখায় পাকা করিয়া দিতে চান ফলে তাঁহারাও ব্যর্থ হন ও ছেলেমেয়েদেরও হয়রানি হয়। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে প্রাথমিক স্তরের পর হাতের লেখা দ্রুততায় ও সৌষ্ঠবে উন্নত হইতে থাকে।

ছবি আঁকা ও রং তুলির ব্যবহার।

ছেলেমেয়েরা তাহাদের কল্পনা ও অনুভূতিগুলি তাহাদের আঁকা ছবি ও পেন্টিংএর মধ্য দিয়া স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তাহারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তখন প্রচলিত প্রথা তাহাদের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করে। যখন বড়রা তাহাদের ছবি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, 'এটা কি?' তখন তাহারা ভাবে যে তাহাদের ছবি বাহিরের জিনিষের প্রতিরূপ হওয়া উচিত। নয় দশ বৎসর হইতেই ছেলেমেয়েরা ধরিয়া লয় যে তাহারা যাহা কিছু দেখিবে তাহারই প্রতিরূপ হইবে তাহাদের ছবি। তাহারা যাহা অনুভব করে তাহার স্বাভাবিক প্রকাশ আর তাহারা করে না।

অধিকাংশ ছয় বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা মানুষের ছবি কোনরকমে আঁকিতে পারে। তাহারা গাছপালা ও ঘরবাড়ীর ছবিও আঁকিতে শিখে। এখন তাহাদের অঙ্কিত ছবি দেখিয়া ছবির বিষয়বস্তু বুঝিতে কষ্ট হয় না। তবে এখনও তাহারা তাহাদের আঁকা ছবিকে চিত্রকলা অপেক্ষা তাহাদের নিঃশব্দ ভাষার প্রতীক হিসাবেই গণ্য করে। তাহাদের ছবি কোন কাহিনীকে প্রকাশ করে এবং তাহারা চায় ছবি দেখিয়া অন্যরা তাহার মর্ম বুঝুক। চিত্রের সৌষ্ঠব, সামঞ্জস্য বা আঙ্গিকের দিকে তাহাদের দৃষ্টি বিশেষ থাকে না।

যদি ছবিটি তাহাদের কাহিনীকে বা কোন অনুভূতিকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিতে পারে তাহা হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হয়।

যে বিষয় বা বস্তুতে ছেলেমেয়েদের আগ্রহ বেশী তাহারা সেই জিনিষটিকে ছবিতে বড় করিয়া দেখায়। বাড়ীর পাশে যদি ফুলটিই তাহাদের বেশী আকৃষ্ট করে তাহা হইলে তাহারা বাড়ী অপেক্ষা ফুলটিকেই বড় করিয়া আঁকিয়া ফেলে। মানুষের ধড় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপেক্ষা মুখমণ্ডলকেই বড় করিয়া আঁকে। গাড়ী, নৌকা, ঘরবাড়ী, গাছপালা, মানুষ ইত্যাদি ছোটদের ছবির প্রিয় বিষয় বস্তু। তাহাদের ছবি দেখিয়া তাহাদের সূক্ষ্ম মাংসপেশীগুলির কতদূর নিয়ন্ত্রণ সাধিত হইয়াছে কেবল যে তাহাই জানা যায় তাহা নহে, তাহাদের পর্যবেক্ষণ শক্তির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধেও বুঝিতে পারা যায়।

চিত্রকলা অভ্যাসে বালক বা বালিকা তাহার ব্যক্তিগত জীবনকে সম্পদশালী করিয়া তুলিতে পারে। চিত্রকলার অনুশীলনে তাহার আত্মবোধের গভীরতা, কলাকৃতিতে আত্মসম্ভ্রম এবং নিজের শক্তি সামর্থ্যের কৃতার্থতা সাধিত হয়। তাহার মনে সে কিছু সৃষ্টি করিতে সমর্থ এই প্রত্যয় জন্মায়। যে সব আবেগ অনুভূতি অন্য কোন চরিতার্থতার পথ পায় না বা যেগুলি অসামাজিক আচরণে প্রকাশ পাইতে পারে সেইগুলি সৃষ্টিধর্মী চিত্রকলায় সার্থক হইয়া উঠে।

মানসিক বিকাশ।

ভাষা।

শব্দজ্ঞানের বিস্তৃতি এবং সমৃদ্ধি বাক্যের দৈর্ঘ এবং গঠন, ভাষার নির্ভুলতা এবং ভাব সফলভাবে ব্যক্ত করিবার শক্তি দেখিয়া কোন বালক বা বালিকার ভাষার উপর কতটা অধিকার জন্মাইল তাহা বুঝিতে পারা যায়। ভাষা জ্ঞানের বৃদ্ধির উপর পড়িবার সামর্থ্য গড়িয়া উঠে।

যে বালক বা বালিকা ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না সে পড়াতেও পিছাইয়া থাকে।

বালক বালিকার সামগ্রিক বিকাশই প্রকাশ পায় তাহার লেখাপড়া এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য কৃতকর্মের মধ্য দিয়া। সেইজন্য যে বালক বা বালিকা পড়াতে পিছাইয়া থাকে তাহা হয়ত তাহার সাধারণ অপরিপক্কতার নিদর্শন হইতে পারে। মানসিক পরিপক্কতা ও পরিবেশ হইতে যে প্রেরণা পাওয়া যায় তাহা ছেলেমেয়েরা যে ভাষা ব্যবহার করে তাহার মধ্যে প্রকাশিত হয়।

যে সব ছেলেমেয়েরা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় তাহারা প্রত্যেকে পড়িবার জন্য সমানভাবে প্রস্তুতি বা সম্ভাবনা লইয়া আসে না। যে মেধাবী ছেলে বা মেয়ে অনর্গল কথা বলে, গল্প ও ছড়া শুনিতে ভালবাসে এবং যাহার বাড়ীতে লেখাপড়া একটি প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়া গণ্য হয় সে বিদ্যালয়ে আসিবার আগেই পড়িতে শিখিয়া যায়। যে মেধাবী ছেলে বা মেয়ে বাড়ীতে পড়িবার সুযোগ বা প্রেরণা পায় না, বিদ্যালয় পরিবেশে প্রেরণা পাইলে অল্পায়াসেই পড়িতে শিখিয়া যায়। যে বালকের মানসিক সামর্থ্য কম কিন্তু সংস্কৃতিবান পরিবার হইতে আসে সে পড়িবার জন্য প্রবল প্রয়োজন বোধ করে কিন্তু পড়া শিখিতে তাহার বেশ বিলম্ব হয়।

ছেলেমেয়েরা পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে কিনা তাহা লক্ষণ দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পড়িবার জন্য যখন কোন বালক বা বালিকা প্রস্তুত হয় তখন সে ছাপার অক্ষরের মানে কি জিজ্ঞাসা করে, ছবির বইয়ে কথাগুলি কি বলিতে চায় তাহা সে জানিতে চায়, পড়িবার ভান করে, মন দিয়া পড়া শুনে, শ্রুত সহজ বাক্য বলিতে পারে। ছেলেমেয়েকে কি করিয়া পড়িতে হয় ভাল করিয়া শিখাইয়া দিবার পর তাহারা পড়িতে পারে কিনা দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায় পড়িবার জন্য তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে কিনা।

পড়িতে শিখিবার সহায়ক হিসাবে নানারূপ শব্দ ও বইয়ের সহিত ছেলেমেয়েদের পরিচিত করাইয়া দেওয়া ভাল। কতকগুলি শব্দ শিখিলেই ভাষাজ্ঞান হইয়াছে বলা যায় না। শব্দের অর্থজ্ঞান হইয়াছে কিনা তাহাও দেখিতে হইবে। ছয় বৎসরের ছেলেমেয়ে কোন জিনিষের মানে জিজ্ঞাসা করিলে তাহা কি বা তাহা দিয়া কি করা হয় তাহাই বলিতে পারে। আট

বৎসর বয়সে সেই জিনিষটি কি দিয়া তৈয়ারী, তাহার আকার, আয়তন, রঙ এবং কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত এই সব বিষয়ে বলিতে পারে। ছয় বৎসরের ছেলেমেয়েকে 'গরু' কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা খুব সম্ভবতঃ বলিবে "গরু দুধ দেয়" বা "গরু গুঁতিয়ে দেয়।" আট বৎসর বয়সে তাহারা বলিবে "গরু বড় জন্তু।" ছেলেমেয়েদের অভিজ্ঞতা যত বাড়িতে এবং গভীর হইতে থাকে তত তাহাদের শব্দজ্ঞান স্পষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী হয়।

পড়া জিনিষ বার বার মৌখিকভাবে পড়িতে বলিলে ছেলেমেয়েরা উৎসাহ পায় না। নূতন জিনিষ যাহা কোন বালক বা বালিকার সঙ্গীরা শুনিতে আগ্রহবোধ করে তাহা পড়িয়া শুনাইতে সে আনন্দ পায়। এইভাবে পড়িয়া শুনাইতে তাহাকে উৎসাহিত করা উচিত কেননা জোরে পাঠ করার ফলে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে, স্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে বলিতে এবং শ্রোতারা যাহাতে সকলে শুনিতে পায় এইরূপ উচ্চ কণ্ঠে পড়িতে শিখে। শ্রোতারা যাহাতে অর্থ গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য মাঝে মাঝে থামিতে শিখে। ইহার ফলে সে স্বাভাবিক সুকণ্ঠে কথা বলিতে পারে, কথার মধ্যে প্রাণময়তা এবং ব্যঞ্জনা বিরাজ করে। একঘেয়ে স্বরে বা খুব উচ্চ বা নিম্নস্বরে কথা বলিবার অভ্যাস সে পরিত্যাগ করে। মাঝে কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া বক্তব্য বিষয়কে জোরাল এবং সুস্পষ্ট করে।

দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে ছেলেমেয়েরা মৌখিক অপেক্ষা নিঃশব্দে বেশী তাড়াতাড়ি পড়িতে পারে। ইহার পরেও ক্রমাগত মৌখিক পাঠ অভ্যাস করিলে নিঃশব্দে পড়িবার গতি হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে পারে।

ছেলেমেয়েরা যখন তাহাদের ভাব পরিষ্কার ও জোরালভাবে প্রকাশ করিবার আকাঙ্খা অনুভব করে তখন তাহাদের কথা বলিবার এবং কোন অভিজ্ঞতার সুশৃঙ্খল বর্ণনা দিবার সামর্থ্য জন্মায়। বালক বা বালিকা কখন যে জটিল বাক্যবিন্যাস শিখিয়া ফেলে তাহা বলা কঠিন। সাড়ে ছয় বৎসর বয়সে মেধাবী ছেলেমেয়ে জটিল বাক্য বলিতে পারে, যেমন, "আমি যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল", "বিড়ালটি কোথায় লুকাইল খুঁজিয়া পাইলাম না" অথবা "কিরূপে ইহা করিতে হয় আমায় শিখাইয়া দাও।"

সংখ্যা জ্ঞান।

প্রথমে ছেলেমেয়েদের সংখ্যাজ্ঞান বাস্তব জিনিষ লইয়াই গড়িয়া উঠে। গণনা শিখাইবার পূর্বে তুলনামূলক আয়তন বা সংখ্যা যেমন—কোন বস্তু অন্য বস্তু হইতে বড় বা ছোট, ভারী বা হাল্কা, লম্বা বা খাটো, অল্প বা বেশী—এইভাবে তাহাদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া উচিত। খুব ছোট ছেলেমেয়ে অল্প বলিলে সাত আটটি জিনিষ মনে করিতে পারে, বড় হইয়া চার পাঁচটিকে অল্প মনে করে।

এমন কাজকর্ম ও সমস্যা তাহাদের দিতে হইবে যাহাতে স্বাভাবিকভাবে সংখ্যার ব্যবহার আসিয়া পড়ে। যেমন পাতা সংগ্রহ, মাটির জিনিষপত্র গড়া প্রভৃতি কাজের পর কি ধরণের পাতা কয়টি সংগ্রহ হইল, কোন্ জিনিষ কয়টি তৈয়ারী হইল, দোকানঘর খেলিতে গিয়া কেনা বেচার হিসাব—এই সব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাহাদের গাণিতিক জ্ঞান স্বাভাবিক প্রয়োজনের মধ্য দিয়াই বিকশিত হয় এবং সংখ্যার অর্থ তাহারা বুঝিতে পারে। কোন গাণিতিক প্রশ্নের কি উত্তর হইতে পারে তাহার আন্দাজ করিতে তাহাদের শেখান দরকার এবং সংখ্যার ব্যবহার সম্বলিত বিষয় পড়িতে দেওয়া উচিত। সহজ গণনা এবং গাণিতিক সমস্যা সমাধানে দ্রুততা ও নির্ভুলতাও এই সময় তাহাদের কাছ হইতে আশা করা যায়।

মানসিক বিকাশের অন্যান্য দিক।

ছেলেমেয়েদের মানসিক ক্রমবিকাশ প্রাথমিক স্তরেও চলিতে থাকে। এই সময় তাহাদের যুক্তির বিকাশ হইতে থাকে। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বুঝিতে পারে, যাহা অদ্ভুত বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ তাহা ধরিতে পারে। কোন্ পরিস্থিতিতে কি করা কর্তব্য তাহা বিবেচনা করিতে শিখে।

দৈনন্দিন জীবনে যে সব অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন ছেলেমেয়েরা হয় তাহার সমাধান খুঁজিতে গিয়া ও প্রয়োগ করিতে গিয়া তাহারা চিন্তা করিতে শিখে। উপযুক্ত সহায়তা পাইলে তাহারা সহজ সহজ সিদ্ধান্ত করিতে পারে।

স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ দিবার ক্ষমতাও বাড়িতে থাকে।

পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা এবং মানসিক সামর্থ্য।

শিক্ষিত পিতামাতার ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানসিক ক্ষমতা বেশী দেখা যায়। পরিবেশ হইতে ইহারা বেশী প্রেরণা পায় এবং হয়ত বংশগতিক্রমে প্রাপ্ত সম্ভাবনাগুলি তাহাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। ছুতার, কামার, কুমার ইত্যাদি নিম্ন পেশার ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ বৌদ্ধিক শক্তিতে উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েদের হইতে পিছাইয়া থাকে। তবে কয়েক বৎসর রীতিমত বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে বুদ্ধিগত প্রভেদ বেশ কমিয়া যায়।

গ্রামের ও সহরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। তাহাদের বিভিন্ন পরিবেশ এবং অভিজ্ঞতা ইহার কারণ হইতে পারে। তাহাছাড়া সহরের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইবার বেশী সুযোগ পায় এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্পর্শে থাকে, সেইজন্য তাহাদের বৌদ্ধিক বিকাশ গ্রামের ছেলেমেয়েদের অপেক্ষা বেশী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপের সহিত স্বাস্থ্য, শারীরিক বৈকল্য বা পুষ্টির কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হইলে বা দৈহিক ত্রুটি যেমন চোখ, কান, দাঁত ইত্যাদি সারাইয়া দিলে বা পুষ্টিকর ও সুসম খাদ্য খাইতে দিলে বুদ্ধির অনুরূপ উন্নতি কিছু হয় না। অনেকে মনে করেন টনসিল অপারেশন করিয়া সারাইয়া দিলেই ছেলে বা মেয়ের বুদ্ধি খুলিবে। কিন্তু কার্যতঃ সেইরূপ কোন ফল পাওয়া যায় নাই। তবে শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে বুদ্ধির কোন বৃদ্ধি না হইলেও বিদ্যালয়ের লেখাপড়া ভাল হয়।

ছেলেমেয়েদের প্রতি পিতামাতার স্নেহাদর বাড়াইয়া দিলে এবং প্রক্ষোভ সুনিয়ন্ত্রিত হইলে অর্থাৎ অতিরিক্ত রাগ-ভয়-লজ্জার বিচলিত অবস্থা হইতে স্থিরতা প্রাপ্তি ঘটিলে বুদ্ধি কিছুটা বাড়ে বলিয়া দেখা গিয়াছে।

সাধারণতঃ কৈশোর পর্যন্ত বুদ্ধি বাড়িয়া চলে বলিয়া মনে করা হয়। তবে বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুদ্ধি বাড়িবার গতি ও সীমার তারতম্য হয়। কাহারও মধ্যে বয়সের তুলনায় বুদ্ধি ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে এবং কাহারও মধ্যে দ্রুতগতিতে বাড়ে। ধীরগতিতে বাড়িয়া বালক বা

বালিকা কৈশোরে যে বুদ্ধির সীমায় পৌঁছায়, দ্রুতগতিতে বাড়িলে সে সীমা অনেক বেশী অতিক্রম করিয়া যায়। বয়স অনুযায়ী বুদ্ধির এই বাড়কে যেমন ত্বরান্বিত করা যায় না তেমনি পিছাইয়াও রাখা যায় না। সেইজন্য বুদ্ধি পরীক্ষায় যাহারা অল্পমেধা, সাধারণ এবং তীক্ষ্মমেধা বলিয়া পরিগণিত হয়, সারাজীবন তাহারা তাহাই থাকে।

সামাজিক বিকাশ।

ছেলেমেয়েরা এই সময় বিদ্যালয়ে আসে এবং বড়দের ও সমবয়সীদের সহিত নূতন সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করে। সৃষ্টিধর্মী কাজকর্মে লিপ্ত হওয়া-ব্যপদেশে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের ভাব বাড়ে এবং নিজেদের মেজাজ সামলাইয়া চলিতে শিখে। কর্মী বালক বা বালিকা যখন ছোট ছোট দলে থাকে তখন উদ্যোগী হইয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে শিখে। অনেকের কাছে বাড়ীর বাহিরে বিদ্যালয় প্রথম সমাজ জীবন। তাহারা এখন দুই জগতে বাস করিতে শিখে।

বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের অনেক নূতন সামাজিক ব্যবহার শিখিতে হয়। তাহাদের কিছুটা সৌজন্যপরায়ণ হইতে হয়, কোন কোন সময় চুপ করিয়া থাকিতে হয়, কোন কিছু করিতে বা লইতে নিজের বারের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, অন্য ছেলেমেয়ের ভুল ত্রুটি দেখিলে হাসাহাসি বা রহস্য না করিয়া সংযত থাকিতে হয়, অন্যে যখন কথা বলে তখন মনোযোগ দিতে হয়, দলের প্রয়োজনে নিজের কাজ বন্ধ করিতে হইলে রাগ না করিয়া অবস্থাকে মানিয়া লইতে হয় এবং তাহার প্রাপ্য যে সময় তাহাকে খেলিতে বা কাজ করিতে দেওয়া হয় ও তাহার প্রাপ্য যে মনোযোগ ও যত্ন দেওয়া হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। তাহাদের খানিকটা সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ ও আচরণ করিতে শিখিতে হয় যেমন, বিদ্যালয়ের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, দলগত কোন কাজে অন্য সাথীদের সহিত কাজ বাঁটিয়া করিতে হয়, হয় দলের নেতৃত্ব লইতে হয়, অথবা যে কার্য তাহার প্রতি সমর্পিত হইয়াছে তাহা করিতে হয়, ঠিক সময় ঠিক জায়গায় উপস্থিত থাকিতে হয় এবং ন্যায়সঙ্গত

আচরণ করিতে হয়। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে অনেক কাজে সাহায্য করিতে হয় যেমন, বিদ্যালয় গৃহ ও প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখিবার জন্য ন্যস্ত কাজের ভাগ তাহাকে করিতে হয় এবং যে সব কাজের জন্য সে 'নেতা' বা 'মন্ত্রী' নির্বাচিত হইয়াছে অথবা ভারপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা সুসম্পন্ন করিতে হয়। এই সব সামাজিক আচরণ করিতে করিতে সাত বৎসর বয়স হইতেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটি সামাজিক বোধ এবং সমানুভূতি জন্মায়।

সামাজিক বিকাশের তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তরে ছেলে বা মেয়ের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতার প্রাধান্য থাকে এবং বাহিরের কোন সামাজিক প্রেরণা তাহার কাছে পৌছায় না। দ্বিতীয় স্তরে সে সামাজিক যোগাযোগের চেষ্টা করে এবং তৃতীয় স্তরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সামাজিক আদানপ্রদানে পরস্পরের প্রতি সম্মানের ভাব উৎপন্ন হয়। সংস্কৃতিসম্পন্ন ও স্বচ্ছল গৃহ হইতে আগত ছেলেমেয়েরা তাড়াতাড়ি প্রথম স্তরগুলি অতিক্রম করিতে পারে। নিম্নশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েদের প্রথম স্তরগুলি অতিক্রম করিতে দীর্ঘ সময় লাগে।

অতি শৈশব হইতে ছেলেরা মেয়েদের অপেক্ষা বেশী অস্থিরভাবাপন্ন হয়। তাহারা বেশী দুর্দান্ত হয় এবং বিপদ ডাকিয়া আনে। ছয় বৎসর বয়সের পর ছেলেদের মধ্যে এই সংগ্রামের ভাব খানিকটা গঠনাত্মক কার্যে পর্যবসিত হয়। মেয়েরা ছেলেদের অপেক্ষা বেশী নির্ভরশীলতা দেখায়।

ছয় বৎসরের ছেলেমেয়েরা বড়দের কাছে কাছে থাকিতে চায়, তাহারা যাহা করে বড়রা তাহা পছন্দ বা অনুমোদন করুক—ইহা তাহারা চায়।

ছেলেমেয়েরা যতই সঙ্গী সাথীদের সহিত মেলামেশা করিতে থাকে ততই তাহারা বড়দের উপর নির্ভরশীলতা ছাড়িতে থাকে। খুব ছোটদের দলে দেখা যায় একজন আর একজনের উপর অতিরিক্ত প্রভুত্ব করিতে ও বশে আনিতে চায়, গালাগালি করে, দুর্বল ও অশক্তদিগের উপর অত্যাচার করে। সকলের উপর থাকিতে চায়—মোটকথা দলের কেহই ভদ্রতা বা সৌজন্য শিখে নাই, দলে হৈ চৈ ও চেঁচামেচি চলিতে থাকে। ক্রমে যে সব আচরণের ফল ভাল হয় অর্থাৎ যাহার ফলে তাহারা শারীরিক কষ্ট পায় বা অন্যের ভালবাসা

হারায় সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া অন্যের ভালবাসা ও স্বীকৃতি লাভ করিবার জন্য অনুমোদিত আচরণে অভ্যস্থ হইতে থাকে।

তাহাদের কাজকর্মে ও খেলাধূলায় তাহারা যতই পারদর্শী হইতে থাকে ততই বড়দের তদ্বির-তদারক পছন্দ করে না—নিজেদের কাজ নিজেদের চেষ্টাতেই করিতে চায়। উপযুক্ত সহায়তা পাইলে তাহারা তাহাদের নিজেদের ঝগড়াঝাটি নিজেরাই মিটাইয়া ফেলিতে শিখে এবং নিজেদের নিয়ম বানাইতে পারে। তাহারা কর্তৃত্বপূর্ণ নির্দেশ পালন করা অপেক্ষা সহানুভূতিপূর্ণ পরামর্শ শুনিতে চায়। প্রাথমিক স্তরের শেষদিকে তাহারা একত্রে মিলিয়া মিশিয়া কোন কাজ বা খেলার পরিকল্পনা রচনা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সেই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার যথেষ্ট যোগ্যতা লাভ করে। ছেলেমেয়েরা এই বয়সে যে কোন সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করিতে পারে। বিদেশী, অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের বা ভিন্ন জাতির ছেলেমেয়েদের বন্ধু করিয়া লওয়াতে তাহারা বাচবিচার করে না।

আড়াই বৎসর হইতে সাড়ে চার বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা কাল্পনিক সাথীর সহিত কথাবার্তা কয় ও খেলা করে। বিদ্যালয়ে আসিবার পরও তাহাদের কাল্পনিক সাথীর সহিত সম্পর্ক অনেক সময় চলিতে থাকে। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ এই মনঃসৃষ্ট সাথী অদৃশ্য হইয়া যায়।

সামাজিক আচরণের বিকাশ সাধনের জন্য এই বয়সের ছেলেমেয়েদের দলগত অভিজ্ঞতা পাওয়া দরকার। দলের মধ্যে থাকিলে অপরের জন্য দায়িত্ববোধ জন্মায় এবং অপরের সাফল্যে সন্তোষ লাভ করিতে শিখে। তাহার নিজের আত্মসত্বা দলের মধ্যে বিস্তৃত হয়। বিদ্যালয়ে এমন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে বালক বা বালিকা অন্যদের সহিত নানাভাবে সম্পর্ক স্থাপন করিতে শিখে। যে বিদ্যালয় পরিবেশে সে স্বাধীনভাবে ঘুরাফিরা করিতে পারে, অন্য বালকবালিকাদের সহিত পরামর্শ করিতে ও তাহাদের সাহায্য করিতে পারে, দলের সমস্যা সমাধানে অংশগ্রহণ করিতে পারে এবং নানাপ্রকার সক্রিয় খেলা খেলিতে পারে সেখানে তাহার সামাজিক বিকাশ স্বচ্ছন্দগতিতে হইতে থাকে। শিক্ষকের কাজ হইবে তাহাকে এই সব

কাজকর্মে ও আচরণে প্রয়োজনমত সহায়তা করা, কোন বাঞ্ছিত সামাজিক আচরণ করিতে দেখিলে তাহার প্রশংসা করা এবং আরও ভাল করিয়া কিভাবে সামাজিক কাজকর্ম করা যায় কখনও কখনও সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া। এইরূপ বিদ্যালয়ে এমন পরিবেশের সৃষ্টি হয় যাহাতে সকলে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। ছাত্রের সহিত ছাত্রের এবং ছাত্রের সহিত শিক্ষকের যদি এইরূপ মধুর সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহা হইলে একটি সুস্থ দলভুক্তির ও দলগত নির্ভরতা ও বিশ্বাসের ভাব উৎপন্ন হয় এবং ইহার ফলে সমাজকে অন্তরের সহিত মানিয়া লওয়ার পথ সুগম হয়। ইহার ফলে একটি অনুকূল সামাজিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

শিক্ষক তাঁহার নিজের আচরণের দ্বারা ছেলেমেয়েদের প্রভাবান্বিত করেন। কোন কোন শিক্ষক সৌজন্য ও সখ্যতার প্রেরণা দেন, আবার কোন কোন শিক্ষক অসৌজন্য ও কলহপ্রিয়তার সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের নিজেদের ব্যবহারই এজন্য দায়ী। তাঁহারা যেইরূপ সামাজিক আচরণ ছেলেমেয়েদের সহিত করেন ছেলেমেয়েরাও সেইরূপ আচরণে অভ্যস্থ হয়। সামাজিকবোধ-সম্পন্ন ও সামাজিক আচরণে নিপুণ ব্যক্তিদের সংস্রবে থাকিলে ছেলেমেয়েদের সামাজিক বিকাশ দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে হয়।

নৈতিক বিকাশ।

আত্মকেন্দ্রিকতা হইতে আরম্ভ করিয়া ছেলেমেয়েরা নৈতিক বিকাশের কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে। আত্মকেন্দ্রিকতার পর আসে সমাজকেন্দ্রিকতা। এই স্তরে তাহারা সমাজের নিয়ম ও প্রথাকে সম্মান করে ও মানিয়া চলে। ইহার সঙ্গে আসে সমাজচেতনা অর্থাৎ সমাজকে ভয় করিতে শিখা, যাহার ফলে তাহারা সমাজবিধি বহির্গত কাজ করিতে সাহস পায় না। ইহারই সঙ্গে আসে অপরাধ-বোধ বা অনুমোদন না পাওয়ার আশঙ্কা হইতে সামাজিক যোগাযোগে বা আদান প্রদানে নিরাশক্তি। কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা এই অবস্থা কাটাইয়া উঠে এবং বন্ধুদের সহিত ভাল সম্পর্কস্থাপনের ইচ্ছার ফলে আবার সামাজিক যোগাযোগ ও আদান প্রদানে অভ্যস্থ হয়। ইহার পর ন্যায় ও নীতির আত্মবোধ জন্মে

এবং সর্বশেষে অন্যকে সুখী করিবার জন্য নিজের স্বার্থকে বিসর্জন করিতে আনন্দ পায়। স্তরগুলির ক্রম অবশ্য ব্যক্তির জীবনে একই রকম থাকে না।

ছয়, সাত, আট বৎসরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অনুযায়ী তাহাদের বিবেক, সততা ও ন্যায়পরায়ণতাবোধ গড়িয়া উঠে।

বড়দের আদর্শের সঙ্গে ছোটদের আদর্শ প্রথমে মেলে না। বড়দের কাছে যাহা দুষ্টামী, ছোটদের কাছে তাহা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়, যেমন, অসময়ে খাওয়া, অন্য শিশুকে নির্যাতন করা, কাজের সময় বড়দের জ্বালাতন করা বা বায়না ধরা। এই সব কাজের জন্য তাহাদের যদি শুধু বকাবকি, মারধোর ও ভয় দেখান হয় তাহা হইলে তাহাদের মনে অপরাধবোধ, আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয় এবং মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হয়। অন্যপক্ষে তাহাদের যদি যুক্তি দিয়া, উদাহরণ দিয়া, তুলনা করিয়া বা অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দেওয়া হয় বা দেখাইয়া দেওয়া হয় যে কাজটি অভিপ্রেত নয় বা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বা যাহা কিছুতেই করিতে দেওয়া যাইতে পারে না, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে নূতন সামাজিক মূল্যবোধ জন্মায় এবং পরে তাহারা সেই অনুযায়ী কাজ করিতে চেষ্টা করে।

এই বয়সে ছেলেমেয়েরা যাহা বড়দের কাছ হইতে শুনে তাহাই নির্বিচারে মানিয়া লয়। সাত বৎসর বয়সের সময় এই ভাবটি প্রবলতম হয়। এই সময় পিতামাতা এবং অন্য বয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়ম ও ইচ্ছানুরূপ চলিতে পারাই তাহাদের কাছে একমাত্র নৈতিক বিধি। প্রথমে ছেলে বা মেয়ে যাহাদের সে ভালবাসে তাহাদের প্রীত্যর্থে বা প্রীতি হারাইবার ভয়ে সে নীতিসম্মত কাজ করে। ক্রমে বয়স বাড়িবার সঙ্গে নীতিসম্মত কাজ সে কেন করিতে হয় তাহা বুঝিতে চায় এবং যে নৈতিক নিয়মগুলি সে স্ব-ইচ্ছায় স্বীকার করিয়া লয় তাহাদের সে আত্মীকরণ করে অর্থাৎ এ পর্যন্ত নৈতিক নিয়মগুলি বাহিরের জিনিষ ছিল এখন সেইগুলি তাহার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হইয়া যায় অর্থাৎ এখন সে নৈতিক কাজ তাহারই নিজের কাজ হিসাবে করে।

ছেলেমেয়েরা পিতামাতা ও শিক্ষকদের মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করে এবং তাহাদের আদর্শের দ্বারা তাহারা প্রভাবান্বিত হয়। সেইজন্য

তাহাদের সামনে পিতামাতা ও শিক্ষকদের নিজেদের আচরণের দ্বারা উত্তম উদাহরণ স্থাপন করিতে হইবে। দায়িত্ববোধ, অধ্যবসায়, আত্মনির্ভরশীলতা, সহযোগ, সৌভ্রাত্র, অন্যকে সম্মান দেখান, সততা, সাহস—এইরূপ আচরণ তাহাদের সামনে অহরহ উপস্থাপন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া কোন কোন সামাজিক পরিস্থিতিতে হতবুদ্ধি হইয়া যাইতে পারে যেমন, কোন ব্যাপারে প্রথম হইতে গেলে উদারতা দেখান যায় না বা কাহাকেও সাহায্য করিতে গেলে নিজের ক্ষতি হইতে পারে—এইসব ক্ষেত্রে যে কার্যের নৈতিক মূল্য বেশী তাহা নির্বাচন করিতে তাহাদের সাহায্য করিতে পারেন।

নৈতিকবোধ হইলেই যে নৈতিক কাজ ছেলেমেয়েরা করিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। মুখে চুরিকরা অন্যায় স্বীকার করিলেও সুযোগ পাইলেই হয়ত চুরি করিবে। আবার বয়স বাড়িতে থাকিলেও যে তাহারা স্বার্থপরতা বা শঠতা ক্রমশঃ ছাড়িবে তাহা বলা যায় না। নৈতিক ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্ভর করে পরিবেশের উপর। সামাজিক পরিবেশে যদি সততা ও নিঃস্বার্থপরতা বিরাজ করে তবেই তাহারা তাহার দ্বারা প্রভাবান্বিত ও চালিত হয়।

প্রক্ষোভিক বিকাশ

ভয়।

মানুষের হাড়ের ভিতর ভয় আছে। একেবারে নির্ভয় মানুষ পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। আত্মরক্ষার জন্য ভয়ের প্রয়োজনও আছে। তবে ভয় যদি তীব্র ও হেতুহীনভাবে বালক বালিকার ভিতর অনবরত দেখা যায় তাহা হইলে তাহাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। বড়রা ছেলেমেয়ের ভয়ের কারণ, কিভাবে ভয় প্রকাশিত হয় এবং তাহারা ভয়ের কি অর্থ করে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিবেন।

আঘাত বা ক্ষতির অভিজ্ঞতা হইতে ভয়ের উৎপত্তি হইতে পারে। অনুরূপ পরিস্থিতিতে ছেলেমেয়েদের ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। নিজের অযোগ্যতা, উৎকণ্ঠা এবং অসহায়ত্বের মনোভাব হইতেও ভয় জন্মাইতে পারে,

এমনকি জীবনের সঙ্গে কোন ছেলে বা মেয়ে যদি আঁটিয়া উঠিতে না পারে তাহা হইলে জীবনই তাহার কাছে ভয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। কোন চিন্তা বা কার্য সম্বন্ধে অপরাধের মনোভাব বা অমীমাংসিত মানসিক দ্বন্দ্বের সহিত ভয় জড়িত থাকিতে পারে।

যে সব ছেলেমেয়ে খুব লাজুক বা অতিরিক্ত নির্ভরশীল তাহারা যখন প্রথমে বিদ্যালয়ে আসে তখন ভয় পায়। অপরিচিত শিক্ষক, ছেলেমেয়ে ও পরিবেশ এবং মায়ের অনুপস্থিতি তাহাদের ভীত করিয়া তুলে। অনেক ছেলেমেয়ে বিদ্যালয় ও শিক্ষক সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারনা পোষণ করে। তাহাদের কাছে বিদ্যালয় এইরূপ একটি স্থান যেখানে ছেলেমেয়েরা যাইতে পছন্দ করে না এবং শিক্ষক এমন একজন ব্যক্তি যিনি দুষ্টামী করিলে বা পড়া না করিলে বেত মারেন এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এমন সব ছেলেমেয়ে যাহারা জ্বালাতন করে ও মারধোর করে। এইরূপ বিপরীত ধারণা যাহাতে তাহাদের মনে না জন্মায় তাহা দেখা এবং ইহার পরিবর্তে বিদ্যালয় সম্বন্ধে উৎসাহ ও আনন্দপ্রদ মনোভাব জাগান প্রয়োজন। বিদ্যালয় এমন স্থান হওয়া উচিত যেখানে তাহারা গল্পের বই পড়িতে, অন্য ছেলেমেয়েদের সহিত খেলাধুলা করিতে এবং নূতন নূতন ও মজার মজার জিনিষ দেখিতে পাইবে।

ভীতু ছেলে বা মেয়েকে এমন কাজ দিতে হইবে যাহা করিতে সে ভালবাসে এবং যাহা সে সফলভাবে করিতে পারে। এইভাবে মন বসিলে বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাহার ভয় চলিয়া যায়।

ভয়ের প্রকাশভঙ্গী নানাপ্রকার হইতে পারে। আস্ফালন ও আক্রমনাত্মক আচরণের মুখোস পরিয়া ভয় প্রকাশ পাইতে পারে, সামাজিক পরিস্থিতির সহিত মানাইয়া না চলিবার আশঙ্কা হইতে আসিতে পারে, সামাজিক কাজকর্ম হইতে দূরে থাকা বা 'আমি অনেক বড়, অন্যদের সঙ্গে মিশি না'—এইরূপ মিথ্যা আত্মগরিমা হইতে আসিতে পারে।

ভালবাসা।

ভালবাসা প্রকাশ পায় যখন কেহ ভালবাসার পাত্রের সহিত সমঅনুভূতি-সম্পন্ন হয় অর্থাৎ যাহার সুখ দুঃখে সেও সুখ ও দুঃখ অনুভব করে, তাহার

নিজস্বতাকে প্রীতিভরে স্বীকার করে, তাহার মঙ্গলাকাঙ্খী হয়, তাহার সব ব্যাপারে অংশীদার হয় কিন্তু কখন তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে বা জোর করিয়া তাহাকে পরিবর্তন করিতে চায় না। ভালবাসা উভয়েরই পক্ষে শুভ ও কল্যাণকর। বিদ্যালয়ে আসিবার আগে যে বালক বা বালিকা ভালবাসিতে শিখিয়াছে, সে বিদ্যালয়ের সঙ্গীসাথীদের সহিত প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। যে বালক বা বালিকা ভালবাসা পায় না সেই অতিরিক্ত নির্ভরশীল বা প্রভুত্বকামী বা অতিরিক্ত আক্রমণশীল বা অন্যদের কাছ হইতে সরিয়া থাকিতে চায়।

বালক বা বালিকা শিক্ষককে তখনই ভালবাসে যখন তাহাদের সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ ও তাহার স্বাভাবিক বিকাশের অনুকূল হয়। এইরূপ সম্পর্কের মধ্যে তাহাকে মর্যাদা দেওয়া হয় এবং তাহার শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাগুলির বিকাশের জন্য সাহায্য করা হয়। শিক্ষকের সহিত যদি তাহার সম্পর্ক অস্বস্তিকর হয় এবং শিক্ষক তাহার মধ্য দিয়া যদি কেবল নিজের ইচ্ছাই জোর করিয়া পূরণ করিতে চান তবে সেইরূপ শিক্ষককে সে মনেপ্রাণে ভালবাসিতে পারে না। বালক বালিকারা যে ব্যক্তিদের সত্যকার ভালবাসে তাহাদের সহিত অকুণ্ঠিতচিত্তে সহযোগিতা করে এবং তাহাদের কথামত কাজ করে কিন্তু যাহাদের তাহারা ভালবাসেনা তাহাদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব থাকে।

কৃতী শিক্ষক ছেলেমেয়েদের হৃদয়াকাঙ্খা কি সে বিষয়ে সজাগ থাকেন। কেহ কেহ অন্য সব বিষয় হইতে স্নেহভালবাসাই বেশী করিয়া পাইতে চায়; কাহারও কাহারও গুরুজনদিগের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব আছে, তাহাদের মধ্যে মান্য করিবার মনোভাব জন্মাইতে হইবে; অন্যদের বেশী করিয়া আত্মনির্ভর হইতে শিখিতে হইবে।

ঘৃণা এবং ক্রোধ।

ঘৃণা এবং ক্রোধের কারণগুলি যাহাতে না ঘটিতে পায় তাহার জন্য শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এমন কতকগুলি পরিস্থিতি আছে যাহা ছেলে বা মেয়েকে রাগাইয়া তুলে যেমন, তাহাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পালন না

করা, তাহার মন্দ ব্যবহারের জন্য তাহাকে না ভালবাসা, যে কাজ সে উত্তমরূপে করিতে পারে এবং যাহাতে সে আগ্রহী তাহাতে তাহাকে নিজেকে তাহা সম্পূর্ণ করিতে না দিয়া অনাবশ্যকভাবে হস্তক্ষেপ করা, যে কাজ তাহার ক্ষমতার বাহিরে যাহার ফলে তাহা করিতে গিয়া সে নিয়ত অসফল হয় এমন কাজ করিতে দেওয়া। শিক্ষক অনায়াসেই এই পরিস্থিতিগুলিকে পরিহার করিতে পারেন।

আবার এমন কতকগুলি পরিস্থিতি আছে যাহাতে ছেলেমেয়েদের রাগ হইতে পারে কিন্তু যেগুলির সহিত তাহাদের মানাইয়া লইতে অভ্যাস করাইতে হইবে। যেমন, যখন কোন বালক বা বালিকা অন্য বালক বা বালিকার অপেক্ষা ভাল কাজ করে, তখন তাহার ঈর্ষার মনোভাব জন্মায়। কোন খেলায় কোন বালক বা বালিকাকে বিশেষ স্থান দিলে অন্য বালক বালিকার রাগ হইতে পারে। শ্রেণীর কাজে বিঘ্নসৃষ্টি করিয়া ভর্ৎসিত হইলে অভিমান হয়। খেলায় হারিয়া গেলে রাগ হয়। বালক বা বালিকা যে খেলা খেলিতে চায় তখন সাথীরা যদি সে খেলা খেলিতে না চায় তখন তাহার রাগ হয়। অন্যের জিনিষ যখন সে পাইতে চায় অথচ পায় না তখন রাগ হয়। অন্য বালকবালিকা যখন তাহাকে জ্বালাতন করে তখন সে রাগিয়া উঠে।

এইসব অবস্থাগুলি শিক্ষক বালক বালিকার জীবন হইতে সরাইয়া লইতে পারেন না সেইজন্য বাস্তব পরিস্থিতির অনিবার্যতা বুঝাইয়া তাহাদের মনের সাম্য বজায় রাখিবার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

আবার এমন কতকগুলি অবস্থা আছে যাহাতে ছেলেমেয়েরা রাগিয়া যায় কিন্তু যেগুলি বিদ্যালয় জীবনের বাহিরে।

কোন কারণে পিতামাতা যদি সন্তানকে ভালবাসিতে না পারেন অথবা স্নেহাধিক্য বশতঃ তাহাকে সবসময় রক্ষা করিয়া বেড়ান তাহা হইলে সে অন্য বালক বালিকা বা বয়স্কদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে না এবং অনেক অভিজ্ঞতা যাহা সে একান্তভাবে কামনা করে তাহা হইতে বঞ্চিত হয়—এ অবস্থায় তাহার রাগ বা অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। তাহার গৃহপরিবেশের মধ্যে সব সময়ই যদি তাহার উপর বিধিনিষেধ উদ্যত থাকে এবং অহেতুক

কঠিন শাসন এবং কোন কাজ করিবার জন্য বিরক্তিকর পীড়াপীড়ি করা হয় তাহা হইলে স্বভাবিকভাবেই সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। যদি সে দেখে রাগিয়া গেলে তাহার বাঞ্ছিত জিনিষ আদায় করিতে পারে তবে সেই উপায়ই সে বারবার ব্যবহার করে। শারীরিক যন্ত্রণা, অপুষ্টি ও ক্লান্তির অবস্থায় সে সহজে উত্তেজিত হইয়া উঠে। যদি পিতামাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হয় এবং অন্য ভাইবোনদের সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে হীন প্রতিপন্ন করা হয় তখন সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও অসহায় বোধ করে এবং অভিমানে গুমরাইয়া মরে।

বালক বা বালিকা তাহার প্রক্ষোভগুলিকে নানাভাবে প্রকাশ করে। সে যাহাতে এইগুলিকে গঠনাত্মক বা সৃজনাত্মকভাবে ব্যক্ত করিতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। অতিরিক্ত ক্রোধ বা অহেতুক ভয় যদি প্রকাশ পাইতে থাকে তাহা হইলে প্রথমে তাহার শারীরিক অবস্থা কিরূপ তাহা দেখা দরকার। পুষ্টিকর খাদ্য, পরিমিত শ্রম ও যথেষ্ট বিশ্রাম ও নিদ্রা না পাইলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে এবং ফলে মেজাজ বিগড়াইয়া যাইতে পারে। আট বা নয় বৎসরের বালক বা বালিকাকে রাগ, দ্বেষ, হিংসা, ভয়কে সোজাসুজি প্রকাশ না করিয়া অন্যপথে কিভাবে লইয়া যাওয়া যায় তাহা শেখান যায়। চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, উদ্যানরচনা ইত্যাদি সৃজনাত্মক কাজ বা খেলাধূলা, দৌড়ঝাঁপ এবং দারুশিল্পের মত শিল্পকাজ যেগুলিতে দৈহিক শক্তি দরকার হয় সেগুলিতে নিযুক্ত থাকিলে সে ভয়ভাবনা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে, তাহার প্রক্ষোভের শক্তি বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত হয় এবং ফলে সে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করে। যদি সে বেশী ক্রোধোন্মত্ততা দেখায় তাহা হইলে ক্রোধের উপশম হইলে তাহাকে কিছুটা যুক্তি দিয়া বোঝান যাইতে পারে। তাহার ক্রোধ যাহাতে অভিপ্রেত পথ ধরিয়া প্রকাশিত হয় সে বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করা দরকার।

ভীতু, ক্রোধী ও প্রসন্নচিত্ত বালক বালিকার ভূমিকায় নামিয়া দৈনন্দিন ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ছেলেমেয়েরা অভিনয় করিতে পরে। ইহাতে শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা তাহাদের আচরণ সম্বন্ধে খানিকটা অন্তদৃষ্টি লাভ করে এবং পরে অনুরূপ পরিস্থিতিতে তাহাদের আচরণ সন্তোষজনক হয়।

প্রাক্‌-কৈশোর।

শারীরিক বিকাশ।

এই সময় প্রধানতঃ দুইটি পর্যায়ের মধ্য দিয়া বালক বালিকার দৈর্ঘ ও ওজনের বৃদ্ধি ঘটে। নয় বৎসর বয়সের সময় বৃদ্ধির গতি প্রায় একবৎসর ধরিয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। পূর্বেকার বৃদ্ধিকে স্থায়িত্ব দিবার জন্যই বোধহয় এই-সময়টা বৃদ্ধির গতি কম থাকে। ইহার পরে দুই বৎসর ধরিয়া দ্রুত বৃদ্ধি হয়। ছেলেদের তেরো বৎসর বয়সের কাছাকাছি এবং মেয়েদের এগার বার বৎসর বয়সের কাছাকাছি এই দ্রুত বৃদ্ধির পরিসমাপ্তি ঘটে। ছয় বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময় হইতে দ্রুত বৃদ্ধির পূর্বেই অবশ্য বালক বালিকা পূর্বাপেক্ষা দৈর্ঘে দেড়ফুট ও ওজনে দ্বিগুণ বাড়ে। বালকদিগের অপেক্ষা বালিকাদিগের বৃদ্ধি ও পরিপক্বতা প্রায় এক বৎসর আগেই ঘটিতে থাকে। বৃদ্ধির ক্রম ও মাত্রার মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অনেক তারতম্য দেখা যায়। লম্বা ছেলেমেয়েদের বৃদ্ধি এই সময় খুব তাড়াতাড়ি ঘটিতে দেখা যায়।

বালক বালিকার যৌন এবং শরীরবৃত্তীয় অর্থাৎ শরীরাভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির পরিপক্বতার উপরে দৈহিক বৃদ্ধির ক্রম ও মাত্রা নির্ভর করে। যাহাদের পরিপক্বতা সকাল সকাল হয় তাহাদের যৌনাগম তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়ে এবং কৈশোরের পূর্ব পর্যন্ত অন্যদের হইতে তাহারা প্রত্যেক বয়সেই দৈর্ঘ ও ওজনে বেশী থাকে।

প্রাক্‌-কৈশোরে সমবয়সী বালক বালিকাদের মধ্যে বালিকারা বালকদের অপেক্ষা বেশী লম্বা ও ভারী হয়।

মানসিক শক্তির অল্পতা দৈহিক বৃদ্ধির দুর্বলতার সহিত জড়িত থাকে। অল্প মানসিক শক্তিসম্পন্ন বালকের দৈহিক বৃদ্ধির গতি স্বাভাবিক বালকদিগের অপেক্ষা কম হয়। যদিও এইরূপ ছেলেরা দীর্ঘ সময় ধরিয়া বাড়ে তবুও তাহাদের চরম বৃদ্ধি স্বাভাবিক ও মেধাবী বালকদিগের অপেক্ষা কম হয়। কেবল যে তাহাদের দৈর্ঘ ও ওজনই কম হয় তাহা নহে, চলিতে শিখিতে, দন্তোৎগম ও যৌনাগমও তাহাদের বিলম্বে হয়।

অল্প মেধাযুক্ত বালক বালিকার দৈহিক বৃদ্ধির গতি ও পরিমাণ কম দেখা গেলেও সাধারণভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে ছেলেমেয়েদের দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির মধ্যে সম্বন্ধ খুব নগণ্য। প্রাক্-কৈশোরে যে দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি হয় অনুরূপ দ্রুত মানসিক শক্তির বৃদ্ধি হয় না। বালক ও বালিকাদের দেহের বৃদ্ধির গতি বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মানসিক বিকাশের ধাঁচ একই রকম থাকে।

ছেলেমেয়েদের দৈহিক শক্তিও বাড়িতে থাকে। ছয় বৎসর বয়সে যে শক্তি ছিল এগার বৎসর বয়সের মধ্যে তাহা বাড়িয়া দ্বিগুণ হয়। প্রাক্-কৈশোরের দ্রুত বৃদ্ধির সময় বালকদের দৈহিক শক্তি বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়।

ছেলেমেয়েদের স্থায়ী কসদাঁত এবং অন্যান্য দাঁতগুলি উঠিতে থাকে। এই সময়ও দাঁতের ক্ষয়রোগ দেখা যায়।

ক্রিয়াত্মক শক্তির বিকাশ।

প্রাক্-কৈশোরে ছেলেমেয়েরা সব বিষয়ে আগ্রহী, সক্রিয় ও সজাগ হইয়া উঠে। তাহাদের নিজেদের শরীর বেশ বসে আসে। তাহারা এখন খুব জোরে দৌড়াইতে পারে এবং দম বাড়িয়া যায় ও খেলাধূলায় তাড়াতাড়ি পটু হইয়া উঠে। শারীরিক শক্তিগুলি বশে আসায় সে তাহার সমাজের সঙ্গে বেশ মানাইয়া চলিতে পারে। তাহাছাড়া তাহার যৌন এবং আক্রমণাত্মক আবেগগুলি খেলাধূলার মধ্যে নূতন রূপ পায়।

কাঁধের, বাহুর এবং কব্জির বড় বড় মাংসপেশীগুলি তাড়াতাড়ি পরিণত বয়সের মতন হইয়া উঠে কিন্তু আঙ্গুলের দ্বারা কাজ করিবার দ্রুততা বয়স্ক লোকের মত হইতে দেরী লাগে। যেসব ছেলেমেয়েরা লম্বা ও ওজনে ভারী তাহাদের শারীরিক ও ক্রিয়াত্মক নৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠতর হইতে দেখা যায়।

খেলাধূলা।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই সময় যেন অফুরন্ত তেজ ও শক্তির আবির্ভাব হয় এবং তাহারা সব সময়ই নূতন জিনিষ জানিতে ও নূতন অভিজ্ঞতা লাভ

করিতে অগ্রণী হয়। এই সময় তাহারা নানারকম খেলাধূলা, ললিত কলা ও শিল্পকাজে উৎসাহী হইয়া উঠে। তাহাদের এই উৎসাহের সুযোগ লইয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নানারকমের শিল্পকাজ, সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন কার্যক্রমের মধ্যে রাখা হয় যাহাতে তাহারা স্বাভাবিকভাবে এইগুলিতে আগ্রহী হয় এবং কর্মের মাধ্যমে নানা জ্ঞানবিজ্ঞান শিখিতে পারে।

ছেলেমেয়েরা কেন খেলাধূলায় এত আগ্রহী হয় সে সম্বন্ধে কয়েকটি যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে। কোনটির মতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে উদ্বৃত্ত তেজ বা শক্তি থাকে তাহাই প্রকাশিত হয় খেলাধূলার মধ্য দিয়া। এইরূপ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুসারে খেলা বয়স্ক জীবন ধারণের জন্য প্রস্তুত হওয়া, খেলার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব বা একঘেয়েমি হইতে মুক্তি পাওয়া, খেলা-স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে প্রকাশিত হয়, খেলা একটি জৈবিক বা মানসিক প্রয়োজন। যদিও বালক বালিকারা যে সব খেলাধূলা করে তাহার সহিত তাহাদের শারীরিক কর্মক্ষমতা ও শক্তির কিছুটা সম্বন্ধ আছে কিন্তু খেলা প্রধানতঃ তাহাদের সামাজিক বিকাশ কতটা হইয়াছে তাহারই পরিচায়ক এবং অন্যান্য কাজ অপেক্ষা খেলাই তাহাদের ব্যক্তিত্বকে বেশী করিয়া প্রকাশ করে। কতকগুলি খেলা যেমন লুকাচুরী, কানামাছি, এক্কাদোক্কা ইত্যাদি খেলা যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, এইগুলি ছেলেমেয়েরা যেন স্বভাবতই শিখিয়া যায়। নয় বৎসর বয়সের সময় খেলার বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশী হয়। দশ বৎসর বয়সের পরে খেলাধূলার সংখ্যা কমিয়া আসে। কাজকর্ম করিবার স্বাধীনতা পায় বলিয়া ছেলেমেয়েরা এখন বাড়ীর বাহিরে খানিকটা দূর অবধি চলিয়া যাইতে পারে। নিকটে পাহাড় পর্বত থাকিলে বেড়াইতে যায়, বনজঙ্গল থাকিলে গাছে চড়িতে, ফল কুড়াইতে ও চড়ুইভাতি করিতে যায়, সহরে যায়, সহরে বেড়াইতে ও যন্ত্রপাতি কিনিতে যায়, পুকুরে সাঁতার কাটিতে যায় এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ রাস্তা এবং স্থানসমূহে পদব্রজে বা সাইকেলে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। দশ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা কোন খেলাই পরীক্ষা না করিয়া ছাড়ে না। অবশ্য ছেলেমেয়েদের খেলার সংখ্যা পাত্র বিশেষে কমবেশী দেখা যায়।

দশ বৎসর বয়সে ছেলেরা দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে আগ্রহান্বিত হয়, নিজের দলের কাছে আনুগত্য দেখায় এবং অনেক দলবদ্ধ খেলায় অংশ গ্রহণ করে। এই সময় হইতে বল খেলায় তাহাদের আগ্রহ বাড়িয়া যাইতে থাকে, ফুলবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলায় ছোঁড়া, ধরা ইত্যাদি কৌশল শিখিতে হয় এবং সজ্ঘবদ্ধভাবে নিয়ম মানিয়া খেলিতে হয়। এখন হইতে এই সব জটিল সজ্ঘবদ্ধ খেলায় তাহারা আনন্দ পায়।

বল খেলা এখন লুকাচুরী খেলা বা খেলনা লইয়া খেলা অপেক্ষা বেশী আকর্ষণীয় হইয়া উঠে। কাল্পনিক খেলাও এই সময় হইতে কমিতে থাকে। প্রাক্-কৈশোরের শেষের দিকে বালিকাদের মধ্যে দ্রুত অদৃশ্য হইয়া যায়। তের চৌদ্দ বৎসর বয়সে শৈশবের খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া আসে। অবশ্য খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়, হঠাৎ হয় না। নয় হইতে বার বৎসর বয়সের বালকেরা শ্রমসাধ্য খেলাধূলায় নিযুক্ত হইতে চায়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দৌড়ান এবং অন্য প্রতিযোগিতামূলক খেলা পছন্দ করে। এই সব খেলায় দক্ষতা ও কৌশলের প্রয়োজন হয়। তাহারা ঈপ্সিত নৈপুণ্যলাভের জন্য এই সব খেলাধূলা অভ্যাস করিতে চায়। এই সময় সাইকেল ও ঘড়ি মেরামত, ইলেকট্রিক-বেল তৈয়ারী এবং অন্যান্য যান্ত্রিক কাজকর্ম করিতে চেষ্টা করে। কাঠের কাজ ও সাধারণ বিজ্ঞান তাহাদের প্রিয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। এই সময় বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে এই ধরণের শিল্পকাজ ও বিজ্ঞানের বিষয় থাকিলে স্বাভাবিকভাবেই ছেলেরা শিখিতে আরম্ভ করে।

মেধাবী ছেলেমেয়েরা সাধারণ ছেলেমেয়েদের মত খেলাধূলা করিলেও অনেক সময় তাহারা পুস্তক পাঠ করিয়া কাটায়। প্রতিযোগিতামূলক খেলায় তাহারা তত আকৃষ্ট হয় না।

খেলাধূলা করিতে করিতে ছেলেমেয়েরা তাহাদের কি কি বিষয়ে যোগ্যতা আছে তাহা জানিতে পারে এবং তাহাদের সঙ্গী সাথীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতে শিখে। কতকগুলি খেলাধূলা আজীবন থাকিয়া যায় যেমন, বল খেলা, সাঁতার কাটা, সখের রন্ধন করা, পশুপক্ষী পালন করা, সখের

গৃহ কাজ করা, ভ্রমণ, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং সঙ্গীত। দলগত খেলার মধ্য দিয়া ছেলেমেয়েরা এই বয়সে সাহস, একাগ্রতা, সহযোগিতা প্রভৃতি গুণ অর্জন করে, নিয়ম মানিয়া চলিতে শিখে এবং কৌশল আয়ত্ব করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকে।

যাহারা সঙ্গীতে অনুরাগী তাহাদের এই বয়সেই কণ্ঠ বা যন্ত্র সঙ্গীত শিখিতে আরম্ভ করা উচিত। এই বয়সে যে ছন্দজ্ঞান, ধ্বনিসাম্য ও পার্থক্য-বোধ, সুরপরম্পরার স্মৃতি এবং কণ্ঠের বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণ যতটা হয় সারা জীবনে দেখা যায় প্রায় তাহাই থাকে। তাহাছাড়া এই সময় তাহারা সঙ্গীত অভ্যাস করিবার যথেষ্ট সময় পায়। বড় হইলে তাহাদের নানারূপ সামাজিক সম্পর্ক ও কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত হইতে হয় এবং অভ্যাসের সময় কমিয়া যায়। তবে পিতামাতার পক্ষে তাহাদের সন্তানের জন্য সময় তালিকার বেশী বাঁধাবাঁধি করা উচিত নয় কেননা বৃদ্ধির সময় ছেলেমেয়েদের কিছু বাহিরে হুড়াহুড়ি করিয়া খেলা প্রয়োজন। তাহাছাড়া দলগত খেলার মধ্য দিয়া সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে শিখে। কিছু সময় নির্জনে পড়াশুনা করা এবং কখন কখন কিছু না করিয়া শুধু বসিয়া থাকিতেও দেওয়া উচিত।

মানসিক বিকাশ।

এই বয়সেও ভাষাতে আগ্রহ খুব প্রবল থাকে। শব্দজ্ঞান বাড়িতে থাকে। বাক্য রচনার প্রভূত উন্নতি হয় যেমন, ব্যাকরণগত শুদ্ধতা বাড়ে, অল্পের মধ্যে অর্থবোধক হয় এবং দ্রুততা বাড়ে। চতুর্থ শ্রেণীর বালকবালিকা সাধারণতঃ শব্দগুলি চিনিয়া পড়িতে পারে, পড়িবার সময় বইয়ের পাতার এক লাইন পরের লাইনে নির্ভুলভাবে চোখকে ঘুরাইয়া লইতে পারে, অর্থসমৃদ্ধ শব্দজ্ঞান জন্মায়, ছোট ছোট ভাব বা চিন্তা ধারণা করিতে পারে এবং যাহা পড়ে তাহা উপভোগ বা প্রয়োগ করিতে পারে। লেখাপড়া করিবার যে সমস্ত ক্ষমতা ইতিপূর্বে আয়ত্ত হইয়াছে এখন সেইগুলির পূর্ণতা সাধন করিবার সময় এবং অর্থপূর্ণ পাঠের আরও উচ্চস্তরে আরোহণ করিবার সময়। ঐচ্ছিক পাঠের সময়ও এই সময় সবচেয়ে বেশী হয়। ছেলেমেয়েরা নানারকম বই পড়িয়া তাহাদের

জগতের বাহিরের জগতের সন্ধান পায়। এইরূপ পাঠের দ্বারা তাহাদের আত্মানুভূতি ও সাংসারিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও জ্ঞান বাড়ে।

চিন্তা ও ভাব বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম ভাষা। সমগ্র মানসিক বিকাশের সহিত ভাষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কতকগুলি শব্দ ও বাক্য মুখস্থ করিয়া রাখা এবং প্রয়োজন হইলে তাহার ব্যবহার করাই ভাষাজ্ঞানের লক্ষণ নহে। ভাষার সাহায্যে যখন ছেলেমেয়েরা নিজেদের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি নিজেদের কাছে পরিষ্কার করিয়া লইতে পারে এবং অপরের কাছে প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করিতে পারে এবং অপরের অভিজ্ঞতার অংশীদার হইতে পারে তখনই সত্যকারের ভাষাজ্ঞান হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহার সাহায্যে অপরকে বুঝাইবার ক্ষমতা জন্মায় এবং অপরের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে বুঝিবার শক্তি না বাড়িলে সত্যকার শব্দজ্ঞানও বাড়ে না এবং মন যদি সচল, প্রাণময় এবং বুদ্ধিদীপ্ত না হয় তাহা হইলে ভাষা ব্যবহারে যে সূক্ষ্ম রুচিবোধ তাহা জন্মায় না। সেইজন্য বলা হয় ভাষা মানসিক বিকাশের প্রতিবিম্ব। ছেলেমেয়েদের ভাষা তাহাদের চিন্তাধারা ও সমগ্র ব্যক্তিসত্বার উপরে আলোকসম্পাত করে। তাহাদের ভাষা ব্যবহারের পশ্চাতে থাকে নানা উদ্দেশ্য। সামাজিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, নিজের অনুভূতি অপরের গোচরে আনিবার জন্য, ভাষার উপরে অধিকার স্থাপন করিবার জন্য অথবা তাহার বিদ্যাবত্তা ও আত্মমর্যাদা জাহির করিবার জন্য তাহারা ভাষা ব্যবহার করিতে পারে। বালক বা বালিকার কথ্য ভাষার বিষয়ের ব্যাপ্তি ও শুদ্ধতা দেখিয়া সে কিভাবে চিন্তা করে তাহা বোঝা যায়। তাহার স্বতঃস্ফূর্ত মন্তব্য এবং প্রশ্ন করিলে সে যাহা উত্তর দেয় তাহাদ্বারা জগৎ তাহার কাছে কিভাবে প্রতিভাত হয় তাহার একটি ধারণা করা যায়। বাক্যাংশের পরস্পর সম্বন্ধ ও গঠন এবং ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্য দেখিয়া তাহার সম্বন্ধ দেখিবার ক্ষমতা কতটা হইয়াছে বুঝা যায়।

প্রাক্ কৈশোরে বালকবালিকার শব্দজ্ঞানের আয়তন, স্পষ্টতা ও শুদ্ধতা বেশ বাড়া উচিত।

দশবৎসর বয়সেও যদি দেখা যায় বালক বা বালিকা অশুদ্ধ ও অনুপযোগী-

ভাবে কথা বলিবার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিতেছে না তবে বুঝিতে হইবে সে সত্যই অনগ্রসর। অশুদ্ধ ব্যাকরণ এবং অশুদ্ধ কথা বলা যদি পাকাপাকি-ভাবে অভ্যস্ত হইয়া যায় তাহা হইলে তাহা সংশোধন করা অতীব দুরূহ হইয়া পড়ে। যে সব বালক বালিকা শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বয়স্কদের সান্নিধ্যে থাকে তাহাদের ভাষার বিকাশ সুগম হয়।

প্রথম শ্রেণী হইতে শিশু যতই অগ্রসর হইতে থাকে ততই তাহার বাক্য-বিন্যাস জটিল হইতে জটিলতর হয় এবং রচনার দৈর্ঘ বাড়িতে থাকে। পরিপক্বতা, অভিজ্ঞতা এবং মানসিক বিকাশের সহিত তাল রাখিয়া ভাষার উৎকর্ষতা চলিতে থাকে।

এই সময় বালকবালিকারা গুপ্ত ও ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষার দ্বারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা কহিতেছে দেখা যায়। এই সময় এই আগ্রহকে বিদেশী ভাষা শিক্ষার আগ্রহে পরিণত করা যাইতে পারে।

অপভ্রংশ ভাষার ব্যবহারও এই সময় আরম্ভ হয়। বালক বা বালিকা নিজের সমবয়সীদের এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে শুনিয়া সেও ঐভাবে বলিতে শিখে। যে সব অপভ্রংশ ভাষার সাহায্যে মনের ভাব জোরাল এবং অর্থব্যঞ্জকভাবে প্রকাশ করা যায় সেগুলি উপযুক্ত সময়ে ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেওয়াই ভাল। এইগুলি আমাদের মাতৃভাষার সমৃদ্ধিসাধনই করে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ইহার ভুরি ভুরি নিদর্শন আমরা পাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'যুঝিয়া উঠ' কথাটির দ্বারা কোন সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া সংগ্রাম করার ভাবটি সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ পায়। এইরূপ "ঘোড়ায় জিন দিয়া আসা" (আসিয়া খুব ব্যস্ততার সহিত অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া যাওয়া); "লাই দেওয়া" (বেশী প্রশ্রয় দেওয়া); "আকাশ থেকে পড়া," (সব জানিয়া শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবার ভান করা); "ভিরকুটি বাহির করা", (বদমাইসি বা দুষ্টামির প্রতিবিধান করা); "ঝানু লোক", (খুব চালক চতুর অভিজ্ঞলোক); "তালপাতার সেপাই", (খুব রোগা লোক); "পেটের দায়", (উদরান্ন পূর্তির নিমিত্ত); ইত্যাদি অকেতাবী ভাষা স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণভাবে ভাবকে প্রকাশ করে।

তবে যে সব ভাষা কুৎসিত এবং অনুপযোগী সেইগুলি ছেলেমেয়েরা যাহাতে বলিতে না অভ্যস্ত হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

বানান।

ছেলেমেয়েরা যতই একশ্রেণী হইতে উপরের শ্রেণীতে উঠিতে থাকে ততই তাহাদের বানান সাধারণতঃ শুদ্ধ হইতে থাকে। পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে এই বিষয়ে সব চেয়ে বেশী উন্নতি দেখা যায়। সোজাসুজি বানান শিখাইতে গেলে বিশেষ ফল হয় না। পরিপক্বতা, উন্নত ধরণে পাঠাভ্যাস এবং বানান শুদ্ধির জন্য আন্তরিক প্রেরণা থাকিলে বানানে উন্নতি হইতে দেখা যায়। যাহারা শুদ্ধ বানানে সফল হয় তাহারা শব্দগুলিকে বিচক্ষণতার সহিত নিরীক্ষণ করে, তাহার শুদ্ধ বানানের অতীত অভিজ্ঞতাকে দেখিয়া ও বলিয়া ঝালাইয়া লয় এবং তাহার নিজের বানানের শুদ্ধতা বিচার করে। বানানের শুদ্ধতা অশুদ্ধতা সম্বন্ধে সে খুব সজাগ থাকে। তাহার শিখিবার জন্য আগ্রহ থাকে, একাগ্রতার সহিত পড়িতে পারে, যে শব্দ শিখিতে হইবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করে এবং ভাল লিখিতে পারে। যাহারা বানানে খারাপ তাহারা নিজেদের ঠিকমত চালাইতে পারে না, উদ্যোগী হইতে পারে না এবং গুছাইয়া চলিতে পারে না। বানান সম্বন্ধে তাহারা ঔদাসীন্য দেখায় এবং কোন যত্ন লয় না, শব্দগুলির সব সময় ভুল উচ্চারণ করে। হাতের লেখা ও পড়াতেও বানান ভুলকারীরা পিছাইয়া থাকে।

পড়া।

চতুর্থ শ্রেণী হইতে নিঃশব্দ পাঠ সশব্দ পাঠ অপেক্ষা দ্রুততর হইতে থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া সশব্দ পাঠ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত নয়। কোন বালক বা বালিকা বই বা প্রবন্ধ পড়িয়া অন্যদের শুনাইতে পারে এবং তাহাদের সহিত একত্রে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। তাহাছাড়া সশব্দে পড়িলে জানা যায় পড়া শুদ্ধভাবে হইতেছে কি না এবং পঠিত বিষয়ের সম্যক অর্থবোধ হইতেছে কি না।

কত তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়েরা নিঃশব্দে পড়িতে পারে তাহা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। পড়িবার বিষয়, মুদ্রণ, বিষয়ের প্রতি তাহাদের আগ্রহ, পড়িবার উদ্দেশ্য, বিষয়ের সহিত পূর্বপরিচয়—এইগুলির তারতম্য অনুযায়ী পড়িবার দ্রুততারও তারতম্য হয়। বিজ্ঞানের বই অপেক্ষা সোজা গল্পের বই তাড়াতাড়ি পড়া যায়; আবার অঙ্কের বই অপেক্ষা সাধারণ বিজ্ঞানের বই শীঘ্র পড়িয়া ফেলা যায়। দ্রুত পঠনই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়, ইহার অপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইতেছে বুঝিয়া পড়া।

ছেলেমেয়েরা কিরূপ বই পছন্দ করে? দেখা গিয়াছে যেসব বই সৌষ্ঠবযুক্ত ও সুদৃশ্য, অচেনা শব্দের আধিক্য যেগুলিতে নাই, আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু আছে, ভাষা সরল এবং রুচিসম্মত। এই বয়সে তাহারা সুন্দর পরিষ্কার হরফে লেখা, ছোট ছোট প্যারাগ্রাফযুক্ত এবং উপযুক্ত চিত্র সমন্বিত ছোট ছোট বই পছন্দ করে। নূতন এবং অপরিচিত শব্দগুলি যখন পরিচিত শব্দগুলির সহিত ধীরে ধীরে আসিতে থাকে তখন অপরিচিত শব্দের ভারবোধ আর থাকে না এবং স্বস্তির সহিত নূতন শব্দগুলির সহিত পরিচিত হওয়া যায়। বিস্ময়, ঘটনার চলমানতা, জীবজন্তু, কথাবার্তা, শৈশবোচিত হাসি-তামাসা এবং ষড়যন্ত্র—এইগুলি বালক বালিকাদের বিশেষ আকর্ষণীয় পুস্তকের বিষয়বস্তু। চতুর্থ হইতে অষ্টমশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষ করিয়া ছেলেরা নাটকীয় ঘটনা, অভিযান ও বীরত্বসুলভ বিষয়বস্তু বিশেষ পছন্দ করে। প্রাক্-কৈশোরের শেষের দিকে পরী, দৈত্যদানব ও ভূতপ্রেতের আখ্যায়িকার প্রতি বালক বালিকা বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে না।

ব্যঙ্গচিত্র সম্বলিত পুস্তক বা সাময়িক পত্রিকা পড়িতে এই সময় বালক বালিকারা খুব ভালবাসে। তবে তাহাদের হাতে যে ব্যঙ্গের জিনিষগুলি দেওয়া হইবে, দেখিতে হইবে সেগুলি তাহাদের উপযোগী কি না। যে ব্যঙ্গগুলি সত্যই কৌতুকজনক ও মজার এবং যেগুলির ভিতর কল্পনা করিবার ও নূতন কথা জানিবার সুযোগ থাকে বালক বালিকাদের পক্ষে সেইগুলি উপযোগী। এমন অনেক ব্যঙ্গ আছে যেগুলির ভিতরে নিষ্ঠুর, হিংসা, অপরাধ, বিভীষিকা এবং কামকে বেশী করিয়া ফুটাইয়া তোলা হয়। এইরূপ ব্যঙ্গ

যাহাতে বালক বালিকার হাতে না আসে সেদিকে সতর্ক থাকা উচিত।

কোন কোন বালিকাদের মনের রুদ্ধ আক্রোশ ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া তৃপ্ত হয়। সাত হইতে নয় বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা অদ্ভুত এবং ম্যাজিকের মত চমকপ্রদ ব্যঙ্গ পছন্দ করে। রাজপুত্র, রাজকন্যা, পক্ষীরাজ ঘোড়া ইত্যাদি গল্পের মত এইরূপ ব্যঙ্গ ছেলেমেয়েদের মনস্থষ্ট জগতে কিছুক্ষণের জন্য থাকিতে দেয়। সভ্যতার একঘেয়েমি ও বাধানিষেধের চাপে অনেক আকাঙ্ক্ষাই অতৃপ্ত থাকিয়া যায়, ব্যঙ্গের চরিত্রগুলির সহিত একাত্মবোধ করিয়া ছেলেমেয়েরা কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে পারে। তবে ব্যঙ্গ বা ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়িয়া তাহাদের আচরণ যাহাতে কলুষিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

তামাসা।

দশ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের দেখা যায় আবোল-তাবোল ছড়া, ব্যঙ্গ, হাস্যকৌতুক এইগুলিতেও তাহারা বেশ মজা পায়। যে পরিস্থিতিগুলি বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা জানে সেইগুলি কৌতুকপ্রদ হইয়া উঠিলে তাহারা প্রাণভরে হাসে। সার্কাসে ক্লাউন দেখিয়া, মুখোসধারী লোক দেখিয়া এবং জন্তু জানোয়ারের মানুষের মত কেরামতী দেখিয়া তাহারা হাসে। এইগুলির মধ্যে যে অসামঞ্জস্য, অপরের অপদস্থ হওয়া এবং অদ্ভুত হইবার বিশেষত্ব আছে এইগুলিই হাস্যরসের উদ্রেক করে। নূতনত্বও তাহাদের কাছে মজার জিনিষ। যে বিষয়গুলি তাহাদের দুঃচিন্তাগ্রস্ত করে সেইগুলি লইয়া হাসি-তামাসা করিলে উৎকণ্ঠার লাঘব হয়। কিন্তু তাহারা নিজেদের লইয়া হাসিঠাট্টা করিতে চায় না এবং নিজেরা ঠাট্টার বিষয় হইলে অপদস্থ বোধ করে। হাসিতামাসার বোধের সহিত বৌদ্ধিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশের যোগ আছে। হাসিতামাসার রকম দেখলেই বুঝিতে পারা যায় বালক বালিকার মনের ও প্রক্ষোভের বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা কিরূপ হইয়াছে।

যে শিক্ষক এবং পিতামাতা ছেলেমেয়েদের হাসিতামাসার মধ্যে প্রবেশ

করিতে পারিয়াছেন বুঝিতে হইবে তাঁহারা তাহাদের সহিত সত্যকারের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন এবং তাহাদর মনের অবস্থা বুঝিয়াছেন।

অঙ্ক।

চতুর্থ শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা মূল গাণিতিক প্রক্রিয়া যেমন, যোগ-বিয়োগ-গুণ ভাগ, পাটিগণিতের ভাষা এবং সংখ্যার সাহায্যে চিন্তা করিতে পারে।

ষষ্ঠ শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা মূল গাণিতিক প্রক্রিয়াগুলি, সংখ্যার সাহায্যে বিমূর্ত চিন্তা, গাণিতিক যুক্তি, গাণিতিক পার্থক্য, সাম্য ও আয়তনের সম্বন্ধ অনুধাবন করিতে পারে। গাণিতিক স্মৃতি এবং অনুমান করিবার শক্তি জন্মে। তাহাছাড়া অঙ্কের বইয়ের ভাষা বুঝিতে এবং গ্রাফ, চার্ট এবং টেব্‌ল পড়িতে পারে। ভাল ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের ভুল সংশোধন করিবার কালে অন্তদৃষ্টি লাভ করে এবং ভুল সংশোধনে বিশেষ উদ্যোগী হয় এবং যুক্তির সাহায্যে ভুল বাহির করিবার চেষ্টা করে।

বিজ্ঞান এবং সমাজ বিদ্যা।

নয় হইতে বার বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের তথ্য সংগ্রহের দিকে প্রবল ঝোঁক থাকে। তাহারা গাছপালা, পশুপক্ষী, গ্রহনক্ষত্র, চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক শক্তি এবং পৃথিবী সম্বন্ধে জানিতে খুব উৎসাহ বোধ করে। তাহাদের ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বৃদ্ধিই একমাত্র সার্থকতা না হয়। এই তথ্যজ্ঞান তাহারা যাহাতে সমস্যা সমাধানে লাগাইতে পারে, পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখিতে পায় এবং সত্যকার জীবনে প্রয়োগ কতিে পারে সে বিষয়ে তাহাদের নিযুক্ত ও সাহায্য করিতে হইবে। এই সব ক্ষমতা অর্জনই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত—তথ্যজ্ঞান হইবে এইগুলির উপায় ও উপকরণ। এইসব বিষয়ে বালক বালিকাদিগের যাহাতে স্থায়ী অনুরাগ জন্মায় তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বালক বালিকাদিগের নিজেদের গ্রাম বা সহরের সমাজ হইতে সমাজ বিদ্যার শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। সেইরূপ, শ্রেণীর মানবিক সম্বন্ধ হইতে

আরম্ভ করিয়া বৃহত্তর পৃথিবীর মানবিক সম্বন্ধে যাওয়া উচিত। ইহাতে তাহারা পাঠ্যবিষয়কে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে। সমাজবিদ্যা চর্চার ফলে বালক বা বালিকা ক্রমে ক্রমে বর্তমান জগতে তাহার নিজের কি ভূমিকা সে বিষয়ে উত্তরোত্তর অবহিত হইতে থাকে।

বর্তমানে নিম্ন শ্রেণীগুলিতে বিজ্ঞান পড়াইতে বেশী সময় এবং পরীক্ষা ও আবিষ্কারের কাজে বেশী সুযোগ দেওয়া হইতেছে। বিদ্যালয়ের কাজের মধ্য দিয়া গণতন্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। নিজের সমাজের সুযোগ সুবিধাগুলির সদ্ব্যবহার এবং তাহার উন্নতি সাধন সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং অন্য বিষয়ের সহিত সাঙ্গীকরণ করা হইতেছে। এইরূপ কার্যক্রম বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে থাকায় বৌদ্ধিক বিকাশ সমগ্র ব্যক্তি-সত্বার বিকাশের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে চলে।

বুদ্ধি।

নয় হইতে বার বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা তাহাদের সমস্যা সমাধানের প্রণালী, অসামঞ্জস্য বা ভুল বাহির করিবার এবং কোন পরিস্থির মধ্যে সত্যকার লক্ষণীয় বিষয়গুলি কি তাহা দেখিবার ক্ষমতার দ্বারা তাহাদের বুদ্ধির প্রমাণ দেয়। প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তর দেওয়া, শব্দের মানে বুঝিতে পারা এবং সততা, দয়া এইরকম বিমূর্ত শব্দের ব্যাখ্যা করা, ভাষাগত সম্বন্ধ এবং গাণিতিক সম্বন্ধ আবিষ্কার করা, বিশেষ বিশেষ জিনিষ হইতে সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা এবং ভাষার ব্যবহার করার মধ্য দিয়াও তাহাদের মানসিক সামর্থ্য প্রকাশিত হয়। তাহা ছাড়া তাহারা প্রত্যহ নানারকম বস্তু ও ব্যক্তির সংস্রবে আসে, সজাগ মন তাহাদের সম্বন্ধে অনেক খোঁজখবর রাখে, সেইজন্য সাধারণ জ্ঞানও বুদ্ধির একটি নিরিখ। যাহার এই গুণগুলি যত বেশী থাকিবে সে তত বেশী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। এইসব আচরণের ভিতর দিয়াই বুদ্ধি প্রকাশিত হয়।

নয় হইতে বার বৎসর বয়সের মধ্যে বিমূর্ত শব্দের ব্যাখ্যা করিবার শক্তি জন্মে। দশ বৎসর বয়সেও তাহারা "প্রতিশোধ", "ন্যায়পরায়নতা", "করুণা",

"দয়া" বা "মমতা"-র মানে কি সন্তোষজনকভাবে বলিতে পারে না কিন্তু বার বৎসর বয়সে তাহারা ইহাদের মানে বুঝাইয়া দিতে পারে।

এই বয়সে তাহারা সম্বন্ধ বুঝিতে পারে। ব্যাঙ, ঘোড়া এবং কাকাতুয়া সকলেই যে প্রাণী এবং নড়িতে চড়িতে পারে সে সম্বন্ধে তাহারা বুঝিতে পারে। আরও কম বয়সী ছেলেমেয়েরা পদার্থদের এক শ্রেণীতে ফেলিবার সময় ভাসা ভাসা, স্থূল, বিশেষ ও অস্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়া বিচার করে কিন্তু এগার বার বৎসর বয়সে আরও মৌলিক এবং কম আপাতদৃষ্ট সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি তাহারা অনুধাবন করিতে পারে।

ধাঁধা এবং ধোঁকা জাতীয় জিনিষে এই সময় বালক বালিকাদের অগ্রহ চরমে উঠে। যেহেতু ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই শব্দের সুকৌশল ব্যাখ্যা এবং যুক্তির প্রয়োজন হয় সেহেতু এইগুলি চর্চা করিতে তাহাদের উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে।

বৌদ্ধিক আচরণের মধ্যে স্মৃতি একটি প্রধান উপাদান। যান্ত্রিকভাবে স্মরণ করাই স্মৃতিশক্তি নয়, নূতন জিনিষকে পূর্বের অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া লওয়া স্মৃতির কাজ। যে জিনিষ একেবারে অভিনব তাহা মনে রাখা ছেলে-মেয়েদের পক্ষে খুবই দুরূহ। যেমন, যাহারা পাহাড় পর্বত, নদ নদী বা সমুদ্র দেখে নাই তাহাদের কাছে ঐ সম্বন্ধের কথা মুখস্থ করিতে বলিলে হয়ত না জানিয়া মুখস্থ করিবে কিন্তু মুখস্থ করিতেও সময় লাগিবে ও কষ্ট হইবে এবং তাড়াতাড়ি ভুলিয়াও যাইবে। এই কারণে যদি তাহাদিগকে ঐগুলি চাক্ষুষ দেখান সম্ভব না হয় তাহা হইলে ছবি, ফিল্ম ইত্যাদি শিক্ষা সহায়ক দ্বারা প্রথমে তাহাদের সম্যক ধারণা দিতে হইবে, তাহা হইলে সে সম্বন্ধের কথা তাহারা বুঝিবে এবং স্মরণ রাখিতে পারিবে। শুধু মুখস্থ বিদ্যার দ্বারা প্রকৃত শিক্ষা হয় না। অর্জিত জ্ঞানকে মনের মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে যুক্তির দ্বারা সাজাইয়া রাখাই সত্যকারের বুদ্ধিযুক্ত স্মৃতির কাজ।

বুদ্ধির বৃদ্ধি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে একটি বিশেষ ধারা ধরিয়া চলে। বৃদ্ধির কোন কোন সময় বিশেষ করিয়া প্রাক কৈশোরের দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি আরম্ভ হয় সেই সময় দেখা যায় দুই তিন বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধিক

বিকাশ স্থগিত থাকে। ইহার পর অবার যেন লাফ দিয়া বুদ্ধির বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে এবং বালক বা বালিকা তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধি যখন স্থগিত থাকে তখন তাঁহাকে চাপ দিলে সমস্যা আরও বাড়িয়া যায়।

শিক্ষা মানসিক বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বংশগতির সীমারেখার মধ্যে শিক্ষার দ্বারা বুদ্ধির কাজকে বাড়াইয়া দেওয়া যায়। বিশেষতঃ বার বৎসর বয়সের পর হইতে বালক বালিকাদিগের মানসিক বিকাশে শিক্ষা অতি প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে। শিক্ষক যখন কোন বালক বা বালিকার মানসিক ক্ষমতার যাচাই করিবেন তখন তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে সে কিরূপ পরিবেশ হইতে আসিয়াছে এবং তাহার অতীত অভিজ্ঞতা কিরূপ। কেননা যেসব বাড়ীতে লেখাপড়ার রেওয়াজ নাই সে সব বাড়ী হইতে যে ছেলেমেয়েরা আসে তাহাদের ভাষার উপর দখল কম থাকে এবং মনে হইতে পারে যে তাহাদের অন্য সৌভাগ্যশালী সঙ্গীদের হইতে তাহারা কম বুদ্ধিমান কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে কিছুকাল শিক্ষা পাইলে তাহাদের বুদ্ধির পার্থক্য কমিয়া আসে। সেইজন্য পরিবেশকে না জানিয়া বুদ্ধির বিচার করা ভ্রমসঙ্কুল হইতে পারে। অবশ্য ভাষার উপর অধিকার বৌদ্ধিক শক্তির নির্ভরযোগ্য পরিচয় দেয়। ভাষাবোধ এবং অনর্গলভাবে শব্দের ব্যবহার একটি বংশগতিজাত মনের মৌলিক ক্ষমতা।

সামাজিক বিকাশ।

পরিবারের সহিত সম্বন্ধ।

এই সময় যদিও বালক বালিকারা তাহাদের সঙ্গীদের সাহচর্যই বেশীক্ষণ পাইতে চায় তবুও বাপমায়ের প্রতিও তাহাদের বেশ টান থাকে। পাঁচ হইতে নয় বৎসর বয়সে বাবার চেয়ে মায়ের দিকেই তাহারা বেশী অনুরক্ত হয়। প্রাক্ কৈশোরে বাবামাকে সমানভাবেই দেখে এবং জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা দুজনকেই ভালবাসে বলে।

বাড়ীর শাসন ও নিয়ন্ত্রণকে সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা প্রসন্নচিত্তে মানিয়া লয় এবং বাড়ীর অবস্থা পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সন্তুষ্ট থাকিতে দেখা যায়। অবশ্য বালকরা বালিকাদের অপেক্ষা বাড়ীর অবস্থা ও পিতামাতার সহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুটা বেশী বিরূপ মনোভাব দেখায় এবং কম সুখী মনে হয়। সবই নির্ভর করে পরিবারে ছেলেমেয়েদের সহিত স্নেহ ভালবাসা বা অনাদর অবহেলার সম্বন্ধের উপর।

সঙ্গী সাথীদের সহিত সম্বন্ধ।

বালকেরা বালকদের সহিত এবং বালিকারা বালিকাদের সহিত সখ্য স্থাপন করিতে চায়। কৈশোরের চার পাঁচ বৎসর আগে এই প্রবৃত্তি খুব প্রবল হয়। প্রথম শ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণীর দিকে যতই অগ্রসর হইতে থাকে ততই দেখা যায় ছেলেরা ছেলেদের সহিত এবং মেয়েরা মেয়েদের সহিত বেশী করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করে, বিপরীত লিঙ্গের সহিত মেলামেশা করিতে চায় না। আট হইতে দশবৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের একত্রে বেশী খেলিতে দেখা যায় না এবং তাহাদের আগ্রহের বিষয়ও ভিন্ন হয়। শুধু যে ছেলেরা ও মেয়েরা পরস্পর মেলামেশা করেনা তাহা নহে এমন কি সময় সময় পরস্পরকে জ্বালাতন করে এবং হিংসার ভাব দেখায়। উচ্চ শ্রেণীতে অবশ্য বালক ও বালিকাদের পরস্পরের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার হইতে দেখা যায়।

দলের সহিত সম্বন্ধ।

নয় দশ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা দলভুক্ত হইয়া থাকিতে চায়। প্রাক্ কৈশোরে সঙ্ঘের মনোভাব, শ্রেণীর মনোভাব এবং দলের প্রতি আনুগত্যবোধ জন্মায়। দলের মধ্যে গিয়া বালকেরা একটানা রুটিনমাফিক জীবন হইতে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। তবে দলের প্রভাব অনেক সময় অনিষ্টকরও হয়। সেইজন্য বালকদের ক্লাব, ভ্রমণের পার্টি, ক্যাম্প, স্কাউটদল—ইহাদের মধ্যে তাহাদের রাখিলে তাহাদের অভিযান স্পৃহাও তৃপ্তি হয় এবং গঠনাত্মক কাজকর্মেও তাহারা অভ্যস্ত হয়।

এখন ছেলেমেয়েরা তাহাদের কাজকর্মে, খেলাধূলায় বড়দের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না। সামাজিক আদবকায়দার তাহারা বেশী ধার ধারে না এবং সামাজিক সৌজন্য প্রকাশেরও তাহারা কোন হেতু খুঁজিয়া পায় না। ভদ্র সমাজে বড়রা ছোটদের কায়দাদুরস্ত ও সৌজন্যশীল না হওয়ার জন্য বহু বকাঝকা করেন। এখন ছেলেমেয়েদের পরস্পরের সহিত সামাজিক সম্পর্ক মিলাইয়া লইবার সময়, ইহাতে বড়দের তদারক তাহারা পছন্দ করে না।

ছেলেমেয়েরা নিজেদের আইনকানুন নিজেরা তৈয়ারী করিতে চায়। তাহাদের দলগত কাজকর্মে গুরুত্ব দেওয়া হউক ইহা তাহারা চায়। তাহারা দলের সদস্যদের মধ্যে কিরূপ সামাজিক সম্পর্ক হইবে তাহা তাহারা নিজেরা ঠিক করিতে চায় এবং তাহাদের নিজেদের গুণের জোরেই দলের স্বীকৃতি পাইতে চায়। কোন মঙ্গলাকাঙ্খী শিক্ষক বা পিতামাতা কাহাকেও তাহার দলের মধ্যে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে পারেন না, নিজের চেষ্টায় তাহা অর্জন করিতে হয়। এই প্রবৃত্তির সুযোগ লইয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী পরিষদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের কাজকর্মের দায়িত্ব ছেলেমেয়েদের উপর দেওয়া হয়। তাহারা স্বাধীনভাবে তাহাদের মনের মত করিয়া কাজকর্ম, আমোদ প্রমোদ, উৎসব অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করে এবং তাহাদের নিজেদের সামাজিক সম্বন্ধ যেমন, কে কোন্ বিষয়ের নেতা হইবে, কে কাহার সহযোগিতা করিবে —এইসব ঠিক করে। শ্রেণীর লেখাপড়ার কাজও অনেক সময় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া করা হয় এবং আগ্রহ ও সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করিয়া দলগঠন করা হয়।

অপর ব্যক্তি সম্বন্ধে উপলব্ধি।

বালক বালিকাদের অপর ব্যক্তি সম্বন্ধে উপলব্ধি কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়া যায়। প্রথম পর্যায়ে তাহারা অন্য লোকদের ভাল বা মন্দ, দয়ালু বা নিষ্ঠুর, এই প্রকার দুই রকম ভাগে ভাগ করে। কোন ব্যক্তি প্রধান বৈশিষ্ট্য দিয়াই তাহাকে বিচার করে—এই পর্যায়ে ঈসপ্‌স্‌ এর গল্পের মত তাহারা গল্প ভালবাসে কেননা এইসব গল্পে প্রত্যেক চরিত্রে তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্যটিকেই

ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে যেমন, শৃগাল সারসের গল্পে শৃগালের ধূর্ততা এবং সারসের প্রতিশোধস্পৃহা চিত্রিত হইয়াছে। পরের পর্যায়ে তাহারা বুঝিতে পারে মানুষকে কেবল একটি বৈশিষ্ট্যদ্বারা বোঝা যায় না, কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের একত্র সমাবেশে মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। ইতিহাসে যে বড় বড় চরিত্রগুলি দেখা যায় তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বৈশিষ্ট্য সমাবেশ ক্রিয়াশীল ছিল। যেমন, আকবরের মধ্যে একদিকে যেমন যুদ্ধস্পৃহা ও নিষ্ঠুরতা ছিল অন্যদিকে প্রজাদের প্রতি দয়া ও মঙ্গলাকাঙ্খা ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রে বাৎসল্যের সহিত ঈর্ষা পাশাপাশি বাস করিত। ছেলেমেয়েরা পরে বুঝিতে পারে মহান ব্যক্তিদের মধ্যেও দোষত্রুটি বর্তমান থাকে। যখন তাহারা বুঝিতে পারে কোন মানুষই নিছক ভাল বা নিছক মন্দ নয় তখন বুঝিতে হইবে মানুষের প্রকৃতি বুঝিবার পথে তাহার অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। শেষ পর্যায়ে সমগ্র ব্যক্তিসত্বার একটি পূর্ণ চিত্র তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে। ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবগুলি এবং পরিবেশের সহিত প্রবৃত্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার একটি সংহত রূপ তাহারা প্রত্যক্ষ করে।

সামাজিক স্বীকৃতি।

দলের মধ্যে সাদরে ও সসম্মানে গৃহীত হইলে বালক বা বালিকার মধ্যে একটি সুস্থ আত্মবোধ জন্মে এবং মনের মধ্যে নিশ্চিন্ততার ও বিশ্বাসের ভাব জন্মাইলে সে অন্যদের সহজে ও প্রীতিভরে আপনার করিয়া লইতে পারে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলের অন্যদের সহিত কাজকর্ম করিতে পারে।

উচ্চ মেধা ও পড়াশুনায় কৃতিত্বের সহিত দলের স্বীকৃতি ও সমাদরের বিশেষ কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা দলের স্বীকৃতি সবচেয়ে বেশী পায়। ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ে হইলেই যে দলের স্বীকৃতি বেশী পাইবে সেইরূপ কোন সম্ভাবনা থাকে না। তবে খুব নিম্নস্তর হইতে আসিলে ছেলেমেয়েরা দলের মধ্যে সহজে গৃহীত হয় না। আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এবং সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ঘরের বালকবালিকারা বয়স্কদের আদর্শ ও নিয়মকানুন মানিয়া চলিবার উপর যথেষ্ট মূল্য দেয় কিন্তু

নিম্ন অবস্থাপন্ন ঘরের বালকবালিকা আত্মজাহির এবং আক্রমণাত্মক কাজকর্মের উপরই গুরুত্ব দেয় বেশী। উচ্চঘরের ছেলেমেয়েরা সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণও বেশী করে।

প্রাক্-কৈশোরের বালকবালিকারা তাহাদের বন্ধুদের কি কি গুণের জন্য পছন্দ করে জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের ব্যক্তিগত গুণাগুণের কথাই বেশী বলে। যাহারা বেশ প্রফুল্ল, মমত্বপূর্ণ, সহযোগী, দাক্ষিণ্যযুক্ত, সৎ, ঠাণ্ডা মেজাজযুক্ত, সৌজন্যপূর্ণ, অনুগত এবং প্রীতিময় তাহাদের সহিতই বালকবালিকারা সখ্যতা স্থাপন করিতে চায়। আট হইতে এগার বৎসর বয়সের ছেলেরা সাহস ও আনুগত্যের উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেয়। যাহাদের সহিত বনিবনা হয় না, যাহারা দাম্ভিক বা প্রভুত্বকামী, দলের প্রতি আনুগত্যহীন এবং ফন্দীফিকির-বাজ, জ্বালাতনকারী ও ঝগড়াটে, অসৎ এবং অবিশ্বাসী, অসহযোগী, গোলমাল সৃষ্টিকারী এবং বোকা তাহাদের সহিত ছেলেমেয়েরা বন্ধুত্ব ছিন্ন করিয়া দেয়। তাহারা যত বড় হইতে থাকে তত বন্ধুদের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান ও পরিচ্ছন্নতা দেখিতে চায়।

আগ্রহের সমতাও বন্ধুদের একত্র করে। ছেলেমেয়েরা তাহাদের সাথীদের মধ্যে যাহাদের সমাদরের চক্ষে দেখে তাহাদের মধ্যে সব বিষয়েই কিছু শ্রেষ্ঠতা থাকে। সাধারণ স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তি, মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার ক্ষমতা, ব্যক্তিত্বের সাম্য, উদ্যোগ, সাহস, বিশ্বস্ততা, মানিয়া লইবার প্রবৃত্তি, প্রীতি, অন্যদের সম্বন্ধে বিবেচনা এবং মৌলিকতা যাহাদের আছে বালকবালিকারা তাহাদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে এবং তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে আগ্রহী হয়। যে সব ছেলেমেয়েরা নম্র স্বভাব, বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন এবং সকলকে মুগ্ধ করিতে পারে তাহারা সাথীদের আকর্ষণের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়, যদিও নেতা হিসাবে তাহাদের নির্বাচন করা হয় না।

সামাজিক অভিযোজনে দুশ্চিন্তা বা উৎকণ্ঠার প্রভাব আছে দেখা যায়। দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছেলেমেয়েরা তেমন জনপ্রিয় হইতে পারে না। যাহারা তাহাদের সাথীদের দ্বারা সমাদৃত হয় এবং তাহাদের প্রীতি ও বন্ধুত্ব অর্জন করে তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকে। অন্যপক্ষে যাহাদের সাথীরা পছন্দ করে না

এবং যাহারা সাথীদের কাছে অনাদৃত ও অবাঞ্ছিত হইয়া থাকে তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্যও ভাল থাকে না।

কোন বালক বা বালিকা অনেকটা তাহার মত বালক বা বালিকাকে বন্ধু হিসাবে পাইতে চায়। তাহাছাড়া তাহার নিজের যে আদর্শ আত্মস্বরূপ থাকে তাহার সহিত যাহাদের মিল দেখে তাহাদের বন্ধুত্বে বরণ করিতে চায়। বন্ধুকে ভালবাসার মধ্যে বন্ধুর মতন হইবারও একটি কামনা থাকে।

সামাজিক বিকাশের অনুকূল অবস্থা।

অনুকূল সামাজিক মনোভাব এবং সামাজিক অনুভূতি জন্মাইবার জন্য নিম্নরূপ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

শ্রেণীর আবহাওয়া যেন নিশ্চিন্ততা এবং বিশ্বাসের ভাবে পূর্ণ থাকে।

বালকবালিকাদের সুবিবেচনার মনোভাবকে সমাদর করিতে হইবে।

শান্ত স্বভাবের ছেলে বা মেয়ে অল্প সংখ্যক সঙ্গীসাথীদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে। তাহার এই প্রবৃত্তিকে মানিয়া লওয়া ভাল।

দলের মধ্যে কাহার কি স্থান হইবে এই বিষয়টি ছেলেমেয়েদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। বড়দের হস্তক্ষেপ না করাই উচিত।

দলের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বা কল্যাণে ছেলেমেয়েরা যত অবদান করে তত তাহাদের আত্মগরিমা বাড়ে। সামাজিক কল্পনাশক্তির দ্বারা তাহারা তাহাদের অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারে এবং অন্যদের সুখদুঃখের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। দলের কাছে উপেক্ষিত বা দলে মিশিতে না দিলে ইহার বিপরীত ফল ফলে।

প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত Sociometry পদ্ধতি দ্বারা শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণের কিরূপ সামাজিক সম্বন্ধ বিরাজ করিতেছে তাহা মাঝে মাঝে শিক্ষকের জানিয়া লওয়া উচিত। তাহাদের মধ্যে প্রীতি, উপেক্ষা ও অনাদরের অনুভূতিগুলি কিভাবে উৎপন্ন হয় এবং এই অনুভূতিগুলি তাহাদের আচরণ ও শিক্ষার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহাও তাঁহাকে জানিতে হইবে। কি কি গুণাগুণের জন্য বুদ্ধি ও গৃহের সামাজিক ও আর্থিক অব

এক হইলেও দুইজন বালক বা বালিকার মধ্যে একজনের সঙ্গ শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা যাজ্ঞা করে এবং অপরকে অপছন্দ করে তাহাও শিক্ষকের জানিবার বিষয়।

উদার ও বন্ধুত্বপূর্ণ গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশে বালকবালিকারা যদি সামাজিকভাবে 'মানুষ' হইতে পারে তাহা হইলে বড় হইয়া তাহারা যখন প্রতিযোগিতাপূর্ণ জগতে প্রবেশ করে তখন তাহারা যে আত্মসম্মান ও আত্ম-বিশ্বাস অর্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের নূতন কর্তব্য এবং বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে সাহায্য করে।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশ।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বোধ কতকগুলি উপদেশ দিলে হয় না। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যকে জীবনে ফলাইয়া তুলিতে পারিলেই বালক-বালিকারা উহার সত্যতা বুঝিতে পারে। সহযোগিতা, দায়িত্বে অংশ গ্রহণ, সাহস, দয়া ন্যায়পরায়ণতা, অন্যদের সুখদুঃখ বুঝা, সৌন্দর্য উপলব্ধি করা এবং সৃজনাত্মক চিন্তা—এই সব কাজকর্ম চিন্তাভাবনার দ্বারা তাহারা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যের যথার্থতা বুঝিতে পারে। এইরূপ কাজ ও চিন্তা মানুষের প্রতি গভীর সম্মান বা শ্রদ্ধা হইতে উপজাত হয়। সমাজ মানুষেরই কল্যাণ সর্বোপরি চায়, জিনিষপত্র যন্ত্রপাতির নহে। ভালবাসার পথেই মানুষের উন্নতি, বলপ্রয়োগের দ্বারা নহে। ধর্ম ও নীতির ইহাই মূল কথা। এইগুলি কথার কথা না রাখিয়া ছেলেমেয়েদের দৈনিক আচরণের মধ্যে তাহা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। পিতামাতা ও শিক্ষকের কর্তব্য ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে ভাবপূর্ণ কথা না বলিয়া তাহা কিভাবে করিতে হয় তাহা বালকবালিকাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া, যেমন, "টিনিকে (পোষা কুকুর) মারিও না, মারিলে সে তোমারই মত ব্যথা পায়।" বড়রা যে কথা বলে বালকবালিকাদের মনে তাহা লাগিয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে তাহা তাহাদের নিজেদেরই কথা বা মূল্যবোধ হইয়া দাঁড়ায়।

ষষ্ঠ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের ন্যায়-অন্যায় বোধ প্রবল হইতে দেখা যায়। তাহারা বয়স্কদের অন্যায় অবিচার করিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা বলিয়া দেয়।

নৈতিক অসামঞ্জস্য ও ন্যায়-অন্যায় বিষয়ে তাহারা খুব সংবেদনশীল থাকে। ন্যায়-অন্যায় বিচার অবিচারের বোধ ছেলেমেয়েদের প্রবল হওয়াই এইসময় কাম্য।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৈতিক বিচারশক্তির অনেক কমবেশী দেখা যায়। বৌদ্ধিক বিকাশ, অভিজ্ঞতা, সমাজ পরিবেশ এবং এই সকল অবস্থা হইতে উদ্ভূত অভ্যাস এবং মনোভাবের বিভিন্নতা হইতে বিচারশক্তির পার্থক্য উৎপন্ন হয়।

এই সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়িতে থাকে। এতদিন পর্যন্ত তাহাদের আচরণ বাহিরের সামাজিক বাধানিষেধ ও বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল, এখন তাহারা এইগুলিকে অন্তঃক্ষেপ করিতে শিখে অর্থাৎ এইগুলি এখন তাহার ব্যক্তিসত্বারই অংশ বিশেষ হইয়া যায়। বাহিরের সামাজিক বিধি ও বাধানিষেধ এখন আর বাহিরের বিষয় না হইয়া বালক বালিকার নিজস্ব প্রকৃতি হইয়া যায়, কাজে কাজেই সমাজানুমোদিত ব্যবহার এখন আর বাহিরের শাসনে করিতে হয় না, নিজের স্বাভাবিক প্রকৃতি বা স্বভাব হিসাবেই সে ঐরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয় সেইজন্য নিজের আচরণের নিয়ন্ত্রণ নিজের অন্তরের মধ্যেই নিহিত থাকে। চেতনমনে ইহাই বিবেকরূপে প্রতিভাত হয়।

তবে বাহিরের সামাজিক শাসনের অন্তঃক্ষেপের ফলে বালক বা বালিকার মনে স্বাভাবিক অপরাধবোধ এবং উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। অন্যায় বা অসামাজিক কাজ বা চিন্তা করিয়া ফেলিলে সে নিজেই নিজের সমালোচনা করে এবং নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে। এখন আর অন্য লোক তাহার কাজকে অনুমোদন করিল বা করিল না ইহার দরকার হয় না, সে নিজেই নিজের কাজের বিচার করে। অসামাজিক আবেগ ও প্রবৃত্তিগুলি তাহার স্বভাব হইতে চলিয়া যায় না, সেইগুলি সমাজানুমোদিত নূতন পথে লইয়া যাওয়া হয় অথবা সেইগুলি নির্জ্ঞানে অবদমিত হয়। যাহা হউক, যতই সে বড় হইতে থাকে আপাতদৃষ্টিতে ততই সে সামাজিক হইয়া উঠে। সে আত্মসর্বস্বতা হইতে পরার্থপরতার দিকে ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকে এবং অন্যের সুখদুঃখ অনুভব করিবার শক্তি অর্জন করিতে থাকে।

এইকথা ঠিক যে ছেলেমেয়েরা এখনও তাহাদের আচরণের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নিজেরা লইতে পারে না। তাহাদের সহজাত স্বভাবের তাড়না এবং তাহাদের ভাল বা মন্দ সংস্কৃতির প্রভাব তাহাদের আচরণে পড়িবে। কিন্তু আচরণের ব্যাখ্যার দ্বারা আচরণের সামাজিক ফলাফলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। সেইজন্য বালক বালিকাদের ভবিষ্যতে তাহাদের আচরণের কি ফল হইবে তাহার বিচার করিতে শিখিতে হইবে। বাল্য ও প্রাক্ কৈশোরে তাহারা এই বিচারশক্তি অর্জন করিতে সমর্থ হয়।

সামাজিক দায়িত্বসম্পন্ন বালক বা বালিকাকে কোন কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায়। তাহারা মূল্যবোধ ও অপরের প্রতি মনোভাব বৃহত্তর সমাজের আশানুরূপ হয়। কেবল গৃহের নানারকম কাজকর্মের মধ্য দিয়া এইরূপ দায়িত্ববোধ জন্মায় না ; জন্মায় পিতামাতার সহিত বালক বা বলিকার ব্যক্তিগত স্নেহ ভালবাসার সম্পর্কের মধ্য দিয়া। গৃহে ও বিদ্যালয়ে এইরূপ ব্যক্তিগত সম্বন্ধের মাধ্যমেই জীবনের প্রতি তাহার মনোভাব গড়িয়া উঠে। সে বুঝিতে শিখে যে জীবনের পথ সব সময় সরল ও সোজা হয় না, জীবন বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে সে বিফলতা সহ্য করিতে ও বাধাবিঘ্নের প্রতিকূলে অধ্যবসায়ী হইতে শিখে। অভিপ্রেত চরিত্র গঠনের ভিত্তি এইভাবে স্থাপিত হয়।

প্রক্ষোভিক বিকাশ।

শৈশবোচিত ভয় এখন চলিয়া যাওয়া উচিত এবং তৎপরিবর্তে সতর্কতা বাড়া উচিত। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা অনেক অসমসাহসীক কাজ করে তবে অধিকতর সুকৌশলী হওয়ায় সাজ্যাতিক আঘাত হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া চলিতে পারে। তাহা সত্বেও এই বয়সে নব নব অভিযানের স্পৃহা ও খানিকটা বেপরোয়া মনোভাবের ফলে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়।

গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে জন্তুজানোয়ারের ভয় দেখা যায়। বয়স বাড়িবার সাথে সাথে এই ভয় কমিতে থাকে। তাহারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও

অবস্থা যেমন, অগ্নিকাণ্ড, বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টি, অন্ধকার—এইগুলিতেও ভীত হয়। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশী ভীত হয়।

শৈশবে ছেলেমেয়েরা তাহাদের প্রার্থিত বস্তু সহজে না পাইলেই রাগিয়া উঠে কিন্তু বড় হইয়া নিজেদের বাঞ্ছিত জিনিষ পাইবার অন্য সকল উপায় ও কৌশল শিখে এবং বিফলতা ও বিঘ্নে সমাজানুমোদিত পথে কিভাবে চলিতে হয় তাহা শিখে। তবে আট-নয়-দশ বৎসর বয়সের ছেলেদের মধ্যে মারামারি খুবই হয়।

প্রাক্ কৈশোরে ছেলেমেয়েরা আশাভঙ্গ হইলে বা বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইলে ঐ সকল পরিস্থিতি হইতে আর কোন উদ্যোগ না করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে সরিয়া আসে বা আক্রোশবশে আক্রমণাত্মক কাজকর্মে লিপ্ত হয় অথবা অধ্যবসায় সহকারে সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করে।

ভয়।

ভয়ের বীজ নিহিত থাকে নিজের অযোগ্যতা ও অপারগতার মধ্যে। যে সব ছেলেমেয়েরা সামাজিকভাবে নিজেদের বেঢপ বা কেতাবদুরস্ত নয় মনে করে ও ভীত হয় তাহাদের বন্ধুভাবাপন্ন অন্য বালক বালিকাদের ছোট দলে রাখিয়া দিলে তাহাদের ভয় কাটিয়া যায় এবং সামাজিকতায় অভ্যস্ত অন্য সাথীদের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদেরও সামাজিক অভ্যাস গঠিত হইতে থাকে। ছেলেমেয়েরা যতই বড় হইতে থাকে ততই তাহাদের ভয় কাল্পনিক হইয়া উঠে। কি ঘটিতে পারে ইহা ভাবিয়াই তাহারা বেশী ভীত হইয়া পড়ে। প্রাক্ কৈশোর, কৈশোর এবং পরিণত বয়সে ভয় কাপুরুষতা, মঞ্চভীতি এবং সমাজ হইতে অপসরণে রূপান্তরিত হইতে থাকে। বুদ্ধি থাকিলেই ভয় যায় না। অবশ্য বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা নির্বোধ ছেলেমেদের অপেক্ষা বেশী ভয়কে গোপন রাখিতে পারে।

ক্রোধ।

অভীষ্ট বস্তু পাওয়াতে বিঘ্ন বা অসুবিধা হইলে ক্রোধের সঞ্চার হয়। ভয়ের বিপরীত রাগ। ভয়ে লোকে পিছাইয়া আসে, রাগে আগাইয়া যায়। এই

বয়সে ছেলেমেয়েরা তাহাদের কার্য করিতে গিয়া বাধা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়।

এইরূপ প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতায় যদি তাহারা বার বার পীড়িত হয় তাহা হইলে তাহাদের পুঞ্জীভূত বিরক্তি দারুণ ক্রোধের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়। বড়রা যাঁহারা এই কার্যকারণ জানেন না তাঁহারা তাহাদের ক্রোধকে যুক্তিহীন মনে করেন। প্রাককৈশোরের একসময় ছেলেমেয়েরা খোলাখুলি অবাধ্যতা প্রকাশ করে। ঠিকমত সামলাইতে না পারিলে ইহা একগুয়েমীতে পর্যবশিত হয়। বড়দের না মানিবার এই অভিব্যক্তি তাহাদের বৃদ্ধির একটি স্বাভাবিক লক্ষণ। তাহাতে তাহাদের প্রক্ষোভের তৃপ্তি আনে।

ক্রোধ নানাভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। বিদ্যালয়ের কাজে অকৃতকার্য হইলে বা পরীক্ষায় পাশ না করিতে পারিলে শিক্ষকের প্রতি বিতৃষ্ণার আকারে ইহা প্রকাশ পাইতে পারে। যাহাকে বাস্তবে জয় করা যায় নাই কল্পনায় তাহার উপর বিজয় গৌরব লাভ করা বা আত্মহত্যার দ্বারা অন্যদের শোকার্ত করিবার চিন্তার মধ্য দিয়া ক্রোধ প্রকাশ পায়।

বালক বা বালিকার ক্রোধের সময় বড়দের সহানুভূতিপূর্ণ অথচ বাস্তবধর্মী ব্যবহার করা উচিত। তাহাদের রাগে বড়রাও যদি রাগিয়া উঠেন তাহা হইলে সমস্যা আরও বাড়িয়া যায়। অবশ্য বড়রা যে ছোটদের অন্যায় দেখিলে কখনও কোপ দেখইবেন না তাহা নহে। তবে কোপের কারণ হওয়া উচিত অন্যায় কাজটি, বালক বা বালিকা নহে। এখানে গান্ধীজীর অহিংস পদ্ধতি তুলনীয়। পিতামাতা ও শিক্ষক বালক বা বালিকাকে এমন সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিবেন যেখানে হিংসাদ্বেষের পরিবর্তে সে ভালবাসিতে পারে।

ঈর্ষা।

ঈর্ষার মধ্যে ভয় ও রাগের ভাব মেশান থাকে। ঈর্ষাপরায়ণ বালক বা বালিকা তাহার শক্তি সামর্থ্যকে সন্দেহ করে। তাহার ইচ্ছা প্রতিহত হয়; সে নিজেকে পরাজিত মনে করে; সে যে স্নেহাদর পাইতেছে তাহা হারাইয়া

ফেলিবে বলিয়া ভীত হয় এবং অন্য কেহ সকলের মনোযোগের পাত্র হইলে সে রুষ্ট হয় কারণ সে নিজেকে ঐ স্থলে দেখিতে চায়।

বালক বালিকাদিগকে একের সহিত অপরের অপমানজনক বা অনিষ্টকর তুলনা করা উচিত নয়—ইহাতে ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। পিতামাতা বা শিক্ষকের পক্ষে কোন বালক বা বালিকাকে তাঁহার বিশেষ আদরের পাত্র করিয়া ফেলা উচিত নয়, তাহাতে অন্যদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হয়। ঈর্ষাপরায়ণ বালক বা বালিকাকে অনাদর করিলে বা সে যে হীন ইহা তাহাকে দিয়া অনুভব করাইবার চেষ্টা করিলে তাহার ঈর্ষার ভাব আরও বাড়িয়াই যায়।

অবশ্য অন্যদের শ্রেষ্ঠত্ব বালক বালিকাদের স্বীকার করিতে শিখিতেই হইবে। তাহারা একে অন্যের কাজ লক্ষ্য করে। মেধাবী বালক বালিকারা অন্যদের সীমিত ক্ষমতার বিষয়ে তীব্রভাবে সচেতন করাইয়া দেয়। এইজন্য প্রত্যেক ছেলে মেয়ের তাহার নিজের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে সত্যকার ধারণা থাকা দরকার। তাহার মুক্তচিত্তে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া দরকার যে তাহার পক্ষে কতকগুলি জিনিষ করা ও কোন কিছুর মত হওয়া তাহার সাধ্যাতীত। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের যে সম্পদ সম্ভাবনাগুলি আছে সেইদিকে নজর দেওয়া উচিত। সে কি করিতে পারে না অপেক্ষা সে কি করিতে পারে সেই দিকে তাহার মনোযোগ বেশী দেওয়া উচিত। এইরূপ মনোভাব লইলে অন্যের প্রতি ঈর্ষার ভাব দূর হইতে পারে। যদি তাহার উচ্চাকাঙ্খা অতিরিক্ত উচ্চ হয় তবে তাহার লক্ষ্যকে তাহার সাধ্যের সীমার মধ্যে নামাইয়া আনিতে সাহায্য করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
বংশগতি ও পরিবেশ

শিক্ষকের পক্ষে বংশগতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপর বংশগতি ও পরিবেশের কি প্রভাব তাহা তাহাকে জানিতে হইবে। ইহার সম্বন্ধে ধারণা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন আমাদের সবরকম সামর্থ্য ও বৈশিষ্ট্যের উৎস বংশগতি ও পরিবেশ। এই জ্ঞান তাঁহার ছাত্রছাত্রী লইয়া কি করিতে হইবে এবং কিভাবে তাহাদের উপযোগী পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে সে বিষয়ে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করিবে।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেহ ভাল হয়, কেহ মন্দ হয়, কেহ মেধাবী, কেহবা নির্বোধ, কেহ স্বাস্থ্যবান, কেহ রুগ্ন, কেহ সুখী, কেহ অসুখী। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই লক্ষণগুলি প্রধানতঃ বংশগতির ফলে হয় না, পরিবেশের ফলে হয়। বড়দের বেলায়ও যখন কেহ কোন বিষয়ে সাফল্যমণ্ডিত হয় তখন কেহ কেহ ভাল সুযোগসুবিধা এবং ভাগ্যকে তাহার সাফল্যের কারণ বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ বলেন সে সফল হইয়াছে তাহার জন্মগত সম্ভাবনা এবং উত্তম বংশগতির জোরেই অর্থাৎ অন্তর্নিহিত শক্তি তাহাকে বড় করিয়াছে।

বংশগতি ও পরিবেশের আপেক্ষিক গুরুত্ব লইয়া যে সকল গবেষণা হইয়াছে এবং যে সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌছান গিয়াছে শিক্ষকের সেইগুলি জানা অতীব প্রয়োজন, কেননা এসম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাসের উপর তাঁহার মত ও কর্মপন্থা নির্ভর করে। যদি তিনি বিশ্বাস করেন যে পালনপোষণের শক্তিই চরম এবং বংশগতি বা প্রকৃতির অবদান নগণ্য বা কিছুই নাই তাহা হইলে তাঁহার মতে সমস্ত শিশুরই উন্নতির সম্ভাবনা সমান এবং তাহাদের যতদূর পারা যায় ততদূর শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তিনি শিক্ষাদানের জন্য যে চেষ্টাযত্ন করিবেন তাহার ফল সকল শিশুর মধ্যেই সমানভাবে দেখিতে আশা করিবেন। অন্য পক্ষে তিনি যদি বিশ্বাস করেন যে শিশুদের সম্ভাবনা এবং সামর্থ্যের ভিতরে পার্থক্য হয় তাহা হইলে তাঁহার শিক্ষাদানের প্রচেষ্টার ফল শিশুদের মধ্যে

বিভিন্ন হইবে এবং বিভিন্ন শিশুর নিকট হইতে বিভিন্ন উন্নতি আশা করিবেন।

মানুষের নানামুখী বিকাশের উপর বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার করিয়া শিক্ষক তাহার মত গঠন করিবেন। ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষকগণই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। কেননা শিক্ষক তাঁহার ক্ষমতা অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি বিকশিত করিয়া তোলেন এবং তাহাদের অচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়ন করেন। সেই কারণে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষমতার সীমা কতদূর তাহা তাঁহার জানা থাকা দরকার। শিক্ষার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা তাঁহার শিক্ষাদর্শন এবং পদ্ধতির উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

যে শিক্ষক এই মত পোষণ করেন যে প্রত্যেক শিশুই হীরার টুকরা, ভাল করিয়া ঘষিতে পারিলেই আলো ঠিকরাইয়া পড়িবে, তাহাকে পরে পস্তাইতে হয়। শিক্ষক যতই চেষ্টা করিবেন শিশুর বিকাশ ততই বেশী হইবে বলিয়া যিনি মনে করেন তাহার অনেক শ্রমই পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। আবার যে শিক্ষক মনে করেন যে শিশুর কতদূর ও কোন্‌দিকে বৃদ্ধি ও বিকাশ হইবে তাহা একেবারে বংশগতি দ্বারা সীমিত এবং পিতামাতা ও শিক্ষকের সহায়তা ও শিক্ষার দ্বারা তাহার এদিক ওদিক করা যায় না তিনিও তাঁহার ছাত্রছাত্রীদের বহু সুপ্ত সম্ভাবনা ও সামর্থ্যকে বিকশিত করিবার সুযোগ হারাইবেন।

এইসব কারণে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাবের তুলনামূলক অলোচনার উপরই শিক্ষকের মত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই তুলনামূলক আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে শিশু তাহার পিতামাতার কাছ হইতে কিভাবে উত্তরাধিকার পায় তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইবে।

উত্তরাধিকার প্রাপ্তির প্রণালী।

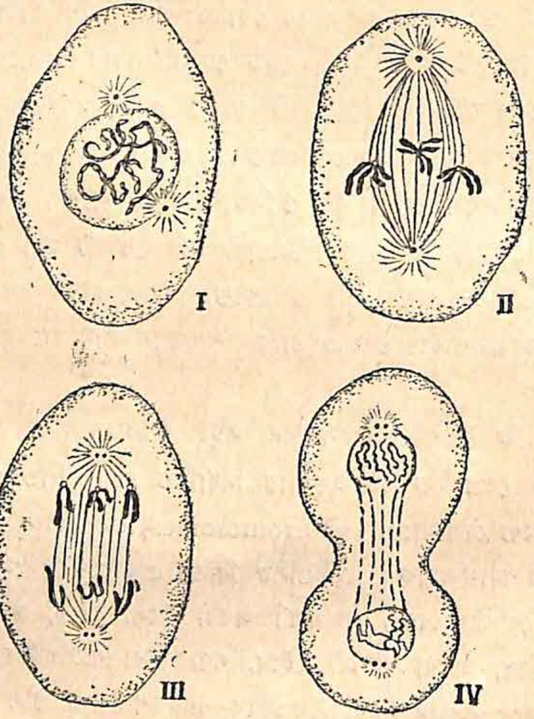
একটি কোঠাবাড়ী যেমন ইঁট দিয়া তৈয়ারী তেমনি মানবদেহ অসংখ্য কোষের সমাবেশে গঠিত। ইঁট প্রাণহীন কিন্তু কোষ জীবন্ত। মানবদেহে নানাপ্রকারের কোষ আছে। হাড় একপ্রকার কোষ দিয়া গঠিত ; মাংসপেশী,

চক্ষু, নার্ভতন্ত্র—ইহারা ভিন্ন ভিন্ন কোষ দিয়া গঠিত। বংশ উৎপাদনকারী পুরুষের কোষের নাম স্পার্ম (Sperm) এবং স্ত্রীকোষের নাম ওভাম (Ovum)। পিতা ও মাতার স্পার্ম ও ওভামের মিলনের ফলে নূতন জীবনের আরম্ভ হয়। স্পার্ম ও ওভাম মিলিয়া যে কোষটির সৃষ্টি করে তাহা বিভক্ত হইয়া দুইটি কোষের সৃষ্টি করে। এই দুইটি কোষ আবার প্রত্যেকে বিভক্ত হইয়া চারটি কোষের সৃষ্টি করে। চারটি আবার প্রত্যেকে বিভক্ত হইয়া আটটি কোষের সৃষ্টি করে। এইভাবে বিভক্ত হইবার ক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে এবং তাহার ফলে ভ্রূণের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটিতে থাকে। পিতামাতার জার্ম (Germ) কোষটি অর্থাৎ বংশ উৎপাদনকারী কোষটি ভ্রূণ দেহে সংরক্ষিত থাকে। এই ভ্রূণ যখন পরিণত মনুষ্যে পরিণত হইবে তখন তাহার সন্তান এই জার্মকোষটি পাইবে এবং এইভাবে বংশানুক্রমে জার্মকোষের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

শিশু কি বৈশিষ্ট্য এবং সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে তাহা প্রজননের কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুসারে নির্ধারিত হয়। পিতা ও মাতার জার্ম-কোষের মধ্যে ক্রোমোজোম (Chromosomes) এবং জিন্‌স্‌ (Genes) নামে কতকগুলি পদার্থ থাকে। এইগুলির বিভিন্ন প্রকারের মিলনের ফলে শিশুর নানারূপ বৈশিষ্ট্য যেমন, সে ফর্সা অথবা কালো হইবে, তাহার চক্ষুর রঙ কালো, নীল, অথবা বাদামী হইবে, লম্বা অথবা বেঁটে হইবে, মেধাবী অথবা নির্বোধ হইবে, বলবান অথবা দুর্বল হইবে—এইরূপ বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারিত হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে পিতামাতার জার্মকোষের মধ্যেই এমন পদার্থ আছে যাহা শিশুর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারিত করে।

পিতা ও মাতার জার্মকোষের প্রত্যেকটিতে ২৪ জোড়া করিয়া ক্রোমোজোম থাকে। জিন্‌সের সমষ্টি লইয়া ক্রোমোজোম গঠিত। এই জিন্‌স্‌গুলিই বৈশিষ্ট্যের কারক। ৪০ হইতে ১০০টির উপর জিন্‌স্‌ লইয়া একটি ক্রোমোজোম। গর্ভের সময় পিতা হইতে অর্ধেক অর্থাৎ ২৪টি ক্রোমোজোম এবং মাতা হইতে অর্ধেক অর্থাৎ ২৪টি ক্রোমোজাম মিলিত হয়। স্পার্মকোষের জিন্‌স্‌গুলি ওভামের জিন্‌স্‌গুলির সহিত জোড়া লাগে এবং

এইভাবে জাতকের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য কি হইবে তাহা স্থির করে। এইরূপ-ভাবে পিতা ও মাতার জিন্‌স্‌এর মিলনের ফলে যে পরিণাম হইল তাহাকেই বংশগতি বলা হয়।



চিত্র—সেল্ ও ক্রোমোজোম্

যদি পিতার লম্বাকারক জিন্‌স্ মাতার লম্বাকারক জিন্‌সের সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে জাতক লম্বা হইবার উত্তরাধিকার পাইবে। ঐরূপ, যদি পিতার মেধাকারক জিন্‌স্ মাতার মেধাকারক জিন্‌সের সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে শিশু মেধাবী হইবে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির উত্তরাধিকারও এইভাবে হইতে থাকে। পিতা ও মাতার মধ্যে যদি ফুসফুসের দুর্বলতাকারক জিন্‌স্ থাকে এবং গর্ভের সময় ইহারা মিলিত হয় তাহা হইলে সন্তানেও তাহা বর্তাইবে এবং তাহার যক্ষ্মা রোগ হইবার সম্ভবনা থাকিবে। যদি এই সন্তান এমন পরিবেশে

থাকে যাহা যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইবার অনুকূল তাহা হইলে খুব সম্ভবতঃ সে রোগের কবলে পড়িবে। রোগ বংশানুক্রমিক নয় কিন্তু দুর্বলতা বংশানুক্রমিক। সেইজন্য কেহ কেহ অল্পেতেই রোগাক্রান্ত হয় কিন্তু যাহারা শক্তিমান হইয়া জন্মিয়াছে তাহাদের জীবনীশক্তি প্রায় সব রোগকেই প্রতিরোধ করিতে পারে।

উত্তরাধিকারের কয়েকটি সূত্র।

বংশগতির সাম্য বা 'বাপ্ কা বেটা'।

বাপ্‌কা বেটা অর্থাৎ যেমন পিতা তেমনি পুত্র। উত্তরাধিকারের নিয়মই এই যে, পূর্বপুরুষেরা তাহাদের সদৃশ উত্তরপুরুষদের জন্মদান করেন। আমরা ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারি যে মেধাবী পিতামাতার ছেলেমেয়েরা মেধাবী হইবে; সাধারণ পিতামাতার ছেলেমেয়েরা সাধারণ হইবে এবং নির্বোধ পিতামাতার ছেলেমেয়েরা নির্বোধ হইবে। সেইরূপ ছেলেমেয়েরা তাহাদের পিতামাতার মত দেহাবয়ব ও দেহসৌষ্ঠব লাভ করে। যদিও ছেলেমেয়েরা মোটামুটি পিতামাতার মত হয় কিন্তু এই নিয়মের অনেক ব্যতিক্রমও আছে।

প্রকরণ।

ছেলেমেয়েরা তাহাদের পিতামাতার অবিকল নকল নয়। ভাইবোনদের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। ইহার কারণ পিতা ও মাতার বৈশিষ্ট্যকারক জিন্‌স্‌গুলি প্রত্যেকবার গর্ভের সময় বিভিন্নরূপে সংমিশ্রিত হয়। এইরূপ বিভিন্ন সংমিশ্রণের ফলেই একই পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুদ্ধি, মেজাজ ও দৈহিক গঠনের পার্থক্য দেখা যায়। ভাইবোনদের মধ্যে তফাৎ থাকিলেও তাহাদের নিজেদের মধ্যে সাদৃশ্য সম্বন্ধহীন বাহিরের ছেলেমেয়েদের অপেক্ষা বেশী থাকে। তাহাদের বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি মূলগত ঐক্য থাকে। মূল হইতে এইরূপ প্রকারভেদকেই প্রকরণ বলা হয়।

প্রত্যাবৃত্তি।

অত্যন্ত প্রতিভাশালী পিতা বা মাতার ছেলেমেয়েরা অতটা প্রতিভার অধিকারী সাধারণতঃ হয় না। রবীন্দ্রনাথ, মধুস্থদন, জগদীশ চন্দ্র বস্থ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইত্যাদির নাম আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি। আবার অত্যন্ত হীনভাবাপন্ন পিতা বা মাতার ছেলেমেয়েরা অতটা হীনতা লইয়া জন্মায় না। এই যে দুই চরম অবস্থা হইতে ছেলেমেয়েদের একটি মাঝামাঝি অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রবণতা ইহাকেই বলে প্রত্যাবৃত্তি। উচ্চ ও নিম্নের দুই চরম সীমার বাহিরে কোন কোন ছেলেমেয়ে যাইলেও সাধারণতঃ তাহাদের মাঝামাঝি অবস্থায় ফিরিয়া আসারই সম্ভবনা বেশী থাকে। মস্ত বড় খেলোয়াড়ের ছেলে অত বড় খেলোয়াড় হইতে পারে না। প্রখর প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের পুত্রকন্যারা অত বড় বৈজ্ঞানিক হইতে পারে না।

এই প্রত্যাবৃত্তির দুইটি কারণ থাকিতে পারে। একটি হইতেছে যে পিতা বা মাতা যে জার্মকোষদ্বয়ের সম্মিলনে উৎপন্ন হইয়াছেন তাহাদের জিন্‌স্ সমাবেশ এমন চমৎকার হইয়াছিল যাহা তাহাদের সৌভাগ্যের কারক অর্থাৎ যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য তাঁহাদের মধ্যে অত প্রখর বা প্রভূতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ঐ জিন্‌স্ সংহতির অমৃতময় পরিণাম। পুত্র বা কন্যার জিন্‌স সংহতি ঐরূপ উৎকৃষ্ট হয় নাই এবং সেই কারণে তাহারা তাহাদের পিতামাতার মত প্রতিভাশালী হইতে পারে নাই। দ্বিতীয় কারণ এই যে প্রতিভাশালী ব্যক্তি সাধারণতঃ এমন মহিলাকে বিবাহ করে যে অত প্রভিভাশালী নয়, স্থতরাং তাহার জার্মকোষ তাহার স্বামীর মত অত উচ্চশ্রেণীর হয় না। ফলে তাহাদের সন্তানরা পিতার মত অতটা উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে না।

অনুরূপভাবে দেখা যায় অত্যন্ত অল্পবুদ্ধি পিতামাতার ছেলেমেয়েরা অতটা অল্প বুদ্ধি হয় না। কারণ সন্তানের জিন্‌স্ সমাবেশ পিতামাতা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইবারই সম্ভাবনা থাকে।

বংশগতির সাম্য, প্রকরণ এবং প্রত্যাবৃত্তি—উপরে বর্ণিত এই তিনটি সাধারণ স্থত্রের সাহায্যে মানুষের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে বুঝিবার পক্ষে স্থবিধা হয়। সাধারণতঃ সন্তানরা পিতামাতার মতনই বুদ্ধিমান,

লম্বা, স্বাস্থ্যবান ইত্যাদি হয় ; কিন্তু তাহাদের বংশের যে গড় সামর্থ্য তদপেক্ষা ঊর্ধ্বে বা নিম্নে তাহারা যাইতে পারে। আবার পিতামাতার অতি উচ্চ গুণ বা বৈশিষ্ট্য সন্তানকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইতে দেখা যায় না এবং পিতামাতার অতি নিম্ন গুণ বা বৈশিষ্ট্য হইতে সন্তানকে উৎকৃষ্টতর হইতে দেখা যায়। যেন বংশধারার শাখাগুলি মূলস্রোতের এদিকে ওদিকে চলিয়া যায় কিন্তু মূলস্রোতকে একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া আবার তাহাতে প্রত্যাবর্তন করিতে চায়।

গর্ভকালীনপ্রভাব ও অর্জিত গুণাগুণ।

স্ত্রী ও পুরুষ জার্ম কোষের সম্মিলনের পর হইতে শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় পর্যন্ত গর্ভকাল বলা হয়। মনুষের পক্ষে গর্ভকাল প্রায় ৯ মাস দীর্ঘ হয়।

ভ্রূণ এবং অজাত শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের উপর কি কি প্রভাব পড়িতে পারে তাহা আজও ভাল করিয়া জানা যায় নাই। মায়ের অপুষ্টি, গর্ভস্থ সন্তানের উপর চাপ এবং তাহার শরীরের রাসায়নিক সমতার প্রভাব ভ্রূণের উপর আছে কি না তাহা স্পষ্ট নয় তবে দেখা যায় জন্মের সময় যদি কোন অনিষ্ট ঘটে তাহা হইলে তাহার কুফল শিশুকে সারাজীবন ভোগ করিতে হয়। সিফিলিস, গণোরিয়া এই সব যৌনব্যাধিতে গর্ভস্থ শিশুকে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। মাতার এবং শিশুর রক্তের মধ্যে সমতা না থাকিলে তাহার মন্দ প্রভাব শিশুর উপর পড়ে।

মাতার অভিজ্ঞতা, চিন্তা-ভাবনা, দুঃখভয়, আহ্লাদ—এইসবের কোন প্রভাবই গর্ভস্থ শিশুর উপর পড়ে না। তবে কঠিন পীড়া এবং গভীর শোক বা কাতরতার প্রভাব সম্ভবতঃ ভ্রূণের উপর পড়ে, কিন্তু শিশু কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে মাতার আদর্শ এবং ইচ্ছা ফলবতী হয় না। ভাল ভাল চিত্রের দিকে তাকাইয়া থাকিলে বা সুমধুর সঙ্গীত ক্রমাগত শুনিলে বা সাধুসঙ্গ ও সৎগ্রন্থ পাঠ করিলেও মা প্রতিভাশালী চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ বা সাধু সন্তান লাভ করিতে পারেন না।

তবে গর্ভের পরিবেশ যত সুস্থ ও স্বাভাবিক হয় ভ্রূণের বৃদ্ধি ও বিকাশ তত অব্যাহত হয়। মাতার যদি পুষ্টিবিধান করা যায় তাহা হইলে গর্ভস্থ

শিশুও সুস্থ হইয়া বাড়িয়া উঠিবে আশা করা যায়। মাতা যদি শান্ত ও প্রফুল্ল থাকেন তাহা হইলে অজাত শিশুর উপরও তাহার ভাল প্রভাব পড়িতে পারে। যদিও এইসব বিষয়ের কোন সন্তোষজনক প্রমাণ এখনও আমাদের হাতে নাই কিন্তু গর্ভের নয় মাস সময়ে ভ্রূণের যে বিস্ময়কর বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে তাহাতে ভাল গর্ভস্থ পরিবেশ যে অতীব প্রয়োজনীয় তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

পিতামাতার অর্জিত গুণাগুণ শিশুরা বংশানুক্রমে পায় না। মানুষ বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে নানা কাজকর্মে নৈপুণ্য অর্জন করে, তাহার যোগ্যতাকে বাড়ায় এবং তাহার জ্ঞানভাণ্ডারেরও বৃদ্ধি হইতে থাকে, কিন্তু এইসব গুণাগুণ তাহার সন্তানে বর্তায় না। জার্মকোষ এইসকলের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকে। তবে এইবিষয়ে সকলে এক মত নহেন।

পূর্বপুরুষ এবং বংশগতি।

শুধুমাত্র পিতামাতার নিকট হইতেই শিশু উত্তরাধিকার লাভ করে না। সে তাহার পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী, প্রপিতামহ, প্রপিতামহী, প্রমাতামহ, প্রমাতামহী ইত্যাদি উর্ধতন পুরুষ হইতেও উত্তরাধিকার পায়। অবশ্য বেশী উত্তরাধিকার সে তাহার পিতামাতার নিকট হইতেই পায় এবং পূর্বপুরুষেরা যতই দূর হইতে থাকেন ততই তাহাদের বংশগতির প্রভাব কমিতে থাকে। শ্রেষ্ঠ পিতামাতার তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট পিতামাতার তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্তান লাভের আংশিক কারণ পূর্বপুরুষ হইতে আগত বংশগতির প্রভাব। পুত্রকন্যাগণ পূর্বপুরুষদের নিকট হইতেও কিছুটা বংশগতি লাভ করে বলিয়া তাহারা ঠিক তাহাদের পিতামাতার মত হয় না।

পুত্রকন্যারা সম্ভবতঃ অর্ধেক উত্তরাধিকার লাভ করে পিতামাতার নিকট হইতে, একচতুর্থাংশ পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ ও মাতামহীর নিকট হইতে এবং এক অষ্টমাংশ প্রপিতামহ, প্রপিতামহী, প্রমাতামহ, প্রমাতামহী ইত্যাদির নিকট হইতে। এইরূপে পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে $\frac{১}{১৬}$, $\frac{১}{৩২}$, $\frac{১}{৬৪}$, $\frac{১}{১২৮}$ প্রভৃতি উত্তরাধিকার তাহারা লাভ করে।

বংশগতি, পরিবেশ এবং মানসিক সামর্থ্য।

বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাবের যে তুলনামূলক প্রশ্ন পূর্বে তোলা হইয়াছে এখন আমরা তাহার বিবেচনা করিব। কয়েকজন প্রতিভাবান হইয়া উঠে আবার কয়েকজন ক্ষীণবুদ্ধি থাকিয়া যায় এবং অধিকাংশ ব্যক্তি মাঝামাঝি ধরণের বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। মানসিক সামর্থ্য অসামর্থ্য লইয়া ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করে অথবা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রভেদের ফলেই তাহাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়—ইহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়স্থান, গ্রন্থি এবং বিশেষ করিয়া নার্ভতন্ত্রের মত শারীরিক অবয়বের গুণাগুণের উপর বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য বা নিষ্প্রভতা নির্ভর করে। বুদ্ধির শারীরিক কেন্দ্রস্থল হইতেছে মস্তিষ্ক এবং নার্ভীয় সংযোগ। নার্ভ, মাংসপেশী এবং গ্রন্থির সমন্বয় এবং শারীরিক নানাপ্রকার উপাদানের গুণাগুণ ও পরিমাণের উপর মানসিক সামর্থ্যের বিকাশ নির্ভর করে। দৈহিক অবয়বের বৃদ্ধি ও গুণাগুণ বংশানুক্রমে হয় এবং যেহেতু এই অবয়বগুলির উপর মানসিক কার্য নির্ভর করে সেইহেতু মানসিক সামর্থ্যকেও বংশানুক্রমিক বলা যাইতে পারে।

তবে এই সকল অবয়বের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং কার্যকারিতা নির্ভর করে পরিবেশের অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার উপর। সুতরাং বৌদ্ধিক বিকাশে পরিবেশের যথেষ্ট হাত আছে। সেই কারণে আমরা বংশগতির সহিত পরিবেশের তুলনামূলক বিবেচনা করিব।

পারিবারিক সম্বন্ধ এবং বংশানুক্রম।

উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট পারিবারিক বংশানুক্রম।

কতকগুলি পরিবারের বংশতালিকা ধরিয়া তাহাদের পূর্বপুরুষ ও উত্তর-পুরুষদের জীবনী অনুসন্ধান করা হইয়াছে। কোন বংশে ক্রমাগত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং কোন বংশে ক্রমাগত অধিকাংশ নিকৃষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিনা জানাই এই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল।

এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে কতকগুলি বংশে খ্যাতি ও পারদর্শিতার

প্রাচুর্য এবং কতকগুলিতে ক্ষীণ বুদ্ধি, মস্তিষ্ক বিকার এবং অপরাধের প্রাবল্য দৃষ্ট হইয়াছে। অবশ্য বেশীরভাগ বংশের মান সাধারণ। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ফ্রান্সিস্ গ্যাল্টন্ এই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল পরিবারের বংশে ক্ষীণবুদ্ধি, বাতুলতা, অপরাধ বা সামাজিক হীনতা পুরুষানুক্রমে লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহাদের জিউক্স্ এবং ক্যালিক্যক্স্ (Jukes and Kallikaks) এই ছদ্মনামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই বংশের অনেকেই চোর, আলস্যপরায়ণ, উনমানস, বেশ্যা এবং বাতুল ছিল। প্রত্যেক পুরুষে যদিও অল্প কয়েকজন স্বাভাবিক ও যোগ্য ব্যক্তি ছিল কিন্তু অধিকাংশই অযোগ্য ও অসমর্থ ব্যক্তি ছিল। যে সব অপরাধী ব্যক্তির কারাদণ্ড হইয়াছিল, যাহাদের বাতুলালয় বা উনমানসতার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হইয়াছিল তাহাদের বংশের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাদের অনুরূপ আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা প্রচুর।

অনুরূপভাবে একটি ভাল বংশকে লইয়াও অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। এই বংশের নাম এড্ওয়ার্ড (Edwards) এবং আমেরিকার ঔপনিবেসিক সময় হইতে এই বংশের অনেক পুরুষপরম্পরায় তথ্য লওয়া হইয়াছিল। এড্ওয়ার্ড বংশে বহু গণ্যমান্য বিচারক, কলেজ প্রেসিডেণ্ট, ধর্মযাজক, অধ্যাপক এবং নেতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এখন আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন এই যে, কোন এক বংশ প্রতিভা, খ্যাতি, যশের গৌরবে মহিমান্বিত আবার কোন বংশ মানুষিক দুর্বলতা ও নৈতিক অধঃপতনে চিহ্নিত—ইহার কারণ কি শুধু বংশ গতির প্রভাব। ভাল বংশে যে সব ছেলেমেয়ে জন্মাইয়াছে তাহারা উৎকৃষ্ট সাংস্কৃতিক পরিবেশেও মানুষ হইবার সুযোগ পাইয়াছে এবং দরিদ্র, মূর্খ, দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদের বংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা একটি দূষিত, হীন এবং অপবিত্র পরিবেশে তাহাদের জীবন কাটাইতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে ভাল ও মন্দ বংশের ছেলেমেয়েদের উপর পরিবেশের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় পড়িয়াছে। এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনত্বের জন্য শুধু বংশগতি দায়ী নহে। বংশগতি ও পরিবেশের মিলিত প্রভাবই বংশের উৎকর্যতা এবং অপকর্ষতার জন্য দায়ী।

যদিও সঙ্গতিপন্ন এবং সামাজিক পদমর্যাদা সম্পন্ন গৃহেতেই প্রতিভাশালী ও মেধাবী ব্যক্তিদের আগমন হয় তবে তাঁহারা যে দরিদ্রের ঘরকে আলো করিয়াও আসেন না তাহা নহে। শ্রীচৈতন্য, হজরত মহম্মদ, যিশু খৃষ্ট, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মার্টিন লুথার, কামাল পাশা, এডিসন ইঁহারা সকলেই গরীবের সন্তান ছিলেন।

রক্তের সম্পর্ক এবং সামর্থ্য।

রক্তের সম্পর্কের দিক হইতে যমজরা পরস্পরের সহিত সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। যমজরা দুইপ্রকারের হয়—অবিকল যমজ (Identical twins) এবং ভাই ভাই যমজ (Fraternal twins)। একই কোষ বিভক্ত হইয়া গেলে এবং তাহাদের বৃদ্ধির ফলে অবিকল যমজ উৎপন্ন হয়। ভাই ভাই যমজ দুইটি ভিন্ন কোষের সহঅবস্থানের ফলে উৎপন্ন হয়। অবিকল যমজদের পারস্পরিক সম্পর্কের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক আর কাহাদেরও মধ্যে নাই। ইহার পর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার মাত্রা যথাক্রমে ভাই ভাই যমজ, আপন ভাইবোন, খুড়তুত ও মাসতুত ভাইবোন ইত্যাদির মধ্যে আছে। প্রপিতামহ, প্রপিতামহী, প্রমাতামহ ও প্রমাতামহীর সহিত প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রীদের সামর্থ্যগত সাদৃশ্য অপেক্ষা পিতামাতা ও পুত্রকন্যাদের মধ্যে সামর্থ্যগত সাদৃশ্য অনেক বেশী। এইরূপ জেঠা, জেঠী, খুড়া, খুড়ীর এবং মামা, মামী, মেসো মাসীদের সহিত ভাইপো, ভাইঝি, বোনপো, বোনঝি, ভাগ্না, ভাগ্নীদের যে সামর্থ্যগত মিল দেখা যায় তদপেক্ষা বেশী মিল থাকে পিতামাতা ও পুত্র কন্যাদের মধ্যে।

যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বলা যায় যে সম্পর্ক যত নিকট হয় শক্তি সামর্থ্যের মিলও তত বেশী হয়। দৈর্ঘ ওজন, মানসিক শক্তি, বিদ্যালয়ের কাজে পারদর্শিতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার মাত্রার উপর নির্ভর করে, যেমন অবিকল যমজদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য থাকে তাহার পর যথাক্রমে ভাই ভাই যমজ, আপন ভাইবোন, পিতামাতা ও তাহাদের সন্তান, খুড়তুত ও মাসতুত ভাইবোন, প্রপিতামহ ইত্যাদি এবং প্রপৌত্র ও

প্রপৌত্রী—ইহাদের মধ্যে ন্যূনাধিক সাদৃশ্য দেখা যায়। নিঃসম্পর্কীয় ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না।

তাহা হইলে কি আমরা ধরিয়া লইব যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা অনুযায়ী মানুষ সদৃশ বংশগতির অধিকারী হয়? অবিসংবাদীতভাবে একথা বলা যায় না কারণ সম্পর্কে যাহারা যত নিকট হয় তাহাদের পরিবেশও তত সমান হয়।

যমজদের গর্ভের পরিবেশ অযমজদের অপেক্ষা সমান। খুড়তুত, মাসতুত ভাইবোনদের পরিবেশ আপন ভাইবোনদের মত সদৃশ হয় না। এইভাবে সাদৃশ্য ও পার্থক্য দুইই বংশগতি এবং পরিবেশ একত্রে ঘটায়।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মত পিতামাতার উচিত অনুচিতের বোধের সহিত খানিকটা সঙ্গতি থাকে। অন্যান্য জ্ঞানের মত নৈতিক জ্ঞান অর্জন করিবার শক্তি সম্ভবতঃ বংশানুক্রমে পাওয়া যায়; কিন্তু অর্জিত নৈতিক আচরণের জ্ঞান এবং এতদ্ সম্পর্কিত আদর্শ ও মনোভাব প্রধানত বাড়ীর শিক্ষা ও আবেষ্টনীর ফলেই উৎপন্ন হয়।

আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে পরিবেশ বংশগতির সহযোগিতায় পারিবারিক সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের আরও সদৃশ করিয়া তুলে। তবে বংশগতির শক্তিকে উপেক্ষা করিবার কোন কারণ নাই। এক জোড়া অবিকল যমজকে দেখিলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। তাহাদের আকার, আয়তন, দেহাবয়বের নানারূপ বৈশিষ্ট্য, চোখের রঙ, চুলের রঙ ও কোঁকড়ানভাব, আঙ্গুলের ছাপ, বিদ্যালয়ে কৃতি এবং স্বভাব ও মেজাজের অবিকল সাদৃশ্য দেখিলে বংশগতির প্রভাবকে মানিতেই হয়। অন্যদিকে আপন ভাইবোনদের মধ্যে যে প্রকরণ ঘটে তাহাও বংশগতির সূত্রকে সমর্থন করে।

পিতার পেশাগত মান এবং সন্তানের মানসিক সামর্থ্য।

পিতামাতার জীবিকা বা পেশার সহিত তাহাদের পুত্রকন্যাদের বুদ্ধির সম্বন্ধ থাকিতে দেখা যায়। পিতা কি কাজ করে তাহার সঙ্গে পুত্রকন্যাদের বুদ্ধির সম্বন্ধ কিরূপ তাহা শিক্ষকের জানা দরকার। অবশ্য এই সম্বন্ধ

সাধারণভাবে সত্য এবং কোন বিশেষ শিশুকে বিচার করিবার সময় ইহার উপর নির্ভর করা উচিত নয় কেননা পিতা নীচু কাজ করিলেও তাহার সন্তান যে প্রতিভাধর হইবে না এমন কোন কথা নাই। তবে এই সম্বন্ধের জ্ঞান থাকিলে শিক্ষক তাঁহার ছাত্রছাত্রীদের আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন। যেস্থানে পিতারা প্রধানত আইনজীবী, চিকিৎসক, অধ্যাপক এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সেখানকার ছেলেমেয়েদের শক্তিসামর্থ্য যেসব ছেলেমেয়েদের পিতারা কুলী কামারী ও অনুরূপ নীচু ধরণের কাজ কারবার করে, তাহাদের অপেক্ষা বেশী হইবে। ছাত্রছাত্রীদের বুঝিবার জন্য এই জ্ঞান শিক্ষককে যথেষ্ট সাহায্য করে।

পেশাগুলিকে শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতা অনুসারে পরপর সাজান হয়, সকলের নীচে থাকে কুলী মজুরের কাজ যাহাতে কোন বিশেষ কৌশল লাগে না, এক কথায় বলা যাইতে পারে অকৌশলী কর্মীর কাজ, ইহারা প্রধানত শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা উপার্জন করে। ইহার পর আসে অল্প কৌশল লাগে এমন ধরণের কাজ, তারপর পূরা কৌশল লাগে এরূপ কাজ, এইভাবে উপরের দিকে ব্যবসায় এবং কেরাণীর কাজ এবং উচ্চশ্রেণীর পেশার কাজ। উপরের পেশার ক্রম অনুযায়ী উদাহরণ দেওয়া যায় যেমন, কুলী মজুর, ড্রাইভার, মৎস মাংস ব্যবসায়ী, ছুতার, পুলিশ, মোটরগাড়ীর মিস্ত্রি, অপিসের কেরাণী, হিসাব রক্ষক, স্কুলের শিক্ষক, গ্রন্থগারিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সৃষ্টিধর্মী লেখক এবং বৈজ্ঞানিক। কাজগুলিকে এইভাবে ক্রমোচ্চভাবে সাজানর উদ্দেশ্য এই যে শিক্ষার পরিমাণ, মানসিক সামর্থ্য এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধি অল্পাধিক থাকিবার ফলেই লোকেরা কাজগুলির জন্য যোগ্য হয় এবং যোগ্যতা অনুসারে সেই সেই পদারূঢ় হইতে পারে। তবে একথাও সত্য যে, যে ব্যক্তি নীচু কাজ করে তাহাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি যে থাকিবেই না এমন কোন কথা নাই। তবে সেইরূপ লোক খুব বিরল।

সাধারণভাবে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, যে যে কাজ করে তাহার বৌদ্ধিক সামর্থ্য সেই কাজের উপযোগী এবং যেহেতু পুত্রকন্যাদের বুদ্ধি পিতামাতার মত হয় অতএব পিতার কাজ বা পেশার সহিত তাহাদের

বুদ্ধির সঙ্গতি থাকিবে আশা করা যায়, তাহা হইলে যে ব্যক্তিরা উচ্চ পেশার পদে নিযুক্ত তাহাদের পুত্রকন্যাদের বুদ্ধি সবচেয়ে বেশী হইবে এবং অকৌশলী শ্রমিকদের পুত্রকন্যাদের বুদ্ধি সবচেয়ে কম হইবে। বস্তুত এইরূপ প্রবণতাই সত্য হইতে দেখা যায়। এখানেও এই প্রশ্ন আবার আসে যে পিতামাতার জিন্‌সের ফলেই পুত্রকন্যাদের ভিতর বুদ্ধির এই পার্থক্য দেখা যায় অথবা শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের তারতম্যের ফলেই এইরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শ্রমিকের ছেলেমেয়ে অপেক্ষা উচ্চপেশায় নিযুক্ত ব্যক্তির ছেলেমেয়ে তাহাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা পায়। এখানেও আমরা বংশগতি ও পরিবেশের ফলকে পৃথক করিয়া দেখিতে পারি না। দুইই মিলিতভাবে ফলপ্রদ হয়। তবে পেশাগত পদের সহিত বংশগতির গুণাগুন একত্রে থাকিবার সম্ভাবনা কিছু পরিমাণে থাকে।

নির্বাচিত প্রজনন।

বংশগতি সম্বন্ধে আমাদের যেটুকু জ্ঞান হইয়াছে তাহাতে আমরা আশা করিতে পারি যদি কোন পুরুষ গুণাগুণে তাহার সমকক্ষ কোন নারীকে বিবাহ করে তাহা হইলে তাহাদের পুত্রকন্যারা মোটামুটি তাহাদের মত হইবার সম্ভাবনাই থাকিবে। যদি খুব বুদ্ধিমান, স্বাস্থ্যবান এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট গুনসম্পন্ন পুরুষরা অনুরূপ গুণসম্পন্ন নারীদের বিবাহ করে তাহা হইলে তাহাদের সন্তানরা তাহাদের মত হইবে কি? আবার যদি নির্বোধ, হীনস্বাস্থ্য এবং মন্দ নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন পুরুষরা অনুরূপ গুণসম্পন্ন নারীদের বিবাহ করে তাহা হইলে তাহাদের সন্তানরা কিরূপ হইবে আশা করা যায়?

এই বিষয়ে মানুষের উপর কোন পরীক্ষা করা হয় নাই। ইঁদুর লইয়া একটি পরীক্ষা করা হইয়াছিল। একটি গোলক ধাঁধায় চোরা গলিতে না ঢুকিয়া কত তাড়াতাড়ি ইঁদুররা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইতে পারে ইহাই ছিল পরীক্ষার বিষয়। গোলক ধাঁধার মধ্যে সুকৌশলে দৌড়ানর দ্বারা ইঁদুরের বুদ্ধির পরিমাপ পাওয়া যায়। একদল ইঁদুর লইয়া এই পরীক্ষা আরম্ভ করা

হয় এবং যে ইঁদুরগুলি গোলকধাঁধায় সব চেয়ে বেশী নিপুণতা দেখাইয়াছিল তাহাদের আলাদা করিয়া তাহাদের মধ্যে যৌন সম্মিলন সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। অনুরূপভাবে যে ইঁদুরগুলি গোলকধাঁধায় সবচেয়ে কমবুদ্ধি দেখাইয়াছিল তাহাদের আলাদা করিয়া তাহাদের বংশ বৃদ্ধি তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। কয়েকপুরুষ ধরিয়া এই দুই বংশকে আলাদা রাখা হইয়াছিল; নির্বাচিত প্রজননের অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষে সবচেয়ে বেশী ও সবচেয়ে কম বুদ্ধি সম্পন্ন ইঁদুরদের বাছিয়া দুই দলের প্রত্যেক দলের ভিতর প্রজনন সীমিত রাখা হয়। উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচিত প্রজননের ফলে বুদ্ধিমান ও নির্বোধ বংশের উৎপত্তি হয় কি না দেখা। এইরূপ প্রক্রিয়া করিতে করিতে আটপুরুষ পর দেখা গেল সত্য সত্যই বুদ্ধিমান ও অল্পবুদ্ধি দুইটি দলের আবির্ভাব হইয়াছে। বুদ্ধিমান দলের কেবল একটি ইঁদুর অল্পবুদ্ধিমান দলের মত হইয়াছিল। বুদ্ধিমান পিতামাতার নিকৃষ্ট জিন্সের সম্মিলনের ফলেই ঐরূপ হীনবুদ্ধি ইঁদুর জন্মাইয়াছিল।

শিখিবার সামর্থ্য সম্বন্ধে এই পরীক্ষা হইয়াছিল। এই পরীক্ষা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা মনে করিতে পারি যে যাহারা ভাল শিখিতে পারে ও যাহাদের শিখিবার ক্ষমতা খুব কম তাহাদের প্রত্যেকের দলের স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে প্রজনন সীমিত থাকিলে ভবিষ্যতে এই দুই দলের সন্তানদের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য দেখা দিবে। শিশুদের ভিতর স্বাভাবিক শিখিবার ক্ষমতার যে পার্থক্য দেখা যায় তাহা যে সত্য এবং বংশগতি প্রসূত শিক্ষক ও পিতামাতা উপরের পরীক্ষা হইতে তাহা শিখিতে পারেন। যদিও ইঁদুর ও মানুষের মধ্যে অনেক প্রভেদ কিন্তু দুইয়ের মধ্যে প্রজনন তত্ত্বের এত মিল আছে যে এই পরীক্ষার ফল হইতে মানুষের শিখিবার ক্ষমতা সম্বন্ধেও নির্বিবাদে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়।

পশুপালনের ক্ষেত্রে প্রজনন তত্ত্বের প্রভাব বেশ উপলব্ধি করা যায়। খাদ্যের জন্য হৃষ্টপুষ্ট পশুপক্ষী, দুগ্ধবতী গাভী এবং দ্রুতগামী অশ্ব নির্বাচিত প্রজননের ফলে হয়। কুকুরদের জাত, স্বভাব এবং শিকারী কুকুরের মত কৌশল বৈজ্ঞানিক প্রজননের দ্বারা করা সম্ভব।

পোষ্য সন্তান।

নির্বাচিত প্রজননের দ্বারা যেমন বংশগতির প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখান হইল, দেখা যাউক পরিবেশের প্রভাব ঐভাবে দেখান যায় কি না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে পোষ্য পুত্রকন্যাদের আসল পিতামাতার বংশগতি ও গৃহ পরিবেশ পোষ্য গ্রহণকারী পিতামাতার বংশগতি ও গৃহ পরিবেশ হইতে অনেক নিকৃষ্ট হয়। নিকৃষ্ট বংশগতি সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের উৎকৃষ্ট পরিবেশে রাখিলে কি ফল হইতে পারে? পোষ্যদের বুদ্ধি, বিদ্যালয়ে প্রগতি এবং তাহাদের আচরণের উপর পালনকারীর গৃহ পরিবেশ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে এবিষয়ে অনুসন্ধান করা হইয়াছিল।

যে পালনকারী পিতামাতা সমাজে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, যাহাদের আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, যাহাদের বাড়ীতে ভাল ভাল বই এবং রেডিও আছে এবং সম্ভবতঃ টেলিফোনও আছে, যাহাদের বাড়ীটি বেশ প্রশস্ত, সুনির্মিত এবং সুদৃশ্য এবং ভদ্রসমাজে অবস্থিত এবং যথায় প্রতিবেশী বালক-বালিকারা বুদ্ধিমান এবং সুসভ্য এরূপ বাড়ীতে পোষ্য পুত্রকন্যাগণ থাকিতে পাইলে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবের অধীনে তাহারা থাকিতে পারিবে এবং তাহাদের বুদ্ধি এবং চরিত্র বিকাশের সবচেয়ে বেশী সুযোগ পাইবে।

যে পিতামাতারা মন্দ চরিত্রের, প্রায় শিক্ষাদীক্ষাহীন, যাহাদের আয় অল্প, পুত্রকন্যাদের কি হইল না হইল সে বিষয়ে যাহারা উদাসীন—এইরূপ পিতামাতার গৃহে পালিত হইলে ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে যাইতে চায় না এবং তাহাদের স্কুলে অনুপস্থিতি খুব বেশী হয়, উচ্চাকাঙ্খা রহিত হয় ও দুষ্ক্রিয় হয়। এই দুই চরম অবস্থার মাঝামাঝি অনেক প্রকার পোষ্য গৃহ থাকিতে পারে।

অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে ভাল গৃহে পালিত হইলে শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ বেশী হয়। বেশীর মাত্রা নির্ভর করে কত ছোট অবস্থায় তাহাদের পোষ্য লওয়া হইয়াছে এবং কতদিন তাহারা ভাল গৃহে বসবাস করিতেছে। বুদ্ধির বিকাশ বেশী হইলেও পরিমিত মাত্রার মধ্যেই সীমিত থাকে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পোষ্য ছেলেমেয়েরা বেশ উন্নতি দেখায় কিন্তু উচ্চ

বিদ্যালয়ে এইরূপ উন্নতি দেখাইতে পারে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাহাদের নিজেদের চেষ্টায় ও পালক পিতামাতাদের সহায়তায় তাহারা সন্তোষজনক কৃতিত্ব দেখাইতে পারে কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চতর গণিত, বিদেশীভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান যখন পড়িতে হয় তখন তাহাদের নিকৃষ্ট বংশগতির শক্তির সীমা শেষ হইয়া যায় এবং তাহাদের পরে লেখাপড়ায় আরও অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

বুদ্ধি এবং বিদ্যালয়ের কৃতিত্ব অপেক্ষা পোষ্যদের সামাজিক ও নৈতিক ব্যবহার ও আচরণ প্রভৃত পরিমাণে উৎকর্ষতা লাভ করে। তাহাদের আসল পিতামাতা অপেক্ষা তাহাদের ব্যবহার অনেক বেশী উন্নত ধরণের হয়।

পরিশেষে আমরা বলিতে পারি যে পালকের গৃহ পরিবেশ পোষ্যদের বুদ্ধি কিছুটা বাড়ায়, প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ে কৃতিত্ব দেখানয় সাহায্য করে এবং তাহাদের আচার ব্যবহারকে সামাজিকভাবে সুরুচি ও সৌজন্যপূর্ণ করিয়া তোলে। তাহাদের আচরণের উপরই পালকের গৃহ পরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে বেশী দেখা যায়।

সদৃশ ও ভিন্ন পরিবেশে পালিত যমজ

অবিকল যমজদের মধ্যে সমতা।

অবিকল যমজরা যেন একে অপরের প্রতিবিম্ব—দর্পনে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব যেন সত্য হইয়া উঠিয়াছে। কে কোন্ জন চিনিতে না পারার জন্য খুব ভুল বুঝাবুঝি হয়। লেখকের জানা এইরূপ একজোড়া যুবকযমজ তাহাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিবার জন্য একজন দাড়ী রাখিয়াছে। পূর্বে তাহাদের মাও কে কোন্ জন চিনিতে ভুল করিত। এইরূপ যমজদের মধ্যে মিল কতদূর আছে জানিবার জন্য তাহাদের দৈহিক, মানসিক এবং শিক্ষাগত গুণাগুণের তুলনামূলক পরীক্ষা করা হইয়াছিল। দৈহিক মাপের মধ্যে তাহাদের উচ্চতা, ওজন, মাথার দৈর্ঘ প্রস্থ এবং কোমরের প্রস্থের মাপের তুলনা এবং মানসিক শক্তি ও বিদ্যালয়ের পঠিত বিষয়ে জ্ঞানের পরীক্ষার তুলনা করা

হইয়াছিল। এইরূপ পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে দৈহিক মাপের মধ্যে ত খুবই মিল আছে এমন কি তাহাদের মানসিক সামর্থ্য এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যেও যথেষ্ট মিল দেখা গিয়াছে।

এইরূপ মিলের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যদি যমজের একজন লম্বা হয় তাহা হইলে অন্যজনও প্রায় ঐরকমই লম্বা হইবে; একজন বেঁটে হইলে অন্যজনও বেঁটে হইবে। যদি একজনের বুদ্ধাঙ্ক * ১২৪ হয় তবে অন্যজনেরও প্রায় তাহাই হইবে। যদি কাহারও বুদ্ধাঙ্ক ৯০ হয় তাহা হইলে অপর জনেরও প্রায় তাহাই হইবে। বিদ্যালয়ের বিষয়ের জ্ঞানেও উভয়েরই প্রায় সমান অধিকার দেখা যায়, শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উভয়েরই স্থান হয় উচ্চে, নয় মাঝামাঝি বা নিম্নে থাকে।

বিভিন্ন পরিবেশে পালিত অবিকল যমজ।

এমন ঘটিয়াছে যে জন্মের পর হইতেই যমজরা পৃথক হইয়া গিয়াছে এবং দুইটি বিভিন্ন পরিবারে লালিত পালিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে তাহারা দুইটি বিভিন্ন পরিবেশে থাকিয়া মানুষ হইয়াছে। এইরূপ ২০ জোড়া যমজকে লইয়া অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। যমজ যুগলের মধ্যে একজন গ্রামের খামারে এবং অন্যজন সহরে প্রতিপালিত হইয়াছিল। সহরে যে ছিল সে বেশ আনন্দে ও আরামে জীবন কাটাইতে পারিয়াছিল, অন্যজনকে দুঃখ কষ্ট সহিতে হইয়াছিল; সহরবাসী গ্রামবাসী হইতে অনেক বৎসর বেশী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছিল। তাহাদের স্বাস্থ্য, দৈহিকবৃদ্ধি ও বিকাশ, বুদ্ধি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতায়, বিভিন্ন জীবন যাপন ও অভিজ্ঞতা কোন পার্থক্য ঘটায় কিনা আবিষ্কার করাই অনুসন্ধানের লক্ষ্য ছিল।

কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন পরিবেশে থাকিয়াও অবিকল যমজদের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল, নিম্নে কতকগুলি পরিবর্তন বর্ণিত হইল।

---

* বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করিয়া কোন ব্যক্তির বুদ্ধির যে পরিমাপ সংখ্যায় বাহির করা হয় তাহাকে বুদ্ধাঙ্ক বলে।

যমজ ভগ্নীদ্বয়ের মধ্যে এক ভগ্নী যে গ্রামে খামারে পালিত হইয়াছিল সে বেশ শক্ত-সমর্থ হইয়া উঠে এবং তাহার সহরবাসী যমজ ভগ্নী যাহাকে কঠিন কাজ কিছুই করিতে হয় নাই সে ভগ্নী অপেক্ষা তাহার প্রায় ১৫ সের ওজন বেশী হইয়াছিল।

আর এক যমজ ভগ্নীদ্বয়ের মধ্যে একজন গ্রামে খামারে পালিত হইয়াছিল। পরে এক কৃষকের পত্নী এবং কয়েকটি সন্তানের মা হইয়া দুঃখ দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবন কাটায়। তাহার যমজ ভগ্নীর বিবাহিত জীবন স্বচ্ছন্দ ও আরামের ছিল। প্রথম ভগ্নীর ওজন দ্বিতীয়ের অপেক্ষা প্রায় ৫ সের কম হইয়াছিল। সুখে যে জীবন কাটাইয়াছে তাহার সবগুলি দাঁতই সবল ও সুস্থ ছিল কিন্তু দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যাহার জীবন গিয়াছে তাহার কয়েকটি দাঁত পড়িয়া গিয়াছিল এবং অন্যগুলিও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল।

একজোড়া বয়স্ক যমজের মধ্যে একজন এমন স্থানে মানুষ হইয়াছিল যেখানে গলগণ্ডরোগের প্রাদুর্ভাব আছে। অন্যজন এমন স্থানে প্রতিপালিত হইয়াছিল যেস্থানে সে গলগণ্ড নিরোধক প্রচুর খাদ্য খাইতে পাইয়াছিল। ফলে প্রথমজন গলগণ্ড রোগে আক্রান্ত হয় কিন্তু দ্বিতীয় জন ঐ রোগমুক্ত থাকে। দ্বিতীয়টি প্রথমটি হইতে বেশী ভারী এবং কম চটপটে ছিল।

অন্য যমজের একজন সহরে বাস করায় সহুরে এবং গ্রামে বাস করায় গেঁয়ো হইয়া উঠিয়াছিল।

আর এক যমজজোড়ার মধ্যে একজনের খুব দুঃখকষ্ট গিয়াছিল এবং তাহার ফলে তাহার মধ্যে একটি নিশ্চিন্ত ভাব ছিল না এবং উৎকণ্ঠাযুক্ত ছিল কিন্তু তাহার ভগ্নী যে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল সে দুশ্চিন্তার আধিক্যে ভোগে নাই।

শিক্ষাগত কৃতিত্ব ও বুদ্ধির মধ্যে যমজদের ভিতর পার্থক্য দেখা গিয়াছিল। যমজদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাথমিক বিদ্যালয় অবধি পড়িয়াছিল কিন্তু তাহাদের যমজ ভ্রাতা বা ভগ্নীরা উচ্চ বিদ্যালয় অবধি পড়িয়াছিল। ইহার ফলেই তাহাদের শিক্ষা ও বুদ্ধির পার্থক্য ঘটিয়াছিল।

তাহা হইলে আমরা দেখিলাম পরিবেশের পার্থক্য মানুষের শরীরের

উপর ভাল বা মন্দ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, মানুষ মেজাজ এবং ব্যক্তিত্ব যে আবেষ্টনীর মধ্যে সে প্রতিপালিত হইয়াছে তাহাকেই প্রতিফলিত করে এবং অধিকদিন শিক্ষার ফলে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং বেশী জ্ঞান এবং সংবাদের অধিকারী হয়।

সাধারণত যমজ ভ্রাতাভগ্নীরা একই পরিবারে একসঙ্গেই প্রতিপালিত হয়, একই বিদ্যালয়ে পড়িতে যায় এবং একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকে। যমজদের মধ্যে দেহের মিল খুবই বেশী দেখা যায় এমনকি একই বা ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হইলেও দেহগত সাদৃশ্য প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে, কেবল পরিবেশের ফলে ওজনের কমবেশী হয় কিন্তু অন্যান্য দেহাবয়বের বৈশিষ্ট প্রায় একপ্রকারই থাকে। দেহের সমতার দিক হইতে ভাই ভাই যমজরাও অবিকল যমজদেরই মত, কেবল মাথার মাপে কিছু কম বেশী হয়।

পরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে বেশী দেখা যায় মানসিক ও শিক্ষাগত সামর্থ্যের উপর। যে অবিকল যমজরা এক সঙ্গে মানুষ হয় দেহের সমতার ন্যায় তাহাদের মানসিক সামর্থ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতাও সমান হয়। মানসিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় ভাই ভাই যমজদের মধ্যে অতটা মিল দেখা যায় না। কিন্তু ভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত অবিকল যমজদের মানসিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সাদৃশ্য ভাই ভাই যমজদের অপেক্ষাও কম হয়। বুদ্ধির বিকাশের প্রেরণা এবং শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ ভিন্ন পরিবেশে কমবেশী মাত্রায় থাকায় বুদ্ধির ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় অবিকল যমজরা নিজেদের সমতা হারাইয়া ফেলে। একই পরিবেশে মানুষ হইলে মিলের যে আধিক্য থাকিত ভিন্ন পরিবেশের শক্তিশালী প্রভাব তাহা অনেক কমাইয়া দেয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখিবার আছে। একই পরিবারে প্রতিপালিত ভাইবোনেরা যাহারা একই বিদ্যালয়ে পড়িতে যায় এবং একই পরিবেশে মানুষ হয় তাহাদের মধ্যে বুদ্ধি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যে সাদৃশ্য দেখা যায় তদপেক্ষা সাদৃশ্য ভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত হইলেও অবিকল যমজদের মধ্যে থাকে।

এইসব অনুসন্ধানের ফলে আমরা দেখিতেছি যে বংশগতি এবং পরিবেশ

উভয়েই শক্তিশালী। তবে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর পরিবেশের প্রভাব ততটা নয় যতটা বুদ্ধি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর।

বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বনাম মানসিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা।

প্রায় প্রত্যেক দেশের দেশবাসীরা তাহাদের পুত্রকন্যাদের জন্য বিদ্যালয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছে। তাহারা বিশ্বাস করে যে বিদ্যালয় একটি উত্তম পরিবেশ যেখানে থাকিয়া তাহাদের ছেলেমেয়েদের মন, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র এবং স্বাস্থ্যের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটিবে।

বিদ্যালয় পরিবেশের উপকারিতা যাচাই করিবার জন্য ইংল্যাণ্ডে চারদল ছেলেমেয়েদের লইয়া একটি অনুসন্ধানের কাজ করা হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম দলের ছেলেমেয়েরা দৈহিক ত্রুটিযুক্ত ছিল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলে আদিবাসী জিপসী এবং ক্যানালবোটের ছেলেমেয়েরা এবং চতুর্থ দলে অনগ্রসর ছেলেমেয়েরা ছিল। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির দীর্ঘতা এবং মানসিক ও শিক্ষাগত সামর্থ্যের একটি সম্বন্ধ আছে। অন্য কথায় বলা যায় ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় পরিবেশে যত বেশী থাকে তাহাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান তত বেশী হইতে দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্জন পার্বত্য অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের লইয়া পরীক্ষা করিয়া অনুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ বিচ্ছিন্ন এলাকায় বিদ্যালয়গুলির অবস্থা খুবই খারাপ ছিল এবং উপস্থিতির সংখ্যাও খুব কম হইত। এইরূপ একটি সমাজে বিদ্যালয়গুলির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করা হইয়াছিল এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ বর্ধন হওয়ায় উপস্থিতির সংখ্যাও সন্তোষজনক হইতে লাগিল। মানসিক অভীক্ষা গ্রহণ করিয়া দেখা গেল যে তাহাদের মানসিক সামর্থ্য বাড়িয়াছে এবং অভীজ্ঞায় তাহাদের কৃতকার্য তাহাদের বয়সের মানের সমান হইয়াছে অর্থাৎ যে বয়সে যতটা করা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব তাহা তাহারা পারিয়াছে।

এই তথ্যগুলির সাহায্যে বিদ্যালয় যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি। ছাত্রছাত্রীদের বৌদ্ধিক ও শিক্ষাগত মান উন্নত রাখিবার

জন্য শিক্ষকের কাজের গুরুত্ব ও মর্যাদাও এই প্রসঙ্গে জানা যায়। ছেলে-মেয়েরা দেহে বাড়িতে পারে এবং শক্তিশালী হইতে পারে কিন্তু শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ না করিলে তাহাদের দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতার বৃদ্ধি ঘটে না।

শ্রেণীতে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বয়োকনিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের সামর্থ্যের পার্থক্য।

বয়স বেশী হইলেই লেখাপড়ায় পারদর্শিতা জন্মায় না। সেইজন্য শ্রেণীতে বয়োজ্যেষ্ঠদের অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠরাই লেখাপড়ার কাজে বেশী সামর্থ্য দেখায়। একথা সত্য যে বয়োকনিষ্ঠদের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠরা অধিক জীবনযাপন করিয়াছে, লেখাপড়া শিখিবার অধিক সুযোগ পাইয়াছে এবং সাধারণত তাহাদের বেশী করিয়া যত্ন লওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের বংশগতির সীমানা ছাড়াইয়া তাহারা অগ্রসর হইতে পারে নাই এবং অধিক সামর্থ্যের উত্তরাধিকার লইয়া যে সকল মেধাবী অথচ অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা আসিয়াছে তাহারা বয়োজ্যেষ্ঠদের ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণীতে ১৫ জন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ১৫ জন সর্বাপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ ছাত্রদের লইয়া একটি পরীক্ষা করা হইয়াছিল। বয়সে বড় ছেলেরা ছোটদের চেয়ে গড়ে প্রায় ৪ বছরের বেশী বড় ছিল এবং ছোটদের চেয়ে প্রায় ৪ বছর বেশী বিদ্যালয়ে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছে কিন্তু তবুও ছোটদের চেয়ে তাহারা মানসিক বৃদ্ধিতে দেড় বছরের মত পিছাইয়া ছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অধিকতর শিক্ষাদীক্ষা এবং অধিকতর জীবনের অভিজ্ঞতাও তাহাদের অন্তর্নিহিত দৈন্যকে পরাভূত করিতে পারে নাই। ছোটদের শ্রেষ্ঠতাও তাহা হইলে তাহাদের অন্তর্নিহিত সম্পদের ফল কেননা তাহারা তাহাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য বড়দের মত সময় পায় নাই। এই পার্থক্য ক্রমেই বাড়িতে থাকে এবং পরিণত বয়সে ইহারা দুই বিভিন্ন দলে ভাগ হইয়া যায়।

এই তথ্য জানা শিক্ষকের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। তাঁহাকে উপলব্ধি

করিতে হইবে যে শিখিবার ক্ষমতা সব ছেলেমেয়ের সমান নহে এবং শিক্ষাদান সকলের উপর সমানভাবে ফলপ্রসূ হয় না। কেহ কেহ বুদ্ধিতে ও শিক্ষায় অন্যদের অপেক্ষা অনেক বেশী তাড়াতাড়ি আগাইয়া যায় এবং অধিক পরিমাণে শিখিতে পারে। তাঁহাকে বুঝিতে হইবে এই পার্থক্য প্রকৃতিজাত। এই জ্ঞান হইলে শিক্ষক বুঝিবেন যে অল্পবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের ধৈর্যের সহিত ধীরে ধীরে শিক্ষাদান করিতে হইবে এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের তাহাদের উপযোগী চিত্তাকর্ষক এবং প্রেরণাদায়ক কাজকর্ম দিতে হইবে। তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে প্রকৃতির উপর যাওয়া সম্ভব নহে তবে প্রকৃতির সহিত সহযোগিতা করিয়া তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের যতদূর বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

আর একটি পরীক্ষা।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে আগত সৈনিকদের বুদ্ধি মাপিবার জন্য মানসিক অভীক্ষার প্রয়োগ করা হইয়াছিল। দেখা গেল যে বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে আগত সৈনিকদের মধ্যে মানসিক সামর্থ্যের বেশ পার্থক্য দেখা যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য খুবই বেশী।

এই পার্থক্যের কারণ দেখা গেল বিভিন্ন রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত। বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিদ্যালয়গুলির অবস্থা বিভিন্ন। কোন কোন রাষ্ট্রে ছেলেমেয়েদের শিখিবার সুযোগ সুবিধা বেশী ছিল, শিক্ষকদের শিক্ষাদীক্ষার মান উচ্চ ছিল, বিদ্যালয় বেশীদিন ধরিয়া বসিত এবং বিদ্যালয়ের সাজসরঞ্জামও উৎকৃষ্ট ছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎকর্ষতা অপকর্ষ-তার ক্রম অনুযায়ী সাজাইয়া লওয়া হইল। অনুরূপভাবে, অভীক্ষায় প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের ক্রম অনুসারে সৈনিকদের শ্রেণী বিন্যাস করা হইল, দেখা গেল এই দুই ক্রমের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যে সব রাষ্ট্রে উত্তম বিদ্যালয় আছে তথাকার সৈনিকরা সবচেয়ে বেশী সাফল্যাঙ্ক পাইয়াছিল এবং যে সব রাষ্ট্রের বিদ্যালয় ব্যবস্থা খুবই নিম্ন শ্রেণীর তথা হইতে আগত সৈনিকরা সবচেয়ে কম সাফল্যাঙ্ক পাইয়াছিল।

ভাল বিদ্যালয়ের শিক্ষা মানুষের সাধারণ সামর্থ্যের উপর কিরূপ ফলপ্রসূ

হয় উপরের উদাহরণে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সব রাষ্ট্রে ভাল বিদ্যালয় আছে তথাকার লোকেদের মানসিক সামর্থ্য বেশী এবং যে সব রাষ্ট্রের বিদ্যালয় খারাপ তথাকার অধিবাসীদের মানসিক সামর্থ্যও কম।

এই বিষয়টিকে অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়াও দেখা যায়। বিদ্যালয় মানুষের বুদ্ধির সৃষ্টি করে না, মানুষই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি করে। উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন লোকেরা ভাল স্কুল চায় এবং ভাল স্কুলকে বজায় রাখে কিন্তু স্বভাবত কম বুদ্ধির লোকেরা ঐরূপ ভাল স্কুল চায় না এবং দিলেও রাখিতে পারে না। অন্যকথায় স্কুল যেইরূপ, লোকেরা সেইরূপ না বলিয়া, লোকেরা যেইরূপ স্কুলও সেইরূপ বলাই যুক্তিসঙ্গত।

সুতরাং এক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে মানুষের বিকাশ ও সামর্থ্যকে ঘটাইয়া তুলিবার ব্যাপারে বংশগতি ও পরিবেশের শক্তি উভয়ই একই সাথে কাজ করে, সেই কারণে দুই রকমের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। সুতরাং দুইয়ের শক্তিরই গুরুত্ব মানা উচিত। দুই শক্তির মধ্যেই পারস্পরিক আদান প্রদান রহিয়াছে।

বংশগতি ও পরিবেশের আপেক্ষিক শক্তি।

আমরা জানি যে দেহের আয়তন, অনুপাত, চোখের রঙ এবং অবয়ব, নার্ভতন্ত্রের গঠন, মস্তকের আকার ও আয়তন এবং অন্যান্য শারীরিক বৈশিষ্ট্য জিন্‌সের দ্বারাই প্রধানত নির্ধারিত হয়। তবুও শরীরের অনেক কার্য পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

স্বাস্থ্য এবং পরমায়ু।

স্বাস্থ্য এবং পরমায়ুর উপর পরিবেশের প্রভাব দেখা যায়। চিকিৎসা ও নার্সিং বিদ্যার উন্নতির ফলে ও জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষার প্রচার ও প্রসারের ফলে টাইফয়েড, বসন্ত, ম্যালেরিয়া যক্ষ্মা, কলেরা ইত্যাদি ব্যাধির প্রকোপ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। শিশুমৃত্যুর হারও কমিয়াছে। মানুষের আয়ুও বাড়িয়াছে। এইগুলি বংশগতির দ্বারা হয় নাই। উত্তম লালন পালন এবং স্বাস্থ্য রক্ষার বন্দোবস্তর দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

উত্তম লালন পালনের দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষায় ও আয়ুবর্ধনে বিস্ময়-কর পরিবর্তন আনা সম্ভব হইলেও দেখা গিয়াছে ইহার ফল মধ্য বয়স অবধি টেকে। উত্তম লালন পালনের দ্বারা অনেক বেশী লোককে মধ্য বয়স অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স অবধি বাঁচাইয়া রাখা যায় কিন্তু তাহার পরে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন নির্ভর করে পিতামাতা ও পূর্বপুরুষেরা কিরূপ স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবী ছিল তাহার উপর; লালন পালনের ক্রিয়া আর তেমন খাটে না।

সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় মানুষের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রধানত বংশগতি দায়ী এবং অপর কতকগুলির জন্য প্রধানত দায়ী পরিবেশ। চোখের বর্ণ, মাথার প্রস্থ, আঙ্গুলের ছাপের ধাঁচ, যৌবনাগমের বয়স এবং দৈর্ঘ খুব সম্ভবত জিন্সের দ্বারাই প্রধানত নির্ধারিত হয়। কিন্তু মেজাজ, স্বভাব, আদর্শবাদ এবং বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে মনোভাব সম্ভবত পরিবেশের দ্বারাই বেশী প্রভাবান্বিত হয়।

চরিত্র, ব্যক্তিত্ব এবং মানসিক স্বাস্থ্য।

ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতাই তাহার নৈতিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন করে। ইহার জন্য তাহার বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত দৈহিক কোষ, মাংসপেশী ও নার্ভতন্ত্র দায়ী নহে। পরিণত বয়স অপেক্ষা শৈশব কালই চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের কাল। অবশ্য একথা মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশের সব দিক সম্বন্ধেই খাটে।

শিশুদের ব্যক্তিত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গৃহের প্রভাব অপরিসীম। গৃহের লোকেরা যদি সংসারের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারে তাহা হইলে গৃহের ছেলেমেয়েরাও সমাজের সহিত সার্থক অভিযোজন করিতে সক্ষম হয়, ইহার বিপরীত অবস্থায় তাহারা সমাজের সহিত ভালভাবে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে না।

বিদ্যালয়ও এ বিষয়ে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু সম্ভবত গৃহের মত অতটা নয়। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব এবং তাহার পদ্ধতি শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের

শুভ বা অশুভ পরিণাম ঘটাইতে পারে। গৃহ ও বিদ্যালয়ের প্রভাবকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে সুস্থ ও সুখী আচরণ প্রধানত সুস্থ অভিজ্ঞতা এবং শুভ প্রভাবেরই ফল।

সঙ্গীতকলা প্রদর্শন, দৈহিক কসরৎ প্রদর্শন এবং গাণিতিক কৌশল প্রদর্শন —এই সবের মধ্যে যে আচরণ প্রকাশ পায় তাহা খুবই জটিল। এইরূপ কলাপূর্ণ বা কৌশলপূর্ণ আচরণ নির্ভর করে বংশগতি হইতে প্রাপ্ত সামর্থ্যের উপর।

ব্যক্তিত্ব কল্যাণকর বা অকল্যাণকর হইতে পারে কিন্তু দুইপ্রকার ব্যক্তিত্বের গঠনই খুব জটিল। কিন্তু এইরূপ জটিলতা থাকা সত্বেও ব্যক্তিত্ব গঠনে বংশগতির বা শারীরিক অবয়ব ও প্রকৃতিজাত সামর্থ্যের অবদান ততটা নাই যতটা আছে পরিবেশের বা অতীত অভিজ্ঞতার।

আবার এমন কতকগুলি প্রমাণ আছে যাহাতে মনে হয় যে খারাপ আচরণ করিবার প্রবণতা নিহিত থাকে জীবদেহে। প্রত্যেক জোড়ার একজন অপরাধী এইরূপ ১৩৭ জোড়া অবিকল যমজকে লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। দেখা গেল ১৮ জন বাদে প্রত্যেক জোড়ার অপর ব্যক্তিও অপরাধী; অর্থাৎ ১১৯ জোড়ার মধ্যে জোড়ার উভয়েই অপরাধী এবং ১৮ জোড়ার মধ্যে জোড়ার একজন অপরাধী কিন্তু অন্যজন নহে। আবার ২৭২ জোড়া ভাই ভাই যমজকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল ১০২ জোড়ার উভয়েই অপরাধী এবং অবশিষ্ট ১৭০ জোড়ার মধ্যে প্রত্যেক জোড়ার একব্যক্তি দুষ্ক্রিয়কারী। তাহা হইলে অবিকল যমজদের অনুপাত দাঁড়ায় ১১৯ : ১৮, বা প্রায় ৬·৬ : ১ এবং ইহার তুলনায় ভাই ভাই যমজদের অনুপাত ১০২ : ১৭০ বা ·৬ : ১ হয়। অন্যকথায়, ভাই ভাই যমজদের তুলনায় অবিকল যমজদের মধ্যে ১১ গুণ বেশী সংখ্যক দুষ্ক্রিয়কারী জোড়া দেখা গিয়াছিল।

ইহার ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র বংশগতি হইতে প্রাপ্ত দেহাবয়বের অনুগামী হয়। আমরা জানি অবিকল যমজদের বংশগতির সমতা ভাই ভাই যমজদের অপেক্ষা বেশী এবং অবিকল যমজদের অধিকসংখ্যক জোড়ার মধ্যে জোড়ার উভয়ই অপরাধী। যদিও আপাতদৃষ্টিতে বংশগতির প্রভাবই ইহাতে বেশী দেখা যায় কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ভাই ভাই যমজ

অপেক্ষা অবিকল যমজরা আরও ঘনিষ্ঠভাবে জীবনযাপন করে এবং তাহাদের পরিবেশের মধ্যেও বেশী মিল থাকিবার সম্ভাবনা। সুতরাং অবিকল যমজদের বংশগতিলব্ধ দেহাবয়বের সাদৃশ্য অপেক্ষা পরিবেশের এবং অভিজ্ঞতার সাদৃশ্যই জোড়ার উভয়ের দুষ্ক্রিয়তার কারণ।

অবশ্য প্রশ্নটি খুবই জটিল। আমরা এইভাবে ধরিয়া লইতে পারি যে পরিবেশের প্রভাবেই চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে তবে পরিবেশের সহিত লেনদেনের প্রকৃতি মানুষের দেহাবয়বের উপরও নির্ভর করে। তাহার নার্ভতন্ত্র, ইন্দ্রিয়-স্থান, গ্রন্থি, পেশী এমন কি অস্থি সংস্থানও পরিবেশের সহিত অভিযোজনে সক্রিয় হইয়া উঠে এবং চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে।

বিদ্যালয়, শিক্ষক এবং শিশু।

বংশগতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা শেষ হইল। এখন আমরা বিবেচনা করিব বিদ্যালয় এবং শিক্ষকের দিক দিয়া আমরা কি শিক্ষা-লাভ করিলাম। এইকথা জানা গেল যে শিশুর চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, স্বাস্থ্য এবং বুদ্ধির বিকাশে বিদ্যালয়ের স্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের প্রকৃতি অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের উপকার বা ক্ষতি দুইই হইতে পারে।

ভাল বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার উত্তম ব্যবস্থা থাকিবে। পর্যবেক্ষণের দ্বারা শিক্ষক তাঁহার ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা লক্ষ্য করিবেন এবং স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যাহা করণীয় সে বিষয়ে সজাগ থাকিবেন।

তাহা ছাড়া, বিদ্যালয়ের সুশিক্ষা ও সুনিয়মের প্রভাবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক ঐক্যবোধ এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে। সুস্থ পরিবেশে থাকিয়া তাহাদের মধ্যে সামাজিক সৌজন্যবোধ এবং অভিযোজন ক্ষমতা বাড়িবে।

ভাল শিক্ষার গুণে ছাত্রছাত্রীরা স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান এবং নানাবিধ সংবাদ অর্জন করিতে পারিবে এবং শিখিবার জন্য কৌতূহল বাড়িয়া যাইবে। তাহাদের শিখিবার আগ্রহ এত তীব্রভাবে উদ্রিক্ত হইবে যে নিরুৎসাহ ও ঔদাসিন্যের মধ্যেও সে তীব্রভাব হ্রাস হইবে না। সুতরাং নিশ্চিত ও অবিসম্বাদিতভাবে ছাত্রছাত্রীদের উপর ভাল বিদ্যালয়ের প্রভাব কল্যাণকর ও

শুভ পরিণামের কারক হয় এবং খারাপ বিদ্যালয় ও নিকৃষ্ট শিক্ষকের প্রভাব তাহাদের পক্ষে অকল্যাণকর ও ক্ষতিকারক হয়।

তবে বিদ্যালয় ভাল হইলেই যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী সুশিক্ষিত ও সুচরিত্র হইয়া উঠিবে তাহা আশা করা যায় না। ভাল স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও কোন কোন ছাত্র তবুও অসুস্থ হইয়া পড়িবে। ভাল আদর্শ ও শিক্ষা সত্ত্বেও কেহ কেহ খারাপ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইবে এবং কাহারও কাহারও মধ্যে মন্দ ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিবে। শিক্ষকের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কাহারও কাহারও অবাঞ্ছিত অভ্যাস লোপ করা এবং তৎপরিবর্তে সুঅভ্যাস গঠন করা যাইবে না। একই আদর্শ শিক্ষার অধীনে থাকিয়াও ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য ঘুচিবে না। শিক্ষার পরিমাণের মধ্যেও তফাৎ থাকিবে। যত ভাল শিক্ষাদান করাই হউক না কেন বুদ্ধির এবং শিক্ষার পরিমাণের পার্থক্য কমান যাইবে না। খুব ভাল বিদ্যালয় হইতেও কতকগুলি অল্পবুদ্ধি ও অল্পজ্ঞান সম্পন্ন ছাত্র ছাত্রী পাস করিয়া যাইবে এবং খুব নিকৃষ্ট বিদ্যালয় হইতেও অত্যন্ত মেধাবী এবং শিক্ষিত বিদ্যার্থী পাস করিয়া যাইবে।

এই সব সত্যকে মানিয়া লইয়াও পরিবেশের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তিবিশেষকে না ধরিয়া যদি বিদ্যার্থীদের দল হিসাবে ধরা যায় তাহা হইলে তাহাদের উপর সামগ্রিকভাবে ভাল বিদ্যালয় ও শিক্ষকের প্রভাব কল্যাণকর ও শুভ হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের উপরও তাহাদের প্রভাব পড়ে। শিক্ষক যে তাহার ছাত্র ছাত্রীদের উপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিবার সুযোগ পান তাহার জন্য তাঁহার গর্ববোধ হওয়া উচিত। যে সব ছাত্রছাত্রী অমনোযোগী, অলস এবং অজ্ঞান তাহাদের তিনি মনোযোগী, পরিশ্রমী ও জ্ঞানী করিয়া তুলিতে পারেন। ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়কে ভালবাসিবে বা ঘৃণা করিবে তাহা তাঁহারই উপর নির্ভর করে।

চতুর্থ অধ্যায়

সহজাত প্রবৃত্তি

মনুষ্যেতর প্রাণীদের ভিতর দেখা যায় তাহারা প্রবৃত্তিবসে অনেকটা যান্ত্রিকভাবে কাজ করিয়া যায়; যাহারা যত নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী তাহাদের মধ্যে প্রবৃত্তির অপরিবর্তনীয়তা তত বেশী। বুদ্ধির যতই বিকাশ হইতে থাকে ততই দেখা যায় প্রবৃত্তির বহু রূপান্তর ঘটিতে থাকে, প্রবৃত্তিজাত মৌলিক আচরণ পরিবেশের সঙ্গে মানাইয়া লইয়া অভিনব আচরণে পরিবর্তিত হয়। এখন শিক্ষকের সামনে প্রশ্ন এই যে প্রাণীদের খাদ্যান্বেষণ প্রবৃত্তি, ঘর বাঁধিবার প্রবৃত্তি, যৌন ও বাৎসল্য প্রবৃত্তি এবং আক্রমণ, পলায়ন ইত্যাদি অন্যান্য প্রবৃত্তির ধারা কি ক্রমাভিব্যক্তির পথে মানুষের মধ্যেও থাকিয়া গিয়াছে? মানুষের সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, নৈতিক ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে দয়া, দাক্ষিণ্য, সাধুতা, সেবা, এই সব উচ্চভাব ও পূণ্যকর্মে এবং চুরী, ডাকাতি, ব্যভিচার, অত্যাচার. হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি কলুষিত ভাব ও কর্মের মধ্যে জৈবিক প্রবৃত্তির প্রেরণা কি আছে? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নহে। মানুষের আচরণ যতই উন্নত ও জটিল হউক এবং পরিবেশের ফলে মানুষের মধ্যে নিত্য নূতন প্রবৃত্তির সৃষ্টি হইতেছে ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও মানুষের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব নাই এ কথা বলা যায় না। সেইরকম অন্যদিকে আবার এই প্রবৃত্তিগুলিই মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের একমাত্র বুনিয়াদ তাহাও স্বীকার করা সম্ভব নহে। মোট কথা পরিবেশ হইতে অর্জিত চাহিদাগুলির সহিত সহজাত প্রবৃত্তিগুলি এতই মিলিয়া মিশিয়া যায় যে সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে আর আলাদাভাবে চিনিতে পারা যায় না। উদাহরণ দেওয়া যায়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নর কোন সহজ প্রবৃত্তির কথা জানা নাই। সভ্যসমাজের শিক্ষার ফলেই এই বোধ জন্মে এবং মানুষের মনে এই বিষয়ে একটি স্থায়ী প্রবণতা বা অভ্যাসের সৃষ্টি হয় এবং তাহা সহজাত প্রবৃত্তির মতই জোরাল হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার প্রবৃত্তি যাহার

মধ্যে প্রবলভাবে সৃষ্টি হইয়াছে সে অপরিষ্কার সহ্য করিতে পারে না—পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করিবার কাজে লাগিয়া যায়। নিয়ম মানিয়া চলা, ব্রহ্মচর্য পালন করা এইরূপ পরিবেশ বা সমাজ সংস্কৃতি হইতে অর্জিত চাহিদা বা প্রবণতার উদাহরণ ভুরি ভুরি দেওয়া যায়। প্রধানত, এই সব প্রবণতার একটি সুসমঞ্জস্য কাঠামো লইয়াই মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গড়িয়া উঠে।

তবে শৈশবে বলা যাইতে পারে সহজাত প্রবৃত্তিগুলির প্রাধান্য কিছু বেশী থাকে। ছয় সাত বৎসর বয়সের শিশুও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার চাইতে মাঠে ঘাটে ধূলা কাদা মাখিয়া খেলিতে ভালবাসে, নিয়ম মানিবার চেয়ে অনিয়মই তাহারা বেশী পছন্দ করে। সুতরাং যখন পরিবেশ তাহার দাবী বা চাহিদাগুলি পুরাপুরি চাপাইয়া দিতে পারে নাই সেই শৈশবকালে সহজাত প্রবৃত্তিগুলির প্রকাশকে একটু ভালভাবে দেখা যায়। শিক্ষকের এই প্রবৃত্তিগুলির সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন কারণ শিক্ষার লক্ষ্যের দিকে প্রবৃত্তির শক্তিকে লইয়া যাওয়া তাঁহার দায়িত্ব। কোন প্রবৃত্তিকে পুষ্ট হইতে পুষ্টতর করিতে হইবে, কোন প্রবৃত্তিকে মার্জিত করিয়া সামাজিক রূপ দিতে হইবে এবং কোন প্রবৃত্তির শক্তিকে প্রতিকল্প প্রবৃত্তির খাতে বহাইয়া দিতে হইবে। যতদূর সম্ভব শিক্ষাদান সহজাত প্রবৃত্তির অনুগামী করিতে হইবে কেননা সহজাত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে চলিলে ছাত্রছাত্রীদের স্বভাব বিপর্যস্ত হইয়া যায় এবং শিক্ষার প্রযত্ন ব্যর্থ হয়।

সহজাত প্রবৃত্তি কয়টি ইহা লইয়া বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এখানে ঐ সব আলোচনার মধ্যে যাওয়া হইবে না। ম্যাকডুগালের বর্ণিত সহজাত প্রবৃত্তিগুলির কথা সংক্ষেপে আমরা আলোচনা করিব।

ম্যাকডুগাল বর্ণিত সহজাত প্রবৃত্তির তালিকা

সহজাত প্রবৃত্তি	সহগামী প্রক্ষোভ
১। পলায়ন	ভয়
২। যুযুৎসা	ক্রোধ
৩। বিকর্ষণ	বিরক্তি

৪।	বাৎসল্য	মমতা
৫।	অনুনয়	মনোবেদনা
৬।	রতি	কাম
৭।	কৌতূহল	বিস্ময়
৮।	বশ্যতা	হীনমন্যতা
৯।	আত্মজাহির	আত্মগৌরব
১০।	দলভুক্তি	একাকীত্ববোধ
১১।	খাদ্যান্বেষণ	ক্ষুধা
১২।	সঞ্চয়	স্বত্ববোধ
১৩।	নির্মাণ	সৃজনী স্পৃহা
১৪।	হাস্য	আমোদ

এই চৌদ্দটি সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়াও পরে তিনি মানুষের বেলায় আরও কয়েকটি যোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে প্রাণীদের এবং মানুষের সমস্ত প্রকার আচরণের উৎস এই প্রবৃত্তিগুলি। ইহারাই সমস্ত প্রকরি আচরণকে নির্ধারিত করে। মানুষের সামাজিক ও নৈতিক আচরণ কোন স্বর্গীয় উৎস হইতে আসে না এবং সামাজিক বিধি ও নীতি এই প্রবৃত্তিগুলি হইতে সম্পর্কহীন কোন নূতন আচরণ সৃষ্টি করিতে পারে। মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের ভিত্তিমূলে এই প্রবৃত্তিগুলি। তখনকার দিনে তাঁহার এই আবিষ্কার সভ্যসমাজে খুব আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ম্যাকডুগালের মতে এই প্রবৃত্তিগুলি বিভিন্ন দেহাবয়বের বৃদ্ধি, বিকাশ, পরিপক্কতা এবং কার্যকারীতার উপর নির্ভর করে। প্রবৃত্তিগুলি সাধারণতঃ সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং প্রয়োজন হইলে আত্মপ্রকাশ করে। কি অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে তাহা তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা একটি উদাহরণ সাহায্যে বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ধরা যাউক, কয়েকজন যুবক সদ্য মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের খেলা দেখিয়া ফিরিতেছে। ঐদিন খেলা ড্র গিয়াছে। তাহারা বিভিন্ন খেলোয়াড়ের খেলার দোষগুন লইয়া সমালোচনা করিতেছিল। ইষ্টবেঙ্গলের পক্ষপাতী

একজন যুবক মোহনবাগানের জনৈক খেলোয়াড়ের বিরূপ সমালোচনা করিলে মোহনবাগান-পন্থী যুবকটির তাহা ভাল লাগিল না এবং সে তাহার প্রতিবাদ করিল কিন্তু প্রতিবাদ গ্রাহ্য করা হইল না এবং ক্রোধের মাত্রা বাড়িবার ফলে কথা কাটাকাটি হইতে হইতে দুইদলে হাতাহাতি লাগিয়া গেল।

উপরের ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করা যাউক। যুবকদের মধ্যে কাহারই প্রথমে যুদ্ধ স্পৃহা ছিল না। এই যুযুৎসা প্রবৃত্তি কি অবস্থায় আবির্ভূত হইল? মোহনবাগান-পন্থী এবং ইষ্টবেঙ্গল-পন্থী যুবকদ্বয় তাহাদের আলোচ্য খেলোয়াড় সম্বন্ধে তাহাদের মনের যে ইচ্ছা তাহার বিরোধিতা করা হইতেছে অনুভব করিল তখন বিরোধকারী ব্যক্তিকে শত্রু হিসাবে প্রত্যক্ষ করিল। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে হয় পরিবেশের মধ্যে যুযুৎসা প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করিবার উপযোগী উদ্দীপককে প্রত্যক্ষ করিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সাধারণতঃ সুপ্ত প্রবৃত্তিকে জাগাইতে হইলে বা ক্রিয়াশীল করিতে হইলে পরিবেশের মধ্যে উপযোগী উদ্দীপক থাকা চাই এবং শুধু থাকিলেই চলিবে না তাহাকে অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে তবেই নির্দিষ্ট প্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল হইবার উপক্রম করিবে। যখনই উদ্দীপক প্রত্যক্ষগোচর হইল তখনই দেখা যায় ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রক্ষোভের সঞ্চার হয়। এইক্ষেত্রে বিরুদ্ধ পক্ষকে শত্রু হিসাবে অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে উষ্মা এবং পরিকোপের সঞ্চার হইয়াছিল। প্রক্ষোভকে এক কথায় বলা যায় শরীর ও মনের উত্তেজিত অবস্থা। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম যে পরিবেশের মধ্যে নির্দিষ্ট উদ্দীপককে প্রত্যক্ষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং এই প্রক্ষোভ কোন বিশেষ আচরণকে উদ্দীপ্ত করে। এইক্ষেত্রে ক্রোধের সঞ্চারে মারামারি লাগিবার উপক্রম হইল এবং মারামারি লাগিল। এইরূপে যুযুৎসা প্রবৃত্তির পরিপূর্ণ কার্যক্রম সমাধা হইল।

পরিবেশের মধ্যে উদ্দীপককে প্রত্যক্ষ করা	→প্রক্ষোভ সঞ্চার	→কার্যের প্রেরণা বা কার্য করা

প্রবৃত্তির কার্যক্রমের একটি নক্সা উপরে দেওয়া হইল। এইবার প্রবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব।

পলায়ন। (Escape)

পলায়ন কার্যটি এত সাধারণ যে ইহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। ইহার সহগামী প্রক্ষোভ ভয়। খুব সম্ভব, ভয়ের উৎপত্তি উচ্চ ও গভীর শব্দের অনুভূতি হইতে অথবা যাহা কিছু অদ্ভূত ও অনির্দিষ্ট তাহা ভয়ের সঞ্চার করে। শূন্যে রাখিয়া কোন কোন শিশুকে হঠাৎ আশ্রয়হীনভাবে রাখিলে তাহারা ভয় পায়। সুতরাং আশ্রয়হীনত্বও ভয়ের কারক। অনেক মনোবিদের মতে প্রধান কারণ আকস্মিকতা। পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ কিছু পরিবর্তন ঘটিলে শিশুদের ভয় পাইতে দেখা যায়। সেইজন্য হঠাৎ মেঘগর্জন বা প্রখর বিদ্যুতালোকে তাহারা ভয় পায়।

ভয়ের সময়ে শরীরাভ্যন্তরে কয়েকটি পরিবর্তন ঘটে। এড্রেন্যাল নামক অবটুগ্রন্থি হইতে বেশী পরিমাণে রসক্ষরণ হইতে থাকে। ইহার ফলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বাড়িয়া যায় এবং দেহ অধিক পরিমাণে অম্লজান গ্রহণ করিতে পারে। লিভার গ্লাইকোজেনকে শরীরের গ্রহণোপযোগী চিনিতে পরিবর্তিত করে। ইহার ফলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে দেহের পেশীগুলিতে অম্লজান ও চিনির সরবরাহ বাড়িয়া যায়। অম্লজান এবং চিনির দহনক্রিয়া শরীরে শক্তি জোগায় কারণ দ্রুত পলায়নের জন্য অতিরিক্ত শক্তি দেহের প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া এড্রেন্যাল গ্রন্থীর রসক্ষরণ দৃষ্টি শক্তির প্রসার ঘটায় এবং মলমূত্র ত্যাগে সাহায্য করে। পলায়নের পক্ষে এইগুলির উপযোগিতা সহজেই বুঝা যায়।

স্বভাবত যাহা ভয়ের বিষয় নহে পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে তাহাও ভয়ের উদ্রেক করে। দেখা গিয়াছে যে সব প্রাণী পূর্বে মানুষ দেখিয়া ভয় পাইত না, পরে বন্দুকসহ মানুষ দেখিলে তাহারা ভয়ে পলাইয়া যায়। তাহারা বন্দুকের শব্দকে ভয় করে এবং মানুষের উপস্থিতিতে শব্দের উৎপত্তি অনুভব করিয়া পরে মানুষ দেখিলেই ভয় পায়। অনেক জিনিষ যাহা স্বভাবত ভয়ের বিষয় নহে তাহারা ভয়ের সহিত যুক্ত হইলে তাহারা নিজেরাই ভয়ের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। ভয় পাইলে যে সোজা পলায়নই ঘটিবে তাহা বলা যায় না। ভয়ের বস্তু হইতে পালয়নের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ

থাকিলে সরাসরি পলায়ন পরিত্যাগ করিয়া কেহ নিজেকে গাছের উপর বা ঝোপঝাড়ের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে পারে। পলায়ন প্রবৃত্তি পরাহত হইলে যুযুৎসা প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতে পারে। ধাবমান কুকুর কর্তৃক যখন বিড়াল কোনঠাসা হইয়া পড়ে তখন সে রুখিয়া দাঁড়ায়। এইরূপ ক্ষেত্রে পলায়ন প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়া যুযুৎসা প্রবৃত্তির আবির্ভাব হয়। এই জন্য বলা হয় যে প্রবৃত্তিজাত আচরণের কাঠামো অবস্থাবিশেষে অন্য আকার লইতে পারে।

যুযুৎসা। (Combat)

ইহার সহগামী প্রক্ষোভ ক্রোধ। যুযুৎসা প্রবৃত্তিকে একটি প্রাথমিক প্রবৃত্তি বলিয়া গণ্য করা হয় না। অন্য প্রবৃত্তির পরিপূরণে বাধার সৃষ্টি হইলেই যুযুৎসা প্রবৃত্তি জাগরিত হয়। ইহার প্রধান কাজ বাধার অপসরণ বা ধ্বংস সাধন। দেখা যায় কোন কুকুরের খাইবার সময় কোন অংশীদার আসিলে সে তাহাকে রাগিয়া গিয়া কামড়াইতে যায়। শিশুর কাজে বাধা দিলে প্রথমে সে বাধা অপসরণের চেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হইলে রাগিয়া গিয়া চিৎকার করে বা কাঁদা কাটা করে। বাছুর বিপদে পড়িয়াছে দেখিলে মাতা গরু শিং বাঁকাইয়া তাড়াইয়া আসে। আশ্রিত জনের উপর অত্যাচার হইতে দেখিলে আশ্রয়দাতা অত্যাচারীর শাস্তিবিধানের চেষ্টা করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে খাদ্যান্বেষণ, বাৎসল্য প্রবৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় যুযুৎসা প্রবৃত্তির আবির্ভাব হয়। অবশ্য যুযুৎসা প্রবৃত্তি একটি বিপজ্জনক প্রবৃত্তি। কথায় বলে রাগে অন্ধ হইয়া যাওয়া অর্থাৎ ক্রোধবশে চিন্তা ও যুক্তিশূন্য হওয়া। ক্রোধের অবস্থাতেও ভয়ের অনুরূপ শারীরিক পরিবর্তন ঘটে কারণ যুদ্ধ করিবার জন্য দেহের অতিরিক্ত শক্তির দরকার হয়। রক্তসঞ্চালন কম হওয়ায় মস্তিষ্ক ভালভাবে কাজ করিতে পারে না। ফলে অত্যধিক ক্রোধের সময় মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হইয়া পড়ে। ক্রোধের শক্তিকে ধ্বংসাত্মক কাজ হইতে মোড় ফিরাইয়া সামাজিক অন্যায় অবিচার ও উন্নতির বাধা অপসরণের দিকে লইয়া যাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আত্মশক্তি বা আত্মমর্যাদা বা অত্মগৌরবের সহিত ক্রোধ সংহত হইয়া তেজস্বীতা বা শৌর্যের সৃষ্টি করে যাহা সমাজের অগ্রগতির পক্ষে শুভ ও কল্যাণকর।

যুযুৎসা প্রবৃত্তি পরাজিত হইলে ভয়ের সৃষ্টি হয় এবং পলায়ন প্রবৃত্তিতে পর্যবসিত হয়।

বিকর্ষণ। (Repulsion)

ইহার সহগামী প্রক্ষোভ বিরক্তি। অনেকে কডলিভার তৈল মুখে দিয়াই ফেলিয়া দেন বা বমি করেন। গায়ে পোকামাকড় বা হড়হড়ে জিনিষ লাগিলে গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিই। বদ গন্ধ নাকে লাগিলে নাক চাপা দিতেই হয় এবং সেস্থান ত্যাগ করিতে হয়। এই সব বিরক্তিকর জিনিষকে দূর করিয়া দিতে চাই বা তাহাদের কাছ হইতে সরিয়া আসিতে চাই। এই বিকর্ষণ প্রবৃত্তির সাহায্যে যাহা কিছু নীচ ও ঘৃণ্য তাহাদের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইতে পারি।

বাৎসল্য। (Parental instinct)

ইহার সহগামী প্রক্ষোভ মমতা। নিজের বাচ্চাদের অসহায় অবস্থায় দেখিলে প্রাণীদের মধ্যে মমত্ববোধ জন্মে এবং ইহার ফলে তাহারা বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং লালনপালন করে। ইহা প্রাণী স্বভাবের গভীরে নিহিত একটি শক্তিশালী প্রবৃত্তি।

মানুষের মমত্ববোধ কেবল নিজের সন্তানেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তাহার অনেক প্রসার ঘটে। অসহায় বৃদ্ধ রোগী, দুর্বল ও অন্যলোকের সন্তানদের প্রতিও মানুষের মায়া মমতা কম নয়। আদিবাসী নির্যাতিক লোক, অসহায় প্রাণী, এমন কি সখের জিনিষ ও ক্ষণভঙ্গুর আসবাবপত্রের প্রতিও মানুষের মনকে মমতায় ভরাইয়া দেয়। এই মমত্ববোধ হইতেই রাষ্ট্র শিশু রক্ষা আইন, ফাক্টরী আইন, ক্রীতদাস উচ্ছেদ আইন, মৃত্যুদণ্ড লোপ করিবার আইন, বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষা আইন, খাদ্যে ভেজাল নিরোধ আইন ইত্যাদি কল্যাণকর আইনের প্রবর্তন করে। শিশুদের কল্যাণভবন, রোগীদের হাসপাতাল, উন্মাদাগার, ত্রাণকারী সমিতি, পিঁজরাপোল, জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিরোধক সমিতি, শিশু কল্যান সমিতি, বন্দী সাহায্য সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও সঙ্ঘের উদ্ভবও এই মমত্ববোধ হইতে হয়।

পিতামাতার মধ্যে বাৎসল্য প্রবৃত্তি থাকিবার ফলেই মানব শিশু তাহার দীর্ঘ অসহায় অবস্থায় পরবর্তী জীবনের জন্য নিশ্চিন্ততা ও স্নেহের মধ্যে নিজেকে তৈয়ারী করিবার সময় ও সহায়তা পায়। তাহার বৌদ্ধিক বিকাশেরও দীর্ঘ এবং বিচিত্র সুযোগ পায়। খেলার মধ্য দিয়া সে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারে। তাহা ছাড়া বিশ্বপ্রেমের বীজও এই প্রবৃত্তির মধ্যেই নিহিত থাকে। অন্যসব প্রবৃত্তির মধ্যেই ন্যূনাধিক আত্মতৃপ্তি বা আত্মস্বার্থের চরিতার্থতা হয় কিন্তু বাৎসল্যই একমাত্র প্রবৃত্তি যাহার মধ্যে শুধু পরের মঙ্গলের ইচ্ছাই বর্তমান থাকে। সুতরাং এই প্রবৃত্তিই নৈতিক আচরণের উৎস।

অনুনয়। (Appeal)

যুযুৎসা প্রবৃত্তি ব্যর্থ হইলে এই প্রবৃত্তির উদয় হয়। কোন কুকুর অন্য কুকুরদের সহিত লড়াইয়ে পরাজিত হইলে এবং পলাইবার কোন পথ না থাকিলে কিভাবে শুইয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। অবশ্য এই ভাবে ব্যর্থ হইলে মনে দারুন বেদনাবোধ জন্মে কিন্তু জয়ের আশা না থাকায় আত্মরক্ষার জন্য আত্মনিবেদন করিতেই হয়। এইরূপ অনুনয়ের উদ্দেশ্য জয়ী ব্যক্তিদের কাছ হইতে অনুগ্রহ বা সাহায্য পাওয়া অথবা পরিত্রাণ পাওয়া।

রতি। (Sex)

কৈশোর, যৌবন এবং পরিণত জীবনে রতি বা যৌন প্রবৃত্তির শক্তি খুবই প্রবল থাকে ; ইহার সহগামী প্রক্ষোভ কাম। বিপরীত লিঙ্গের শরীর প্রত্যক্ষ করিলে এই প্রবৃত্তির উদয় হয় এবং মৈথুন ক্রিয়ায় ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে।

রতিশক্তির উদগতি ঘটিলে ইহা চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, কাব্য ইত্যাদি, ললিত কলা এবং কারুশিল্পের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়।

কৌতূহল। (Curiosity)

ইহার সহগামী প্রক্ষোভ বিস্ময়। কিছুটা পরিচিত ও কিছুটা অপরিচিত

জিনিষ প্রত্যক্ষ করিলে এই প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। সম্পূর্ণ অজানা বা অপরিচিত জিনিষে হয় আমরা মন দিই না অথবা তাহা ভয়ের উদ্রেক করে। ছোট ছোট শিশুরা নূতন জিনিষ দেখিলে কিভাবে একবার কৌতূহলবশে আগাইয়া যায় আবার ভয়ে পিছাইয়া আসে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন।

নূতন পাঠদান বা নূতন শিক্ষামূলক কাজের প্রারম্ভে শিক্ষক এই প্রবৃত্তির সাহায্য লইলে পাঠদান সহজ ও স্বাভাবিক হয়। শিশুদের পক্ষে যাহা সম্পূর্ণরূপে জানা বা পরিচিত সে বিষয় লইয়া সবিস্তারে আলোচনা করিলে তাহারা তাহাতে তেমন মন দিতে চায় না এবং মন দিতে চেষ্টা করিলেও পূরাণ জিনিষের পুনরাবৃত্তিতে অবসাদগ্রস্থ হইয়া অমনোযোগী হইয়া পড়ে। অন্যপক্ষে, সম্পূর্ণ নূতন বিষয় যদি সোজাসুজিভাবে তাহাদের সম্মুখে ধরা হয় তাহাতেও তাহারা মনোযোগী হইতে পারে না কেননা তাহাদের জানা কোন কিছুর সহিত সম্বন্ধ না থাকায় তাহা নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য শিক্ষককে যাহা পরিচিত তাহা লইয়াই আরম্ভ করিতে হইবে। জানা বিষয়ে তাহাদের প্রশ্ন করিলে তাহারা সাগ্রহে তাহার উত্তর দেয় এবং তাহাদের আত্মজাহির করিবার প্রবৃত্তি তৃপ্ত হইবার সুযোগ পায়। আত্মপ্রসাদের ফলে তাহারা শিক্ষকের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত হয়; ঠিক এই ক্ষণে শিক্ষক বিষয়ের নূতনত্বের দিকটি অবতারণা করিবেন। এই নূতন বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাহাদের সাধ্য নয়, কাজেকাজেই এই বিষয়টি জানিবার জন্য তাহাদের কৌতূহল জাগিয়া উঠিবে এবং পুনরায় আত্মজাহির প্রবৃত্তি বশে নূতন জিনিষ শিখিতে অগ্রসর হইবে।

এই কৌতূহল প্রবৃত্তির বশেই মানুষ অজানাকে জানিয়াছে, নানা দেশবিদেশ আবিষ্কার করিয়াছে, কত অভিযানে বাহির হইয়াছে। এই প্রবৃত্তিই মানুষকে বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক অথবা দার্শনিক গবেষনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছে।

বশ্যতা। (Self submission)

সচরাচর এই প্রবৃত্তি তত শক্তিশালী ভাবে দেখা যায় না তবে চরিত্র

গঠনে ইহার যথেষ্ট প্রভাব আছে। ইহার প্রক্ষোভকে হীনমন্যতা বলা যাইতে পারে। নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কাহাকেও প্রত্যক্ষ করিলে এই প্রবৃত্তির জাগরণ হয়। এই অবস্থায় সমর্পণের ভাবে শরীরকে শিথিল করিয়া দিই এবং শ্রেষ্ঠতর ও মান্যতর ব্যক্তির নিকট স্বইচ্ছায় ও সানন্দে আত্মসমর্পণের ভাবে অগ্রসর হই। প্রভুর নিকট কুকুরের আত্মনিবেদন সকলেই দেখিয়াছেন।

বীরপূজা এবং দেবতার প্রতি ভক্তি এই প্রবৃত্তি হইতেই উপজাত হয়। মহৎ ও সৌন্দর্যময় চিত্রকলা, মনোরম স্থাপত্য শিল্প, শোভাময় প্রাকৃতিক দৃশ্য—এই সকলের সামনেও মানুষের চিত্ত শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসে। তবে মনের এই ভাবকে হীনমন্যতা বলিলে ঠিক বলা হয় না। মহান বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা মানুষকে তাহাদের সমীপে লইয়া যায়। সামিপ্য নয়, যদি মহতের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে নিজের মহত্বের উপলব্ধি হয় তবে সে উপলব্ধি হীনমন্যতা নয়, তাহা আত্মচরিতার্থতা। কুকুরও যখন আত্মনিবেদন করে তখন হীনমন্যতার দুঃখ ভোগ করে না। সে নিজেকে দিয়া প্রভুকেই পায় তাহাতে তাহার জীবন ভরিয়া যায়।

আত্মজাহীর। (Self-Assertion)

জীবন ক্রমাগতই নিজেকে বিস্তারিত, প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। জীবনের মূলেই এই প্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল হইয়া আছে। সুতরাং ইহাই স্বাভাবিক যে বৃদ্ধি ও বিকাশের সময় শিশুদের মধ্যে এই প্রবৃত্তি সতেজে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। ইহার সহগামী প্রক্ষোভকে আত্মগৌরব বা আত্মপ্রসাদ বলা যাইতে পারে। নিজের শ্রেষ্ঠত্বে আত্মবোধের বৃদ্ধি হয় এবং নিজের হীনত্বে আত্মবোধের লাঘব হয়। নিজ জাতির অন্যদের উপস্থিতিতে এই প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে এবং তাহাদের সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য নিজের রূপ-গুণ-শক্তি-সামর্থ্যকে প্রদর্শন করিবার জন্য এই প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করে। এই প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই নানা রূপসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ও প্রসাধনমণ্ডিত হইয়া বালক বালিকারা এবং বয়স্করা অন্যদের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষন করিবার চেষ্টা করে।

এই প্রবৃত্তি বশেই শিশুরা যত বড় হইতে থাকে তত তাহাদের কাজকর্ম নিজেরাই করিতে চায়, বড়দের সাহায্য অপছন্দ করে। নানারূপ হাতের কাজ, ক্রিয়া কৌশল, নৈপুণ্য, সাহসীক অভিযান এবং সমস্যা সমাধান বালক বালিকারা নিজেদের চেষ্টায় করিতে চায় ও তাহাতে তন্ময় হইয়া থাকে কারণ এইগুলি তাহাদের ভিতরের শক্তিকে ও যোগ্যতাকে জাগাইয়া তুলে এবং মন নবলব্ধ আত্মতৃপ্তি বা আত্মগৌরবের ভাবে ভরিয়া যাইতে থাকে। কোন জটিল বা কঠিন কাজ সম্পাদনের পর 'আমি পেরেছি' বলিবার সঙ্গে সঙ্গে বালক বালিকার চোখে যে দীপ্তি খেলিয়া যায়, মুখে যে জয়হাস্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহা কে না দেখিয়াছেন। নিজের শক্তি ও শৌর্য প্রদর্শনের উপযুক্ত ক্ষেত্র দেখিলেই এই প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে।

অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করাই এই প্রবৃত্তির প্রধান লক্ষ্য। তবে বাঞ্ছিত-পথে এই মনোযোগ না পাওয়া গেলে দুষ্ক্রিয়তার দ্বারাও কখন কখন ছেলেমেয়েরা নিজেদের সকলের মনোযোগের পাত্র করিবার চেষ্টা করে। শ্রেণীর কাজে অসমর্থ হইলে নানারূপ দুষ্টামী ও বিঘ্ন ঘটাইয়া জোর করিয়া অন্যদের মনোযোগ আকর্ষন করে এবং নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করে। সুখ্যাতি না পাওয়া গেলে কুখ্যাতিও ভাল কিন্তু খ্যাতিহীনতা অসহ।

দলভুক্তি। (Gregariousness)

এই প্রবৃত্তির সহগামী প্রক্ষোভ নির্দেশ করা কিছুটা কঠিন। যখন কেহ অন্য সকলের হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, অথবা নিজের সমাজের লোকজনের হইতে নিজেকে ভিন্ন মনে করে তখন যে ভাবটি জাগে তাহাকেই এই প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ বলা যাইতে পারে। ইহাকে একাকীত্ব বলিতে পারি। এইরূপ ভাবের উদয়ে আমরা দলে পুনর্বার মিশিয়া যাইতে চাই। সমস্ত প্রাণীই অবশ্য দলগত জীবন যাপন করে না যেমন, বিড়াল জাতীয় প্রাণীরা একা একা থাকিতেই ভালবাসে। ভেড়ার দল বা হাঁসের দল হইতে কেহ দলছাড়া হইয়া পড়িলে কিরূপ কাতর হইয়া পড়ে এবং দূর হইতে দলকে দেখিলেই উর্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া নিজেকে দলের মধ্যে মিশাইয়া দেয় তাহা সকলেই দেখিয়াছেন।

মানুষ খুবই দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে এবং মানুষের সর্বক্ষেত্রেই দলগত জীবন দেখা যায়। উৎসব আনন্দের দিনে পথে ঘাটে দলের শোভাযাত্রা কত অল্প কারণেও স্বাভাবিকভাকে ঘটে। সেইজন্য মানুষের পক্ষে নির্জনে বাস করা একটি শাস্তি। মানুষ সাধারণতঃ পোষাক পরিচ্ছদে চালচলনে অথবা চিন্তাভাবনায় অন্যদের হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র অনুভব করিলে তাহার নিজের স্বতন্ত্রতাবোধ তাহাকে অন্য সকলের মত হইবার জন্য উদ্দীপ্ত করে। ইহারই ফলে সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, ঐতিহ্য, রুচিবোধ ইত্যাদি গড়িয়া উঠে।

দলের মধ্যে একধরণের একপ্রাণতা দেখা যায়। দলের সদস্যদের মধ্যে চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং কাজের মধ্যে একটি ঐক্য থাকে, দলের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইলেই সকলেই পলাইতে থাকে বা আর্তনাদ করিতে থাকে। দলের একজন সদস্য হয়ত আতঙ্কের বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ভীতির ভাব দেখাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা আসল কারণ না জানিয়া তাহার ভয় দেখিয়াই আতঙ্কগ্রস্থ হইয়া পড়ে। দলের এই ঐক্য এবং আদিম সমবেদনার ভাব যে মানুষের বেলায়ও সত্য তাহা সকলেই জানেন।

শ্রেণীও একটি দল এবং দলটি যদি সত্যই দল-সত্বা অর্জন করিতে পারে এবং শিক্ষকও এই দলভুক্ত হইতে পারেন তাহা হইলে শ্রেণীর মধ্যে এই একপ্রাণতা ও ঐক্য জাগিবে। শেখার কাজে দলের এই জীবন্তভাব কত কাজে আসে তাহা পরে আমরা দেখিব। শিক্ষক যে ভাব ব্যক্ত করেন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তাহা সংক্রামিত হয়। সাহিত্য বা কাব্যের রস গ্রহণের ভাব শিক্ষক যদি অকৃত্রিমভাবে দেখাইতে পারেন তাহা হইলে বিদ্যার্থীদের মধ্যেও তাহা সঞ্চারিত হইবে। উপদেশের দ্বারা রসগ্রহণ সম্ভব নয়, একত্র অনুভবের দ্বারাই সম্ভব।

খাদ্যান্বেষণ। (Food seeking).

বাছুর কিভাবে সহজাত প্রবৃত্তিবশে গাভীমাতার বাঁট খুঁজিয়া বাহির করে ও দুগ্ধদোহন করিয়া পান করে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। খাদ্যান্বেষণ

প্রবৃত্তির প্রধান কাজ আত্মশরীরের পুষ্টি এবং রক্ষা। খাদ্যের দর্শন বা আঘ্রাণ পাইলে বা ক্ষুধার অবস্থায় এই প্রবৃত্তির জাগরণ হয়। খাদ্য অন্বেষণের পর খাদ্য পাওয়া গেলে তাহা ভোজনের পর এই প্রবৃত্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

সঞ্চয়। (Acquisition)

মৌমাছি মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে, কাঠবিড়ালী সুপারী সঞ্চয় করে, ছোট ছেলেমেয়েরা নানারকম টুকিটাকি তাহাদের খেলিবার জিনিষ সঞ্চয় করে। সভ্য জগতেরও বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে নানা উপাদান সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের উপর। সঞ্চয়যোগ্য জিনিষ প্রত্যক্ষ করিলে এই প্রবৃত্তি জাগরিত হয়। সংগৃহীত জিনিষের স্বত্ববোধ ইহার প্রক্ষোভ বলা যাইতে পারে। সঞ্চিত জিনিষ সন্তর্পণে রক্ষা করাও এই প্রবৃত্তিজাত।

নির্মাণ। (Construction)

নির্মাণযোগ্য জিনিষের প্রত্যক্ষে এই প্রবৃত্তির উদয় হয়। খড়কুটো সংগ্রহ করিয়া পাখীরা বাসা বানায়; বালি, মাটি ও কাঠের টুকরা পাইলে শিশুরা নানারকম জিনিষ তাহাদের মনোমত করিয়া গড়ে। সৃজনী স্পৃহাই এই প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ।

হাস্য। (Laughter)

মানুষই হাসিতে পারে। অন্য প্রাণীদের মধ্যে হাস্য দেখা যায় না। মানুষ কি প্রত্যক্ষ করিয়া হাসে তাহার রহস্য এখনও সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। তবে মনে আমোদের ভাব আসিলেই মানুষ হাসে। ম্যাকুডুগালের মতে হাস্যকর পরিস্থিতিতে না হাসিলে মন বিরক্তি বা বেদনায় ভরিয়া যাইবে। একজন লোক হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলে অনেকে হাসিয়া উঠেন। না হাসিলে সহানুভূতিবশে তাহার দুরবস্থায় মনোবেদনা সৃষ্টি হয়। ক্রমাগত এইরূপ মনোবেদনা সহ্য করা মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর। সেইজন্যই বোধ হয় প্রকৃতি মানুষের মধ্যে হাসির প্রবৃত্তি দিয়াছেন।

সহজাত প্রবৃত্তির বর্ণনা সমাপ্ত করিবার পূর্বে ইহাদের সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার। মানুষের জীবনে প্রবৃত্তিগুলি আলাদা আলাদা শক্তি হিসাবে কাজ করে না, প্রায়ই তাহারা মিলিয়া মিশিয়া প্রকাশিত হয় এবং সমগ্র ব্যক্তিসত্ত্বার মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া থাকে। আর একটি কথা এই যে মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তিগুলি যদিও বংশানুক্রমে বর্তায় কিন্তু সকলের মধ্যে প্রবৃত্তিগুলি সমান মাত্রায় বর্তমান থাকে না। সেইজন্যই মানুষের স্বভাবের মধ্যে বৈচিত্র দেখা যায়; কেহ ভীতু স্বভাবের হয়, কাহারও স্বভাব স্নেহ মমতায় ভরা থাকে, কাহারও ভিতর আক্রোশের ভাবের প্রাধান্য থাকে, কেহ আত্মজাহির করিতে বেশী ভালবাসে আবার কেহ বা প্রেমিক হয়।

সহজাত প্রবৃত্তিগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

(১) পূর্ব অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, অনুশীলন বা অনুকরণ ব্যতিতই সহজাত প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে ও ক্রিয়াশীল হয়। কতকগুলি হাঁসের বাচ্চাকে ইনকিউবেটরে ফুটাইয়া আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং জলের সংস্পর্শে যাইতে দেওয়া হয় নাই এবং অন্য হাঁসেদের সাঁতার কাটাও দেখিতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু যখন তাহারা সাঁতার কাটিবার উপযুক্ত হইল তখন জলে ছাড়িয়া দিতে প্রথমে একটু উত্তেজনা করিলেও তাহারা সাঁতার কাটিতে পারিল। সমস্ত সহজাত প্রবৃত্তি সম্বন্ধেই এইকথা সত্য যে তাহাদের কর্মপ্রেরণা অন্তর্নিহিত থাকে এবং দৈহিক অবয়বের পূর্ণতা হইলেই স্বতঃপ্রকাশিত হয়; প্রথম হইতেই কার্যকরীভাবে প্রকাশ পায় যদিও পটুত্ব বা নৈপুণ্যের পূর্ণতা অনুশীলনের দ্বারা সাধিত হয়।

(২) সহজাত প্রবৃত্তি উদ্দেশ্যমূলক। সহজাত প্রবৃত্তি উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের চমৎকার সঙ্গতি সাধন করে। ভয়ের বস্তু হইতে আত্মরক্ষা করা পলায়নের উদ্দেশ্য। সব সময়ে এই উদ্দেশ্য স্পষ্ট চেতনার মধ্যে থাকে না। নির্মাণ প্রবৃত্তিবশে পাখীরা যখন খড়কুটো দিয়া বাসা বানায় তখন বাসায় ডিম পাড়িয়া বাচ্চা মানুষ করিবে এইরূপ স্পষ্ট ধারণা তাহাদের মনে থাকে বলিয়া মনে হয়, তাহাদের স্বভাবনিহিত কোন তাগিদ বা শারীরক্রিয়ায় প্রেষিত

হইয়া তাহারা বাসা বানায়। যেখানে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতনা থাকে সেখানে ইচ্ছা বা অভিলাষ কর্মপ্রেরণার মূলে থাকে। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণ করাই সহজাত প্রবৃত্তির কাজের বা বাহ্য আচরণের দিক।

(৩) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রবৃত্তি উত্তেজক কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিলে তবে প্রবৃত্তির জাগরণ হয়। ইহাই প্রবৃত্তির দেখার বা প্রত্যক্ষর দিক।

(৪) আমরা জানি প্রবৃত্তির একটি প্রক্ষোভের দিক আছে। এই দিকটি অপর দুইটির মত আপাতদৃষ্টি নয়।

(৫) প্রবৃত্তির প্রত্যক্ষ, প্রক্ষোভ ও সম্পাদন—এই তিনদিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও সম্পাদন দিক দুইটির অবস্থা বিশেষে পরিবর্তন সম্ভব হয়। নিম্নপ্রাণীদের মধ্যে প্রবৃত্তির তেমন পরিবর্তনশীলতা দেখা যায় না কিন্তু যতই ক্রমাভিব্যক্তির উপরের দিকে যাওয়া যায় ততই প্রবৃত্তির কার্য পরিবর্তনশীল হইয়া উঠে। ইহা সম্ভব হয় বুদ্ধির ক্রমবিকাশের ফলে। বুদ্ধির প্রভাবে জীব প্রবৃত্তির স্থিরীকৃত পথে যদি সাফল্য না দেখে তাহা হইলে তাহার আচরণকে পরিবর্তিত করিয়া প্রবৃত্তির লক্ষ্যে পৌছিবার চেষ্টা করে। মানুষের মধ্যে পরিবর্তনশীলতা এতই বেশী যে অনেক মনোবিদ্ মানুষের মধ্যে সহজ প্রবৃত্তির অস্তিত্বই স্বীকার করিতে চাহিতেন না। বর্তমানে মানুষের স্বভাবে সহজাত প্রবৃত্তির একেবারে অস্তিত্ব নাই একথা বলা হয় না তবে প্রাণীদের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির যেরূপ যথাযথ প্রকাশ দেখা যায়, মানুষের মধ্যে সেইরূপ স্থিরীকৃত আকারে সহজাত প্রবৃত্তি সক্রিয় হইতে পারে না। সমাজ পরিবেশের প্রভাবে সহজাত প্রবৃত্তির অনেক রূপান্তর ঘটে এবং ব্যক্তিসত্বা বা জীবনের মূল চাহিদার সহিত অঙ্গীভূত হইয়া যায়; সেইজন্য সহজাত প্রবৃত্তির পৃথক অস্তিত্ব মানুষের জীবনে খুঁজিয়া পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

(৬) সহজাত প্রবৃত্তির ক্রিয়াশীলতা নির্ভর করে দৈহিক অবয়বের গঠন ও তাহার পরিপক্কতার উপর। পলায়ন, যুযুৎসা প্রভৃতি প্রবৃত্তির বর্ণনায় দেখিয়াছি তাহারা কিরূপ নার্ভতন্ত্র, গ্রন্থি, লিভার ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে কোন কোন সহজাত প্রবৃত্তি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত

ক্রীয়াশীল থাকে। কোন কোন সহজাত প্রবৃত্তি সাময়িকভাবে দেখা দেয় যেমন সন্তানকে স্তনদান প্রবৃত্তি বা বাৎসল্য প্রবৃত্তি, আবার, কোন কোন প্রবৃত্তি বৃদ্ধি ও বিকাশের বিশেষ স্তরে দেখা দেয় যেমন, রতি বা যৌন প্রবৃত্তি যাহা কৈশোরের পূর্বে আবির্ভূত হয় না।

সামাজিক হইয়া উঠিবার জন্য মানুষের মধ্যে এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলির নানারূপ পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে। সমাজের রীতিনীতি, প্রথা, আইন-কানুনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিতে গিয়া মানুষকে অনেক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সামাজিক হইবার ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তিপুরণের বাসনার মধ্যে প্রায়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। সামাজিক ইচ্ছা জয়ী হইলে অসামাজিক প্রবৃত্তির শক্তি নির্জ্জানে অবদমিত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ তাহার অস্তিত্বের বিষয় মানুষ মনে রাখে না; কিন্তু মনে না রাখিলেও এই শক্তির উদগতির সাহায্যে নানা সমাজানুমোদিত রূপ পরিগ্রহ করিয়া আসে এবং মানুষের আচরণের মধ্যে নানা লক্ষণ ধরিয়া আবির্ভূত হয়। সব সময় লক্ষণগুলি সুস্থ আকারে আসে না। অনেক সময় নানা অসুস্থ লক্ষণ জীবনকে বিড়ম্বিত করে। যাহা হউক আমরা এখন দেখিতে চেষ্টা করিব মানুষের জীবনে এই প্রবৃত্তিগুলি সত্যকার কিরূপে বর্তমান থাকে।

আমরা দেখি সামাজিক মানুষের কতকগুলি প্রয়োজনবোধ আছে এবং সেইগুলি পূরণের জন্য তাহার মধ্যে অন্তর্নিহিত চাহিদা বা প্রেষণা আছে। আমরা মূল চাহিদাগুলির বর্ণনাপ্রসঙ্গে শিশুদের মধ্যে কিরূপে ইহারা বর্তমান থাকে এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনবোধের অনুকূলে সার্থকশিক্ষা দেওয়া সম্ভব তাহা লইয়া আলোচনা করিব।

বাঁচিবার চাহিদা।

সকলেই বাঁচিতে চায়; মৃত্যুকে এড়াইয়া যাইতে বা স্থগিত রাখিতে চায়। অবশ্য শিশুদের মধ্যে এই তাগিদের প্রকাশ বড়দের মত অত সজ্ঞানে হয় না। বরঞ্চ দেখা যায় তাহারা অনেক বিপদ আপদের মধ্যে আপনা আপনি গিয়া পড়ে এবং নিজেদের জীবন বিপন্ন করে। এইরূপ আচরণ যে বাঁচিবার ইচ্ছার

অভাব তাহা নহে। শিশুরা নানা অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য নানা অবস্থায় নিজেদের ফেলে। অনভিজ্ঞতা বশতঃই তাহারা বিপজ্জনক অবস্থাতেও চলিয়া যায়। কিন্তু বিপদের উপস্থিতি বুঝিতে পারিলে তাহারা ভয় পায় এবং ত্রাণ পাইবার চেষ্টা করে। বাঁচিবার তাগিদের মধ্যে পলায়ন, যুযুৎসা, বিকর্ষণ অনুনয়, খাদ্যান্বেষণ প্রবৃত্তির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

রোগ হইতে মুক্ত থাকা এবং দীর্ঘজীবন লাভ স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষার (Health and Physical Education) অন্যতম লক্ষ্য। এই শক্তিশালী তাগিদের সাহায্য লইয়া শিক্ষক শিশুদের মধ্যে সতর্কতাবোধ জাগাইতে পারেন এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা দিতে পারেন। পথেঘাটে সতর্কভাবে কিভাবে চলিতে হয়, যানবাহনের গতিবিধির কি সঙ্কেত ও নিয়ম আছে এইগুলি শিশুরা ভ্রমণ বা প্রজেক্টের মাধ্যমে শিখিতে পারে। আজকাল ইহাকেই নিরাপত্তা শিক্ষা (Safety education) বলা হয়।* সমাজ বিদ্যার মধ্য দিয়া অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের প্রাথমিক জ্ঞান এই তাগিদকেই অবলম্বন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কৌশলী ও সহানুভূতিশীল শিক্ষক তাঁহার পাঠ্যবিষয়কে তাঁহার ছাত্রছাত্রীদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করিলে তাহা তাহাদের কাছে অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে এবং স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া তাহারা তাহা শিখিতে চায়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে খাদ্য রন্ধন, সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুত, খাদ্যের পুষ্টিকরতা (Nutrition) বিচার, সব্জি ও ফলের বাগান তৈয়ারী ইত্যাদি এই তাগিদকে অবলম্বন করিয়া শেখান যায়। তবে এই সব কর্ম সম্পাদনের মধ্যে শুধু যে এই তাগিদ থাকে তাহা নহে, বাৎসল্য, আত্মজাহির, দলভুক্তি, নির্মাণ—এই প্রবৃত্তিগুলিও ইহাদের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া থাকিতে পারে। সেইজন্য মানুষের আচরণে শুধু একটি প্রবৃত্তির খেলা দেখা যায় না।

---

* দিয়াশলাই, ছুরী-কাঁচি, হাতুড়ী, করাত ইত্যাদি দ্রব্য কিভাবে ব্যবহার করিতে হয়, ইলেক্‌ট্রিকের জিনিষপত্র, ষ্টোভ ইত্যাদির সম্বন্ধে কিরূপ সতর্কতা লইতে হয়—এইসব বিষয় পিতামাতা ও শিক্ষক নিরাপত্তা শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের শিখাইতে পারেন। এই সব শিক্ষার মধ্যে কৌতূহল প্রবৃত্তিও জাগ্রত হয়।

স্বাস্থ্য ও আরামের চাহিদা

প্রথম চাহিদার সহিত এই চাহিদার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মানুষ শুধু বাঁচিয়া থাকিতে চায় না, সুস্থ থাকিয়া আরামের মধ্যে বাঁচিতে চায়। রোগ-শোক, অশান্তি, যন্ত্রণাজ্বালা হইতে মুক্ত থাকিয়া স্বচ্ছন্দে ও আরামে মানুষ বাঁচিতে চায়। অসহ্য দুঃখবেদনার মধ্যে মানুষ অনেক সময় মৃত্যুই কামনা করে। পূর্ব বর্ণিত ১৪টি সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে ঠিক এই নামে কোন প্রবৃত্তি নাই; তবে প্রবৃত্তির চরিতার্থতার মধ্যে সন্তোষ ও আরামবোধ আছে।

সুস্থ থাকিবার ইচ্ছা যে খুবই প্রবল তাহা বুঝা যায় যখন প্রথম সাক্ষাতেই কাহাকেও তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করি।

শ্রেণীতে যথেষ্ট আলো বাতাস আসে কিনা এবং ছাত্রছাত্রীরা আরামে বসিতে পারে কিনা সে দিকে শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। এই চাহিদার সুযোগ লইয়া স্বাস্থ্য, সাধারণ বিজ্ঞান বা সমাজবিদ্যার কয়েকটি বিষয় অবতারণা করা যায় যেমন, ঘরে জানালা ও ভেন্টিলেটর রাখা হয় কেন, বেশী আলোর তেজ হইতে চোখকে কিভাবে রক্ষা করিতে হয়, উন্মুক্ত স্থানে ভ্রমণ ও খেলা, পরিমিত সূর্যালোক সেবন, ধোঁয়া নিবারণ, আবর্জনা সরান, গ্রাম বা নগর পরিকল্পনা, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি। তাহা ছাড়া কোন্ ঋতুতে এবং কোন্ কাজের জন্য কিরূপ পোষাক পরিচ্ছদ আরামপ্রদ এবং তাহার কারণ, স্নানের উপকারিতা, ঠাণ্ডা ও গরম পানীয়ের উপযোগিতা, কোন্ খেলা কোন্ ঋতুর যোগ্য, থার্মোমিটারের সাহায্যে উত্তাপ জানা, দক্ষিণ ও পূর্বমুখো বাড়ী কেন করা হয়, পরিশ্রম ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা, ক্লান্তি কেন হয়, নানারূপ খেলা শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে শিশুরা এই চাহিদার প্রভাবে কেবল যে শেখে তাহাই নহে অনুরূপভাবে তাহারা আচরণ করে যাহা পরে অভ্যাসে পরিণত হয়। এই সব জ্ঞান ও কাজের মধ্যে কৌতূহল ও আত্মজাহির প্রবৃত্তি সক্রিয় হইয়া উঠে।

দৈহিক সুস্থতা লইয়া ও আরামপ্রদ পরিবেশ থাকিলেই যে শিশুরা সব সময় সুখে থাকে তাহা নহে। জ্বরজ্বালা, ঠাণ্ডালাগা, পেটের ব্যথা, টনসিল প্রদাহ প্রভৃতি রোগ হইতে মুক্ত থাকাকেই আমরা ভাল থাকা বলিয়া মনে

করি। দৈহিক রোগ ও যন্ত্রণা ছাড়াও আমাদের মানসিক ব্যাধি ও প্রক্ষোভের বিকৃতি সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইবে। স্থায়ী অসন্তোষের ভাব, অতিরিক্ত লাজুকতা, ভীরুস্বভাব, বদ্‌মেজাজ, মাত্রাধিক উৎকণ্ঠা, হীনমন্যতা ইত্যাদি মানসিক রোগলক্ষণগুলির দিকে পিতামাতা ও শিক্ষকের দৃষ্টি দিতে হইবে। শারীরিক ব্যাধির মত ইহাদেরও প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত। এক্ষেত্রেও প্রক্ষোভের নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষার কার্যকরী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্যের নানা বিষয় শিশুদের উপযোগী করিয়া শেখান যাইতে পারে এবং সুপরিকল্পিত অভিনয়ের মাধ্যমে তাহাদের মধ্যে তাহাদের আচরণ সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি আনয়ন করা যাইতে পারে। সঙ্গী সাথীদের সহিত কিভাবে মেলামেশা ও খেলাধূলা করিতে হইবে, জয়পরাজয়কে কি মনোভাব লইয়া গ্রহণ করিতে হইবে, বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিবার উপায় কি, গঠনমূলক পরিকল্পনা কিভাবে করিতে হয়, কর্মসম্পাদনের মধ্য দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনির্ভরশীলতা কিভাবে জন্মে—এইগুলি শুধু উপদেশ দিয়া নহে উপযুক্ত কাজকর্ম এবং সমাজ পরিবেশের মধ্য দিয়া শিশুদের শিখাইতে হইবে।

দুঃখ এড়াইবার তাগিদ লইয়া পূর্বে বড়দের কাছে অবাঞ্ছিত কাজকর্ম করিলে বা তাহাদের মনোমত কাজ করিতে না পারিলে শিশুদের মারধোর করা হইত। অবিচক্ষণতার সহিত শাস্তি দিলে কোন বিশেষ ফল ফলে না। শিশুর সামর্থ্যের বাহিরে কাজ দিলে সে কিরূপে পারিবে? শাস্তি যতই কঠিন হোক, শাস্তির আসল উদ্দেশ্য কখনও সিদ্ধ হয় না। তবে বিচক্ষণতার সহিত শাস্তি প্রযুক্ত হইলে ভাল ফল ফলিতে দেখা যায়।

আর্থিক নিশ্চিন্ততার চাহিদা।

বাঁচিয়া থাকা ও সুখে থাকার চাহিদা হইতে আর্থিক নিশ্চিন্ততার চাহিদার উৎপত্তি। অর্থের বিনিময়ে আমরা জীবনধারণের সবরকম উপাদান পাইতে পারি। বস্তুতঃ অর্থের দ্বারা ধন ক্রয় করিতে পারি বলিয়াই অর্থের মূল্য। এই চাহিদাবশেই আমরা ভাল চাকুরী ও আয় চাহি, জীবনবীমা করি, বাড়ী, গরুবাছুর, আসবাবপত্র ইত্যাদি সম্পত্তি করি, ব্যাঙ্কে টাকা জমাই। ভাল আয়

থাকিলে ভাল খাদ্য, পোষাক পরিচ্ছদ এবং আশ্রয় মেলে। বৃদ্ধ বয়সে যখন রোজগারের ক্ষমতা থাকিবে না তখনকার জন্য টাকা সঞ্চয় করি।

আর্থিক নিশ্চিন্ততা থাকিলে মানুষ সুখী হইতে পারে এবং তাহার ব্যক্তিত্বের উপরও একটি ভাল প্রভাব পড়ে। যে সব গৃহে আর্থিক অসচ্ছলতা খুব বেশী, বাড়ী ভাড়া দিবার টাকা নাই, পাওনা বেশী হওয়ায় মুদী চালডাল বন্ধ করিয়া দিবে বলিয়া শাসায়; পুরাণ, মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া থাকিতে হয়—এইরূপ গৃহের শিশুরা ভয়ার্ত, উৎকণ্ঠিত ও হীনমন্যবোধযুক্ত হইয়া পড়ে। এইজন্য শিশুকে বুঝিতে গেলে তাহার বাড়ীর আর্থিক অবস্থা কিরূপ তাহা শিক্ষককে জানিতে হইবে। তাহার ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করিতে এই জ্ঞান যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

বড়দের মত আর্থিক চাহিদা ঐ আকারে শিশুদের মধ্যে থাকে না। তবে তাহাদের মধ্যেও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বেশ দেখা যায়। এই প্রবৃত্তির সুযোগ লইয়া শিক্ষক সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার অনেক কাজ শিশুদের শিক্ষা দিতে পারেন এবং শিক্ষাপ্রদ সখ জন্মাইতে পারেন। নানাধরণের পাতা, ফুল, পোকামাকড়, পাখীর বাসা, মাটির নমুনা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া বিজ্ঞানের কোণ (Science Corner) বা ঘর সাজাইতে শিশুরা খুব ভালবাসে। তাহা ছাড়া নানারকম গৃহপালিত পশুপক্ষী পুষিতেও চায়। এই সব সংগ্রহ ও সঞ্চয়মূলক কাজ করিতে করিতে শুধু পুস্তক নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাহারা জীব বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের সহিত পরিচিত হয়। পল্লীর মধ্যে প্রাচীন ছবি, ধ্বংসস্তূপের ফটো, পুরাতন মুদ্রা, নানাদেশের মুদ্রা ও ষ্টাম্প প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেও শিশুরা খুব ভালবাসে। বিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে তাহাদের দ্বারা এইগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়া রাখিলে, নীচে ইহাদের নাম ও প্রাপ্তিস্থান ও ছোট বর্ণনা লিখাইয়া লইলে যতটা তাহারা শিখিতে পারে, পুস্তক পাঠে ও বক্তৃতায় তাহা হয় না; কেননা পুস্তক ও বক্তৃতায় তাহাদের ধারণা স্পষ্ট ও বাস্তবধর্মী হয় না। সঞ্চিত জিনিষের উপর শিশুদের একটি স্বত্ববোধ থাকে। সঞ্চিত জিনিষ যেন তাহাদের ব্যক্তিসত্তার অংশ সেইজন্য এত মমত্ববোধ এবং তাহার সংরক্ষণে এত আগ্রহ। সংগ্রহ, সঞ্চয় ও

সংরক্ষণ—এই তিনটি কার্যকে আশ্রয় করিয়া শিক্ষক যদি সুকৌশলে শিক্ষা দিতে পারেন এবং তিনটিকে সুস্থ অভ্যাসে পরিণত করিতে পারেন তাহা হইলে শিশু বড় হইয়া নিজের ও দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিতে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলিকে মমত্ববোধে সংরক্ষণ করিতে পারিবে। তবে দেখিতে হইবে সঞ্চয় যেন কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও মিউজিয়ামের ঘরে শিশু তাহার সংগৃহীত বস্তু রাখিয়া অন্যদের সহিত তাহার স্বত্ববোধ মিলাইয়া দেয়। ফলে সঞ্চিত সব জিনিষেরই প্রতি তাহার মমত্ব জাগে এবং সংরক্ষণপ্রয়াসী হয়। এই মনোভাব ও অভ্যাসের পুষ্টি হইলেই ভবিষ্যতে সমাজে ধনসাম্য আসিতে পারে এবং যৌথ প্রচেষ্টা সম্ভব হয়। সঞ্চয় প্রবৃত্তি যদি কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক হইয়া গড়িয়া উঠে তাহা হইলে ধনোৎপাদনের মূলধনের মালিকানা একই ব্যক্তি হস্তগত করিতে চায় এবং ফলে মুষ্টিমেয় লোক ধনদৌলতের অধিকারী হইয়া বসে এবং যাহারা এই ধন তাহাদের পরিশ্রম দিয়া উৎপাদন করে তাহারা শোষিত হয় এবং চিরদারিদ্রে বাস করে। তাহা ছাড়া আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিরা জনসাধারণের শিক্ষায়তন ও অন্যান্য কল্যাণমূলক ও জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি সহানুভূতি দেখায় না এবং সেইকারণে সমাজ ও রাষ্ট্র তাহাদের নিকট হইতে কোন উপকার পায় না। সুতরাং সঞ্চয় প্রবৃত্তি যাহাতে শিশুদের মধ্য কৃপণতায় ও আত্মসর্বস্বতায় পর্যবসিত না হইয়া দলের সঞ্চিত ঐশ্বর্যে ও জ্ঞানে তাহার অবদান থাকে এবং তাহাতে তাহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং দলের সম্পদ, জ্ঞান এমন কি মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে প্রণোদিত হয় শিক্ষক সেইরূপ শিক্ষা দিবেন। শিক্ষা-মূলক সংগ্রহ, সঞ্চয় ও সংরক্ষণের মধ্যে বাৎসল্য, কৌতূহল, আত্মজাহির, দলভুক্তির ও সঞ্চয় প্রবৃত্তির জাগরণ হয়।

দলভুক্তির চাহিদা।

পূর্বে দলভুক্তি প্রবৃত্তির বর্ণনা করা হইয়াছে। সামাজিক মানুষের মধ্যে এই প্রবৃত্তি কিভাবে প্রকাশ পায় এবং ইহার শিক্ষা সম্ভাবনা কি সেই বিষয়ে এখন আলোচনা করিব। দলের সংহতি ও শক্তি মানুষের মধ্যে একটা নিশ্চিন্ততা

ও স্বস্তির ভাব আনিয়া দেয়, দলের মধ্যে থাকিয়া সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, শুধু নিরাপত্তাই নহে দলের মধ্যে থাকাটাই আনন্দদায়ক হইয়া উঠে। সেইজন্য সঙ্গীসাথী ও বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্য এত মধুর। দল যে তাহাকে একজন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহাতে একটা আত্মপ্রসাদ আছে। দলের স্বীকৃতি না পাইলে হীনমন্যতা ও অসহায় ভাব জাগে। সার্থক দল স্নেহ ভালবাসার উপরই গড়িয়া উঠে। দলের প্রত্যেকে ভালবাসা ও মর্যাদা অপরকে দিতে চায় এবং অন্যদের কাছ হইতে নিজেও পাইতে চায়, এই লেনদেনের মধ্য দিয়াই দলের বন্ধন ও ঐক্য গড়িয়া উঠে। দলগত জীবনকে স্থায়ীত্ব দিবার জন্য মানুষ সংসার পাতে, ধর্মীয়, প্রমোদমূলক, শিক্ষামূলক ও ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত ও রাষ্ট্রীয় নানা সংস্থা, সঙ্ঘ, সমিতি ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে।

যে সব গৃহের জীবন শান্তি ও সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে শিশুরা ভালবাসা, বদান্যতা ও সুবিচার পায় সে সব গৃহের শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকে। কিন্তু যে সব গৃহে পিতা ও মাতার মধ্যে কলহ ও মতবিরোধ লাগিয়াই থাকে, কড়া-শাসন, আর্থিক অনটন ও অবহেলার মধ্যে থাকিতে হয় সে সব গৃহের ছেলেমেয়েরা লাজুক, ভীতু, বিষণ্ণ এবং অনেক সময় দুষ্টু প্রকৃতির হয়। গৃহে নিশ্চিন্ততা বা অনিশ্চিন্ততাবোধ শিশুর ব্যক্তিত্বে গভীর ছাপ রাখিয়া যায়।

শিক্ষক নানাভাবে শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের সমাজ জীবনের প্রতি ভালবাসার মনোভাব জন্মাইতে পারেন। বিদ্যালয়ের দলগত বা সামাজিক জীবন যদি ছেলেমেয়েদের কাছে আশ্বাসজনক ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় তবেই তাহাদের শৃঙ্খলা ও নীতিবোধের সার্থক বিকাশ হয় এবং বিদ্যালয় প্রাণময় হইয়া উঠে।

শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকেই অন্যদের দ্বারা আদৃত হইতে চায়। তাহারা শিক্ষক এবং সঙ্গীদের বন্ধুত্ব ও সমাদর পাইতে চায়। শিক্ষকও ছাত্রছাত্রীদের বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধা পাইতে চান এবং তাহাদের শ্রদ্ধাস্পদ ও বিশ্বাসভাজন হওয়া তাঁহার শিক্ষকজীবনের পক্ষে প্রয়োজন কারণ ছাত্রছাত্রীদের সহিত তাঁহার মধুর সম্পর্কের উপরই তাঁহার জীবন সুখের হয় এবং তাঁহার শিক্ষাদানেও উৎকর্ষতা আসে।

ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের এই অনুভূতিগুলি শূন্য হইতে আসিতে পারে না; যে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান প্রণালী সামাজিকভাবে হয় সেখানে এইরূপ মানবিক সম্বন্ধ স্থাপনের সম্ভাবনা থাকে। যেখানে শিশুদের শুধু নিজের নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া থাকিতে হয়, সহপাঠীদের সহিত বৌদ্ধিক বা ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় যেখানে হইতে পারে না, শুধু শিক্ষকের দেওয়া পাঠ তৈয়ারী করিতে হয় এবং শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় সেখানে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের কোন সুযোগ থাকে না এবং দলের ঐক্য, নীতি ও সংহতি গড়িয়া উঠে না। কিন্তু যে শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক সকলে মিলিয়া শিক্ষাপ্রদ কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করে ও পরিকল্পনা রচনা করে, ছোট ছোট দলে কার্যবণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, ভ্রমণ, খেলধূলা এবং প্রজেক্টের কাজ করা হয় সেখানে শিশুরা দলগত জীবনের প্রকৃত আস্বাদ পায়। নিজের আগ্রহ ও যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকে কাজ পায়, নিজের দক্ষতা দেখাইয়া প্রশংসা পায় এবং দলের মধ্যে সে যে একজন কৃতকর্ম সদস্য জানিয়া এবং নিজেকে দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ জানিয়া আশ্বস্ত হয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী পরিষদ, উৎসব পালন, বনভোজন, নাটকাভিনয়, দেয়াল পত্র ও অন্যান্য পত্রিকা সম্পাদনা, খেলাধূলা ইত্যাদি বিদ্যালয়ের কার্য-তালিকার মধ্যে রাখা হয়। এইভাবে শিক্ষিত হইলে দলগত ও সামাজিক কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করিতে ছেলেমেয়েরা স্বতপ্রণোদিত হয় এবং এইভাবে তাহাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ অঙ্গীভূত হইয়া যায় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সুনাগরিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা।

আত্মজাহির প্রবৃত্তির সহিত আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মানুষ যতই বড় হইতে থাকে ততই তাহার নিজের আত্মমূল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সমাজে প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। হীন অধম হইয়া কেহ বাঁচিতে চাহে না। আত্মসম্মানের মূল্য এতই বেশী যে ইহার জন্য মানুষ তাহার নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকে। সাফল্য, প্রাধান্য, শক্তির অধিকার, অনুকূল স্বীকৃতি, মর্যাদা,

উচ্চপদ, গৌরব, যশ, প্রশংসা—এইসবের মধ্য দিয়া এই চাহিদার নিবৃত্তি হয়।

কোলের শিশুও বাপমার মনোযোগ পাইতে চায়। তাহার সামনে অন্য কাহাকেও আদর করিলে সে কাঁদিয়া প্রতিবাদ জানায়।

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলে শিশু সহপাঠীদের এবং শিক্ষকের প্রশংসা ও সমাদর পাইতে চায়। তাহার লেখা ও আঁকা ছবি দেওয়ালে প্রদর্শিত হইয়াছে দেখিতে চায়। তাহার সংগৃহীত ও নির্মিত বস্তু বিদ্যালয় প্রদর্শনীতে রাখিবার ইচ্ছাও তাহার থাকে। পরীক্ষায় সম্মান পাইতে ও উচ্চস্থান অধিকার করিতে চায়।

সারা জীবন ধরিয়াই মানুষ পুরস্কার ও সম্মান পাইতে চায়। অনেকে নেতা হইতে চায় কারণ নেতৃত্ব আত্মমূল্য বৃদ্ধি করে। প্রশংসা ও সমাদর আত্মসম্মান বাড়ায়।

সমাজে আমাদের মূল্য ও প্রয়োজন আছে এই অনুভূতি আমাদের সুখী করে এবং অযোগ্যতা ও হীনতা আমাদের অসুখী করে। হীন হইয়া আমরা বাঁচিতে চাই না, জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব না থাকিলে মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য মানুষ কঠিন পরিশ্রম করে। যোগ্যতার অভাব হইলে ফন্দীফিকির বা চালাকির দ্বারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে প্রয়াসী হয়।

ছেলেমেয়েদের জগৎ প্রধানত গৃহ ও বিদ্যালয়। সুতরাং গৃহে ও বিদ্যালয়ে তাহাদের মর্যাদা স্থাপন ও রক্ষা করিতে চায়। বিদ্যালয়ের কাজে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে না পারিলে বা সঙ্গীসাথীদের সহিত অন্তত সম-মর্যাদায় না আসিতে পারিলে তাহারা সুখী হইতে পারে না এবং তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হইতে পারে। শিক্ষক তাহাদের অভাব সহানুভূতির সহিত বুঝিবেন এবং তাহারাও কোন না কোন ক্ষেত্রে যাহাতে সাফল্যলাভ ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে এবং সম্ভবস্থলে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বুনিয়াদী ও প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে নানারকম শিক্ষাপ্রদ কাজ-কর্মের প্রচলন আছে। বিদ্যার্থী পরিষদের কাজকর্ম ও দায়িত্বপালনে ছাত্র

ছাত্রীরা নেতৃত্বের সুযোগ পায় এবং নানারকম হাতের কাজ, ললিতকলা, সংগঠনমূলক কাজ ও উৎসব পালনে প্রত্যেকেই নিজের যোগ্যতা প্রকাশের ক্ষেত্র খুঁজিয়া পায় এবং ছাত্রসমাজে প্রত্যেকের যে একটি প্রয়োজনীয় স্থান আছে ইহার বোধ তাহাদের আশ্বস্ত ও সুখী করে। এইরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে যে কাজ তাহার সাধ্যের বাহিরে তাহা করিবার জন্য তাহাদের ছল-চাতুরীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না, নিজেদের সত্যকারের কৃতিত্ব দেখাইয়া তাহারা সন্তোষ লাভ করে এবং আত্মোন্নতির চেষ্টায় রত থাকে। যদি কোন শিশু কিছু করিবার জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করে, কাহার ভিতর যদি তিনি ভাল ভাব বা চিন্তা দেখিতে পান, কেহ যদি তাহার করণীয় কাজ অপেক্ষা অধিক কাজ করে শিক্ষক প্রশংসার দ্বারা বা অন্য উপায়ে তাহাদের পুরস্কৃত করিবেন।

পুরস্কার, প্রশংসা, পরীক্ষার নম্বর ইত্যাদির দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের আত্মমর্যাদা বোধকেই বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং বিদ্যালয়ের কাজ আরও ভাল করিয়া করিবার জন্য উৎসাহিত করা হয়। তবে শিক্ষককে দেখিতে হইবে প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রীই যেন কোন না কোন ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা লাভ করিতে পারে এবং ছাত্র সমাজে যে তাহার প্রয়োজন ও স্বীকৃতি আছে তাহা বুঝিয়া আশ্বস্ত হইতে পারে।

তবে এই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন কোন ছাত্রছাত্রীর আত্মমূল্যবোধ এত বেশী না হইয়া দাঁড়ায় যাহা আত্মম্ভরিতা বা দাম্ভিকতায় পরিণত হয়। দাম্ভিকতা অন্যদের মনকে আঘাত করে এবং তাহাদের মনে বিরুদ্ধভাবের সৃষ্টি করে সেইজন্য আত্মমর্যাদা বোধের সহিত বিনয় ও সৌজন্য-বোধ থাকা চাই—ইহা অন্যের মনকে মুগ্ধ করে ও জয় করে।

সুস্থ আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মসন্তোষ বা তাহার অভাবে হীনমন্যতা ও অযোগ্যতাবোধ ব্যক্তিত্ব গঠনে ও প্রক্ষোভের সঙ্গতিবিধানে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষক দেখিবেন ছাত্রছাত্রীরা এই অভাব কতদূর পূরণ করিতে পারিতেছে এবং এ বিষয়ে সন্তোষজনকভাবে সফল হইতে না পারিলে তাহাদের অসাফল্য যতদূর সম্ভব দূর করিয়া সাফল্যের আনন্দবর্ধন করিতে সহায়তা করিবেন।

উদ্দীপিত হইবার চাহিদা।

মানুষ শুধু নিশ্চিন্তভাবে জীবন যাপন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সে নানাভাবে উত্তেজিত হইতে চায়, নূতন নূতন কাজে লিপ্ত হইতে চায়, আমোদ প্রমোদ খুঁজিয়া বেড়ায়। জীবনকে এইভাবে ভোগ করিতে না পারিলে সার্থকতা কোথায়। একঘেয়েমী ও অবসাদকে মানুষ অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। কাজকর্ম, খেলাধূলা, লেখাপড়া, গানবাজনা, ললিত শিল্পের চর্চা, থিয়াটার সিনেমা, ভ্রমণ কথাবার্তা, পান আহার ইত্যাদি দিয়া জীবনকে ভরাইয়া দিতে চায়। দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি ও একঘেয়েমি এইভাবে কাটিয়া যায়। আমরা সিনেমা, খেলা, ঘোড়দৌড় দেখিতে, গানবাজনা শুনিতে ও ভ্রমণের আনন্দ উল্লাস ভোগ করিবার জন্য অজস্র ব্যয় করিয়া থাকি। একঘেয়েমি ও অবসাদকে দূর করিবার জন্য আমরা বৈচিত্র খুঁজি। সুস্থভাবে বাঁচিবার পক্ষে এইগুলি অপরিহার্য। একরকম খাদ্য পানীয় আমরা পছন্দ করি না, একরকম পোষক পরিচ্ছদ ও গৃহসজ্জা আমাদের সন্তুষ্ট করিতে পারে না, সেইজন্য কত রুচিকর খাদ্য, পানীয়, রঙবেরঙের অঙ্গবাস এবং মনোমত গৃহসজ্জা নিয়ত সৃষ্টি হইতে থাকে। ইন্দ্রিয়সুখের বৈচিত্র্য ছাড়াও আমরা কর্মতৎপর হইতে চাই। খেলাধূলা, বেড়ান, গাড়ীচড়া, লোকজনের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ইত্যাদির মধ্যে নিজেদের ব্যস্ত রাখিতে চাই।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিষয় বা কাজ ব্যক্তিকে উদ্দীপ্ত করে এবং সন্তোষ বিধান করে তাহাই সে শিখিতে চায়, অসন্তোষ ও অবসাদের জিনিষকে সে এড়াইয়া চলে। কাজ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়াই ব্যক্তির বৃদ্ধি ও বিকাশ হইতে থাকে। প্রকৃত শিক্ষা সেইজন্য কাজ করিতে করিতেই হয়; আমরা দেখিয়া শুনিয়া, আস্বাদন অনুভব করিয়া বস্তু ও বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

শিশুদের মধ্যে উদ্দীপ্ত হইবার আগ্রহ ও কর্মপ্রেরণা প্রবল আকারে থাকে। এই চাহিদাকে কিছুতেই চাপা দিয়া রাখা যায় না। শিক্ষকের কাজ হইবে এই চাহিদাকে কাজে লাগান, ইহার বিরুদ্ধাচরণ করা নহে। বিদ্যালয়ে পাঠ,

কাজকর্ম যদি তাহাদের উদ্দীপ্ত করিতে পারে তাহা হইলে একাগ্রমনে তন্ময় হইয়া তাহারা তাহা করে।

এই কর্মব্যাকুল শিশুরা একটানা অনেকক্ষণ ধরিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিবে ইহা আশা করা বাতুলতা মাত্র। বিদ্যালয়ে তাহাদের ছোট ছোট দলে কাজ করিতে দিতে হইবে, কার্যক্রমের মধ্যে শিক্ষাপ্রদ হাতের কাজ ও শিল্প কাজ থাকিবে, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা আলাপ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবে। খেলাধূলা, উৎসব পালন, ভ্রমণ, অভিনয় ইত্যাদিও কার্যক্রমে থাকিবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্যক্রম এইভাবেই গঠিত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ শিক্ষক নিজে বক্তৃতা দিয়া বা কাজ করিয়া বিদ্যার্থীদের কতটা জ্ঞান পরিবেশন করিতে পারিলেন তদ্বারাই নিজের কৃতকার্যতার বিচার করেন। কিন্তু ভাল শিক্ষাদান কেবল শিক্ষকের সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে না, ছাত্রছাত্রীদেরও শিক্ষাগ্রহণে সক্রিয় অংশীদার হইতে হইবে, এই সক্রিয়তা তাহাদের মনকে সজাগ করিবে, শিক্ষাগ্রহণে উন্মুখ করিবে এবং জ্ঞানের বিষয়ের সহিত একাত্ম হইয়া জ্ঞানকে নিজের করিয়া লইতে পারিবে।

ছেলেমেয়েদের এই স্বাভাবিক কর্মচঞ্চলতাকে রোধ করিতে গেলে তাহাদের মধ্যে নানা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়; তাহারা নানাভাবে শিক্ষককে বিরক্ত করিতে থাকে এবং তাহাদের চাঞ্চল্য, খামখেয়ালী ও দুষ্টামীর রূপ ধরিয়া প্রকাশ পায়। সেইজন্য কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে যেখানে খেলাধূলা, ব্যায়াম, হাতের কাজ, অভিনয়, বনভোজন এবং আমোদপ্রমোদের সুযোগ প্রচুর পরিমাণে থাকে তথায় সর্বশ্রেণীর ও সর্ব বয়সের ছাত্রছাত্রীরা জীবনকে উপভোগ করিতে পারে এবং উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়া সক্রিয় ও সার্থকভাবে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে—ব্যক্তিত্বের বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা সেখানে নাই। দৃশ্য ও শ্রাব্য শিক্ষা সহায়ক (audio visual aids) জিনিষের সাহায্যে শিক্ষা দিলে শিক্ষণীয় বিষয় স্পষ্টতর হয় এবং ছাত্রছাত্রীরাও আগ্রহী হইয়া শিখে। ফিল্ম, স্লাইড, রেডিও, গ্রামোফোন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষা দিলে ছাত্রছাত্রীদের যেমন মনোরঞ্জনও হয় তেমনি তাহারা কৌতূহলী হইয়া শিখিতেও পারে। আনন্দ পাইবার জন্য তাহারা উদ্দীপ্ত হইতে চায়, নূতন

জিনিষ শিখিবার মধ্যে উদ্দীপনা আছে। শিক্ষাদান সুকৌশলে পরিচালিত হইলে তাহারা উদ্দীপ্ত হইয়া কৌতূহল সহকারে শিখিবে।

এই চাহিদাগুলির মধ্যে কৌতূহল, আত্মজাহির, দলভুক্তি, নির্মাণ ও হাস্যের প্রবৃত্তির কার্য দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বাধীনতার চাহিদা।

জীব মাত্রেই স্বাধীনতা চায়। জীবনের বিকাশ মুক্তির মধ্যে, বন্ধনের মধ্যে নহে। মানুষও চায় স্বাধীনতা, বন্দী হইয়া থাকা সেইজন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের বাধামুক্ত বিকাশই মানুষের কাম্য। চিন্তায়, সৃজনী শক্তিতে, কার্যে, আত্মপ্রকাশে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে, নিজের কর্তব্য নির্বাচনে, গতিবিধিতে, আত্মনিয়ন্ত্রণে মানুষ স্বাধীন হইতে চায়, ক্ষুদ্র শিশুকেও যদি ধরিয়া রাখা হয় তাহা হইলে সে কাঁদিয়া ইহার তীব্র প্রতিবাদ করে ও বন্ধনমুক্ত হইবার চেষ্টা করে।

অন্য চাহিদাগুলি পূরণের জন্য স্বাধীনতা আমাদের প্রয়োজন। পরাধীন হইয়া থাকিলে আমাদের আত্মসম্মানে বাধে, স্বচ্ছন্দ গতিবিধি ব্যাহত হয় ও দুঃখে কাল কাটাইতে হয়। অবশ্য স্বাধীনতা মানে অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। মানুষ নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে চায় কারণ নীতি ও নিয়মের দ্বারাই সকলের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়।

বিদ্যালয়ে শিশুরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা, চিন্তা ও নিজেদের প্রকাশ করিতে চায়। যে নিয়মকানুনের উদ্দেশ্য ও অর্থ তাহারা বুঝে না সেইগুলি তাহারা মানিয়া চলিতে চায় না। তবে বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলা ও হৈ চৈ হইতে থাকিবে ইহাও তাহারা চায় না। যে শিক্ষক, শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পারেন না তাঁহাকে ছেলেমেয়েরা মান্য করে না। আবার অতিরিক্ত শাসনপ্রিয় কড়া শিক্ষককেও তাহারা পছন্দ করে না; স্নেহ ও সুবিবেচনার সহিত যে সকল নিয়ম প্রণয়ন করা হয় যাহা ছাত্র ছাত্রীদের বোধগম্য ও কল্যাণকর হইয়া উঠে তাহা ছাত্রছাত্রীরা স্বইচ্ছায় মানিয়া চলে। যে সকল বিদ্যালয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেখানে শিক্ষকের সহযোগিতায় ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই তাহাদের

আইনকানুন রচনা করে। সর্বসম্মতিক্রমে নিজেদের দ্বারা প্রণীত আইন ও নীতির বশে স্বাধীনভাবে চলিতে পারিলে পূর্ণভাবে স্বাধীনতালাভের ইচ্ছার তৃপ্তি ঘটে। প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীপরিষদের মাধ্যমে এই আইনগুলি প্রণীত ও প্রযোজ্য হয়। শিশুদের উপর বেশী জবরদস্তী করিলে তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ব্যাহত হয় এবং আচরণে নানারূপ বৈলক্ষণ্য দেখা দেয়।

স্বাধীনতার মধ্যে শিশুদের সৃজনীশক্তির বিকাশ হয়। শিশুরা স্বাধীনতা পাইলে মাটি দিয়া ফুল, ফল ও অন্যান্য দ্রব্য নির্মাণ করে, বালি দিয়া পাহাড়, নদী ইত্যাদি বানায়। নানারকম ফেলিয়া দেওয়া জিনিষ যেমন, টিনের টুক্‌রা, কাপড়ের টুক্‌রা, কাগজ, কাঠ, কাঁচ ইত্যাদির সাহায্যে নানারকম খেলনার জিনিষপত্র তৈয়ারী করিয়া বড়দের তাক লাগাইয়া দেয়। পিচবোর্ডের টুক্‌রা ও ফেলিয়া দেওয়া কার্ডবোর্ডের বাক্সের সাহায্যে অতি সুদৃশ্য সোফা সেট, ড্রেসিং টেবিল ছেলেদের তৈয়ারী করিতে দেখা যায়। কাগজ দিয়া নৌকা, জাহাজ, এরোপ্লেন ; রঙিন কাগজ দিয়া ফুল, পাতা ও ফেষ্টুন ; কাঠের তক্তা ও তারের জাল দিয়া পোষা পশুপক্ষীর ঘর ; কাঠের টুক্‌রা দিয়া ঘর-বাড়ী, জাহাজ ইত্যাদি অসংখ্য রকমের জিনিষপত্র ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতা পাইলে সৃজন করিয়া চলে। তাহা ছাড়া ছবি আঁকা, গল্প ও কবিতা লেখা, গান গাওয়া, দল গড়িয়া তৌলা —এইসবও তাহাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই সৃজনী ক্ষমতার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে সৌন্দর্যবোধ, তাহারা শুধু গড়িতে চায় না, সব জিনিষ সুন্দর করিয়া গড়িতে চায়।

শিশুদের এই স্বতঃবিকশিত নির্মাণ ক্ষমতাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া শিক্ষার বহু কাজে লাগান যায়। কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে কর্ম ও প্রোজেক্টের মাধ্যমে সাঙ্গীকৃত পাঠদানের ব্যবস্থা আছে। মাটির ফুল, ফল, পশুপক্ষী গড়িতে গড়িতে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, উদ্ভিদ ও জীববিদ্যার জ্ঞান তাহারা আহরণ করে, গ্রামের বাড়ী, ঘর, বিদ্যালয়, পোষ্ট অফিস, রাস্তাঘাট, মাঠবাগান গড়িতে গড়িতে পরিবেশ পরিচিতি হয় এবং গ্রামের লোকসংখ্যা, জল সরবরাহ, আমদানী রপ্তানী, পরিবহন ইত্যাদি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে। আবার পুতুলঘর বানাইতে গিয়া সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা আসিয়া পড়ে।

ঘরের বায়ূচলাচলের ব্যবস্থা, গৃহের আসবাবপত্র ও আদবকায়দা, পুতুলের বিয়েতে সৌজন্য ও সামাজিক প্রথা শিক্ষা, কর্ম ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুরা অর্জন করে আবার, পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রজেক্টে পৌর প্রতিষ্ঠান তৈয়ারী এবং তাহার নক্সা আঁকিতে আঁকিতে পৌরনীতির উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা তাহাদের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

এইসব ছাড়াও শুধু নির্মাণের মধ্যেও আনন্দ ও সার্থকতা আছে। কবিতা, সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম লইয়াই মানব সভ্যতা গড়িয়া উঠে নাই। ভাস্কর্য, স্থাপত্য, কারু ও ললিত শিল্পে অবদান সভ্যতার বুনিয়াদ গড়িয়াছে। সুতরাং উন্মেষোন্মুখ শিশু-সৃজনী-প্রতিভাকে স্বাধীনভাবে প্রস্ফুটিত হইতে দেওয়া উচিত; ইহাতে তাহাদেরও আত্মতৃপ্তি হইবে ও সমাজও লাভবান হইবে।

এই চাহিদার মধ্যে পলায়ন, যুযুৎসা, কৌতূহল, আত্মজাহির, দলভুক্তি, নির্মাণ প্রবৃত্তির কার্য দেখিতে পাওয়া যায়।

যৌনসম্ভোগের চাহিদা।

মানুষের মধ্যে এই চাহিদা খুবই প্রবল থাকে। যৌবনেই যৌনবোধের সঞ্চার হয়, শিশুকালে ইহার অস্তিত্ব থাকে না—এই ধারণা ভুল। ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিকের বিকাশের মত যৌনবোধও শৈশব হইতে নানা অবস্থার মধ্য দিয়া উন্মেষিত হইতে থাকে এবং যৌবনে পূর্ণ বিকশিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মন-সমীক্ষকেরা দেখাইয়াছেন যে মাতৃস্তন ও আঙ্গুলচোষা, মলমূত্রত্যাগ এবং পিতামাতা ও বন্ধুবান্ধবীর সহিত সম্বন্ধবোধের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে যৌনচেতনা বিকশিত হয়। অবশ্য যৌবনে শরীরাভ্যন্তরে যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিতে থাকে এবং বিপরীত লিঙ্গের সহিত যৌনসঙ্গমের ও সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা জন্মে তাহা শৈশবে থাকে। শৈশবের যৌনবোধ যেন সারা দেহে ও সারা মনে ছড়াইয়া থাকে, পরে আস্তে আস্তে সংগঠিত হইয়া কাম ও রতিক্রিয়ায় পরিণত হয়।

আমাদের দেশে এখন অনেক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। অবশ্য উচ্চশ্রেণীতে আমাদের দেশে এখনও সহশিক্ষার প্রচলন তেমন হয় নাই। সহ-

শিক্ষায় ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে লেখাপড়া করে, খেলা করে, কাজ করে এবং পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীতাও করে। এইভাবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটি পারস্পরিক বুঝাপড়া ও সুস্থ মনোভাব গঠিত হইয়া উঠে, একসঙ্গে থাকিলে পরস্পরের সাহচর্য স্বাভাবিক হইয়া উঠে ; নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে তাহারা এক সঙ্গে বাড়িতে পারিলে ও নানা কাজের ও আমোদ আহ্লাদের অংশীদার হইলে পরে নরনারীর সম্বন্ধ শুভ ও কল্যাণকর হয় এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সম্ভ্রমের ভাব থাকে। নারী পুরুষকে জীবনের সঙ্গী ও সুখদুঃখের অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করে, দেবতা বা অতিমানব মনে করে না আবার পুরুষও নারীকে কেবলমাত্র সম্ভোগের বস্তু বা তুচ্ছ বা অবহেলার পাত্র হিসাবে গণ্য করে না—সর্বক্ষেত্রে নারীকে সত্যকার জীবনসঙ্গিনী করিয়া লয়।

উচ্চশ্রেণীতে সাবধানতা ও বিচক্ষণতার সহিত যৌনজীবন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ইহার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক দিকগুলির সহিত উপযুক্ত সময়ে ছেলেমেয়েদের পরিচয় করাইয়া দিলে অজ্ঞানতাপ্রসূত কু-অভ্যাস ও অসুস্থ কৌতূহল উৎপন্ন হইতে পারে না যাহার কুফল সারাজীবন হয়ত মনস্তাপের সহিত ভোগ করিতে হয়।

বিদ্যালয়ে যদি খেলাধূলার বন্দোবস্ত থাকে, চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ থাকে, পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যিক বিকাশের সুযোগ সুবিধা থাকে, দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ করিবার ক্ষেত্র থাকে, উচ্চ ও মহান জ্ঞানের, ধর্মের ও সেবার আদর্শ আচরণ ও কাজের মধ্য দিয়া দেখান হয় তাহা হইলে যৌনশক্তির উদ্গতির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। শিক্ষক সহজাত প্রবৃত্তির উদ্গতির ক্ষেত্র রচনা করিতে পারেন, সোজাসুজি উদ্গতি করাইতে পারেন না। উদ্গতি ব্যক্তির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ঘটে, ইহার মধ্যে ইচ্ছা বা চেষ্টার কোন স্থান নাই এবং সকলের মধ্যে উদ্গতি সম্ভবও নয়—ইহার জন্য বিশেষ সামর্থ্যের দরকার। বিভিন্ন মাত্রায় ও বিভিন্ন দিকে উদ্গতির সম্ভাবনা থাকে বলিয়া বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষক উদ্গতির অনুকূল কাজকর্ম, ভাবাদর্শ রাখিতে পারেন যাহাতে ছেলেমেয়েরা সামর্থ্য অনুসারে উপকৃত হইতে পারে। তবে শিক্ষককে মনে রাখিতে হইবে যৌনশক্তির সবটাই উদ্গত হইতে পারে না। যৌনবোধ, বিশেষ করিয়া

শারীরিক যৌনক্ষুধা কিশোর বয়স হইতে ন্যূনাধিক থাকিবেই এবং ইহা লইয়া শিক্ষকের খুব বেশী বিব্রতবোধ করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি তাহাদিগকে যুক্তি ও বিচারপূর্বক সংযত ও সুরুচিপূর্ণ আচরণে অভ্যস্ত করাইবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহার এই কথা মনে রাখা দরকার যে যৌনশক্তি জোর করিয়া দাবাইয়া রাখিতে গেলে মানুষের জীবন নিরানন্দ, অসুখ ও অসুস্থতায় ভরিয়া যায় এবং কখনও কখনও দুষ্ক্রিয়তা ও অপরাধের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সেইজন্য যৌনজীবন সম্বন্ধে আঁৎকাইয়া না থাকিয়া ও বৃথা উপদেশের বুলি না আওড়াইয়া ছাত্রছাত্রীদের যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে বুঝিতে দেওয়া উচিত যে ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য পালনের উদ্দেশ্য তাহাদের বিবাহিত জীবনকে অধিকতর সুখী ও উপভোগ্য করিবার জন্য। প্রথম জীবনেই যৌনজীবন সম্বন্ধে তাহাদের ভয় দেখাইলে পরে ছেলেদের যৌনসঙ্গম অক্ষমতা (impotence), মেয়েদের যৌনসঙ্গম নিরাসক্তি (frigio-lity) উৎপন্ন হইতে পারে। মোট কথা, যৌনজীবনকে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে দেখিতে হইবে, যৌনশক্তির উদ্গতির জন্য বিদ্যালয়ে সুবন্দোবস্ত রাখিতে হইবে এবং যুক্তি ও বিচারের উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য পালন করিতে উৎসাহিত করিতে হইবে।

এইখানে চাহিদার বর্ণনা শেষ করা হইল। মানুষের আচরণে আছে গতিময়তা এবং ক্রিয়াশীলতা। নানারূপ চাহিদার পূরণই এই ক্রিয়াশীলতার উদ্দেশ্য। সেইজন্য ক্রিয়াশীল আচরণকে বুঝিতে গেলে ইহার উৎস অর্থাৎ চাহিদাগুলিকে জানা দরকার। শিক্ষক এইগুলি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে ইহাদের সাহায্যে কিরূপে সফলতার সহিত শিক্ষা দিতে হইবে সে পদ্ধতি বা প্রণালী তিনি আবিষ্কার করেন। এখন তিনি প্রকৃতির বিরুদ্ধে না গিয়া প্রকৃতির সহিত সহযোগিতা করিয়া সার্থক শিক্ষক হইয়া উঠেন। আচরণের উৎসের সন্ধান জানিয়া শিক্ষক নিজেও তাঁহার আচরণকে বুঝিতে পারেন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। তাহা ছাড়া তিনি বুঝিতে পারেন যে চাহিদাগুলি মোটামুটিভাবে যদি তৃপ্ত হয় তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং তাহারা সুখী হয়। ইহাদের অতৃপ্তি আনিয়া দেয় জীবনে অশান্তি

ও অসুখ এবং এইরূপ অবস্থায় ছেলেমেয়েরা শেখার কাজে সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতে পারে না।

শিক্ষককে আরও বুঝিতে হইবে যে চাহিদাগুলি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে না। সমগ্র ব্যক্তিত্বের জীবন চাহিদার মধ্যে ইহারা মিলিয়া মিশিয়া থাকে এবং একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। আর্থিক সঙ্গতি আমরা কামনা করি কেননা নিঃস্ব অবস্থা আমাদের জীবনকে বিপন্ন করে। সুতরাং আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে প্রাণরক্ষার ইচ্ছা নিহিত থাকে। আবার বিভব ও সম্পদ আমাদের মান বাড়ায় ও অনেক সভা সমিতিতে সম্মানের আসন পাওয়া যায়। সুতরাং আত্মমর্যাদা ও দলভুক্তির চাহিদাও আর্থিক সঙ্গতি লাভের ইচ্ছার অঙ্গীভূত হইয়া যায়। অর্থ থাকিলে জীবনকে উপভোগ করিতে পারি, সুচিকিৎসার সঙ্গতি থাকায় সুস্থ থাকিতে পারিয়া স্বাধীনভাবে ইচ্ছাপূরণ করিতে পারি। সুতরাং সব চাহিদাই পরস্পরের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ঐক্যবদ্ধ আকারে ব্যক্তির ইচ্ছার মধ্যে প্রকাশিত হয়।

সর্বশেষে শিক্ষকের দেখা দরকার যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ এমন হওয়া উচিত যাহার মধ্যে থাকিয়া ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের জীবনের অভাব মিটাইতে পারে। এইভাবে তৃপ্তি ও সন্তোষ পাইলে তাহাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ অব্যাহত থাকে ও সুষমভাবে হইতে থাকে। নিশ্চিন্ততার ভাব থাকায় তাহারা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা হইতে মুক্ত থাকে, কাম্য জিনিষ পাওয়ায় ঈর্ষার ভাব থাকে না। তাহারা ভালবাসা পায় ও ভালবাসিতে পারে; সঙ্গীসাথীদের পছন্দ করে, সহজে রাগিয়া উঠে না বা অসুখী বোধ করে না এবং সমাজের সহিত বেশ সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে পারে।

অন্যপক্ষে, চাহিদাগুলি যদি অতৃপ্ত থাকিয়া যায় তাহা হইলে শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয় এবং সমাজের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে পারে না। ফলে সঙ্গীসাথীদের অবহেলা ও অবজ্ঞা তাহাদের প্রাণে বাজে এবং তাহাদের বিরূপ সমালোচনা এবং বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে, বৃথা গর্ব ও আস্ফালন করিতে পারে অথবা পূর্ব জীবনের ছেলেমানুষী ও কল্পনাবিলাসে মগ্ন

হইয়া যায় বা দুষ্ট ছেলেমেয়েদের সহিত দল পাকাইয়া অসামাজিক কাজকর্মে প্রবৃত্ত হয়।

শিক্ষককে বুঝিতে হইবে যেইরূপেই হউক শিশুরা তাহাদের প্রবৃত্তি পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করে—তাহাদের সমাজে যদি তাহারা সুযোগ না পায় তাহা হইলে নানা অননুমোদিত ও বিকৃত পথ ধরিয়া তাহারা তৃপ্তি খুঁজিয়া লয়। সেইজন্য শিক্ষক সর্বপ্রকার আচরণের পশ্চাতে যে শক্তিগুলি কাজ করিতেছে তাহা উপলব্ধি করিয়া শিক্ষাপ্রদ দিকে ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে বহাইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। শক্তিগুলিকে রোধ করিবার চেষ্টা মারাত্মক কেননা সেইগুলি তখন অনিবার্যভাবে তাহাদের ব্যক্তিত্বকে বিকৃত ও পঙ্গু করিয়া দিতে পারে এবং সমাজে আনয়ন করিতে পারে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি।

পঞ্চম অধ্যায়

শিখন প্রক্রিয়া

প্রাক্-বিত্যালয় শিশুদের শিখন।

প্রাক্-বিত্যালয় শিশুর কাছে নূতন নূতন জিনিষ শেখা খুবই চিত্তাকর্ষক। যে জিনিষ তাহার সাধ্যের মধ্যে ও যাহাতে সে সফলতা লাভ করিতে পারে তাহা শিখিতে সে খুবই আগ্রহী হয়। কি শিখিবে তাহা শুধু শিশুর উপরই নির্ভর করে না ; তাহার সমাজ পরিবেশ তাহাকে কি শিখাইতে চায়, তাহার পিতামাতা ও শিক্ষক তাহার কাছে কি প্রত্যাশা করেন এবং তাহার শিখনে কিরূপ সহায়তা দান করেন এই সকলের উপরই তাহার শিখনের প্রকৃতি ও বিষয় নির্ভর করে। শিখনের সময় তাহার আনন্দ বা বিষাদের অনুভূতি তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উপর প্রতিফলিত হয় এবং শিখনের প্রতি তাহার অনুকূল বা প্রতিকূল মনোভাব গড়িয়া উঠে।

শিখনের উপর পরিবেশের প্রভাব।

কোন কোন পরিবেশে শিশু শিখিবার জন্য কোন উৎসাহ পায় না আবার কোন কোন পরিবেশে শিশুকে শিখিবার জন্য উদ্দীপ্ত করা হয়। খেলার সামগ্রী ও উপকরণ, খেলার সাথী, বড়দের প্রয়োজন মত নির্দেশ ও সহায়তা পাইলে ২ হইতে ৬ বৎসর বয়সের শিশুরা এই সবের মাধ্যমে অনেক জিনিষ শিখিবার সুযোগ পায়। ইহার সঙ্গে থাকা চাই পিতামাতা ও শিক্ষকের যথেষ্ট স্নেহ ভালবাসা

খেলার সামগ্রী ও সরঞ্জাম।

এই বয়সের শিশুদের খেলাধূলা করিবার জন্য যথেষ্ট জায়গা, প্রচুর সময় ও তাহারা নিজের মত করিয়া ব্যবহার করিতে পারে এমন সব জিনিষপত্র দরকার। অনেক রকম খেলা ও তাহাদের উপযোগী কাজ কর্ম গৃহে বা নার্সারী স্কুলে রাখিতে হইবে যাহাতে তাহারা তাহাদের চাহিদা বা প্রয়োজনমত কাজ

বা খেলা নির্বাচন করিতে পারে। সব শিশুই একরকমের সামগ্রী বা এক রকম খেলা বা কাজ করিতে চায় না। প্রত্যেকে তাহার পছন্দমত জিনিষ-পত্র, খেলা ও কাজ বাছিয়া লয় এবং তাহার নিজের পথে শিখিতে থাকে। শিশুদের স্বয়ং নির্বাচিত শিখনের ধারাটিকে পিতামাতা ও শিক্ষকের খুব ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রকৃতির নিয়মে প্রত্যেক শিশু তাহার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা, সামর্থ্য, রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী নিজের শিক্ষার পথ নিজেই বাছিয়া লইতে চায়। পিতামাতা ও শিক্ষকের কর্তব্য শিশুর এই প্রবণতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া এবং সুকৌশলে ইহার ক্রমোন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করা। ইহার ফলে শিশু নিজেও ধন্য হইবে এবং সমাজও তাহার দানে উপকৃত হইবে। মাটি, নানা রঙবেরঙের পেন্সিল, রঙতুলি, কাঠের চতুষ্কোণ এবং ধাঁধা শিশুদের আগ্রহ সঞ্চার করে ও সৃজনাত্মক শক্তিকে জাগায়। শিশুরা মাংসপেশী সঞ্চালন ও দ্রুতগতি পছন্দ করে। তিনচাকার সাইকেল, দোলনা, খুঁড়িবার জায়গা—এই সব দিয়া তাহাদের ঐ ইচ্ছা মেটান যায়। শিশুদের উপযোগী ছোট ছোট কোদাল, নিড়ানি, ঝারি—এইসবের সাহায্যে বাগানের কাজ করিতে তাহারা খুব উৎসাহ বোধ করে; ছোট বড় বাক্স, গাছপালা, দোলনা, ঢেঁকিকল গড়ানর জন্য আড়ভাবে রাখা মসৃণ তক্তা, চড়িবার জন্য ছোট পাহাড়, দেওয়ালগাত্রে দৃঢ়বদ্ধ ছোট মই, খুঁড়িবার জন্য শাবল, খোন্তা—এইসব জিনিষই শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সহায়ক। মাটিতে সরলরেখা টানিয়া বা সমকেন্দ্রীয় কয়েকটি বৃত্ত আঁকিয়া প্রথম সরল রেখা বা কেন্দ্র হইতে দুই পায়ে বা এক পায়ে কতকগুলি রেখা বা বৃত্ত শিশু লঙ্ঘন করিতে পারে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পছন্দ করে। বস্তুত পেশী সঞ্চালনকারী সব কাজই শিশুরা পছন্দ করে।

শিশুরা জলক্রীড়া করিতেও খুব ভালবাসে। অল্প গভীর চৌবাচ্চা বা জলাধারে নাইতে পারিলে তাহারা খুব খুশী হয়। বৃষ্টির জলে থাকিতে পারিলে তাহারা আনন্দে নাচিয়া বেড়ায়। এই সব খেলাধূলা ও কাজ কর্মের মধ্য দিয়া তাহাদের দৈহিক ও ক্রিয়াত্মক শক্তির বিকাশ হইতে থাকে।

খেলার গাড়ী, খেলনা বাসন-কোসন, পুতুল, পুতুলের পোষাক পরিচ্ছদ

ও আসবাবপত্র এইগুলি লইয়া খেলিতে গেলে সঙ্গীসাথীদের লইয়া খেলিতে হয় সুতরাং সহযোগিতার ভিত্তিতে মিলিয়া মিশিয়া খেলিতে শেখে। একা একা খেলিবার মত খেলাও শিশুকে দেওয়া দরকার কারণ সব সময় দলের মধ্যে থাকা তাহার পক্ষে ক্লেশকর হইতে পারে। খেলার মধ্যে বিশ্রাম ও গল্প বলিবার সময় রাখা দরকার।

শিশু যে গৃহে থাকিবে তাহা যেন তাহার পক্ষে মনোরম হইয়া উঠে। ঘরের মেঝেটি বেশ চকচকে হওয়া দরকার, সম্ভব হইলে চকমকি বা মার্বেল পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দিলে ভাল হয়। শিশুর বসিবার উপযোগী ছোট রঙিন আসন বা চেয়ার টেবিল, ছোট ছোট টবে রক্ষিত ফুল গাছ, কাঁচপাত্রে লালমাছ, ছবির বই ও খেলনা রাখিবার তাক—এইগুলি তাহার ঘরে রাখিলে সে প্রসন্নচিত্তে তাহাতে বাস করিতে চাহিবে।

শিশু যে ঘরে বা স্থানে থাকিবে তথাকার জিনিষপত্র যেন সুন্দর ও সুবিন্যস্ত থাকে। ঘরের সঙ্গে মানাইয়া সব জিনিষ রাখা চাই এবং রঙেরও সঙ্গতি থাকা চাই। অপ্রয়োজনীয় জিনিষ সরাইয়া ফেলা উচিত। দেওয়ালে দুটি একটির বেশী ছবি রাখিবার দরকার নাই—একই ছবি না রাখিয়া মাঝে মাঝে বদলাইয়া দিলে তাহারা খুশী হয় এবং ছবির প্রতি আকৃষ্ট হয়। চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জাম রাখিয়া দিলে তাহারা ছবি আঁকিয়া নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে। গ্রামোফোন ও রেডিওর সাহায্যে তাহাদের চিত্ত-বিনোদনের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

খেলার সাথী।

সমবয়সীদের সাহচর্যে শিশুর সামাজিক বিকাশ ঘটিতে থাকে এবং শিখিবার আগ্রহ জন্মায়। সমবয়সীদের দলে খেলিবার ইচ্ছা তাহাকে আত্মনিয়ন্ত্রণও শিক্ষা দেয় কেন না দলের মধ্যে মানাইয়া চলিতে গেলে নিজের খেয়াল খুশী মত চলিলে হয় না নিজেকে খানিকটা সংযত করিতে হয়। দলের কাহাকেও মারধোর করিলে বা নিয়ম না মানিলে দলের অন্য শিশুরা আপত্তি করে এবং তাহাকে দল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলে। তখন শিশু বুঝে যে দলে

থাকিতে গেলে সকলের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে হইবে। এইরূপে দলের প্রভাবে সে শৃঙ্খলাবোধে অভ্যস্ত হইতে থাকে।

এই বয়সের শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা লাজুকতা দূর করা যায়। তাহাদের মধ্যে আত্মজাহির বা আত্মপ্রাধান্যের ইচ্ছা খুব কম দেখা যায়। নানারকম জিনিষ তৈয়ারী ও ছোট ছোট সমস্যামূলক কাজ করিতে দিয়া ও গল্প বলিতে দিয়া ও অন্য সামাজিক শিশুদের সহিত মিশিতে দিয়া লাজুক শিশুদের মনে আত্মবিশ্বাস আনিতে হয়; তখন তাহারা স্বাভাবিকভাবে আত্মজাহির করিতে সচেষ্ট হয় এবং সঙ্গীদের মধ্যে নিজেদের স্থান করিয়া লয়। এই সময়ই লাজুকতা কাটাইয়া উঠিতে না পারিলে সারা জীবনেই লাজুকতা ব্যক্তিত্বের অঙ্গ হইয়া থাকিতে পারে এবং চিরদিনের জন্য আত্মপ্রকাশের বাধা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্তরায় হইয়া থাকে।

বড়দের নির্দেশ ও সহায়তা।

পূর্বে স্বয়ং নির্বাচিত শিখনের ধারার কথা বলা হইয়াছে। মূলত যদিও এই ধারাই পুষ্টি সাধন করা প্রয়োজন কিন্তু প্রয়োজনস্থলে বড়দের নির্দেশ ও সহায়তা দরকার হয়। যেই স্থলে শিশুরা নিজেদের চেষ্টায় নূতন কিছু শিখিতে চায় না সেই স্থলে বড়রা নির্দেশ দিয়া তাহাদের অভিপ্রেত কার্যে নিযুক্ত করাইতে পারেন। যেমন, যে শিশু সামাজিক হইতে পারিতেছে না তাহাকে যদি এমন সব খেলনা দেওয়া যায় যাহা অন্য শিশুদের সহিত একসঙ্গে খেলিতে হয় তাহা হইলে একত্র খেলার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সাথীদের মেলামেশা করিতে পারিবে। সেইরকম, যে শিশু হয়ত দৌরাত্ম করিয়া বেড়ায় তাহাকে শান্ত করিবার জন্য খেলনা দেওয়া যাইতে পারে। যে শিশু নড়াচড়া না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিতে চায় তাহাকে এমন জিনিষ দেওয়া দরকার যাহাতে তাহার গতিবিধি বেশ বাড়িয়া যায়।

কিরূপ নির্দেশ শিশুর পক্ষে কার্যকরী শিক্ষককে সে বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। আড়াই হইতে সাত বছর বয়সের শিশুরা উৎসাহব্যঞ্জক, সদর্থক ও ধীরভাবে তাহাদের কি করিতে হইবে ভাল করিয়া বুঝাইয়া নির্দেশ দিলে

তাহারা ইচ্ছাসুখে তাহাদের উপর ভারার্পিত কাজ অনেকক্ষণ ধরিয়া করে। নির্দেশ যদি নিরুৎসাহকর, নঞর্থক এবং খুব তাড়াতাড়ি সাধারণভাবে দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাতে শিশুরা তেমন সাড়া দিতে চায় না। যেমন, "ছবিটিতে রঙ দাও, ইহা খুব সোজা," একথা বলিলে শিশু যত উৎসাহিত হইবে তত "ছবিটিতে রঙ দিবে কি? রঙ ফলান খুব কঠিন" এইরূপ নির্দেশ দিলে হইবে না। উপযুক্তস্থলে শিশুদের কাজ সম্বন্ধে মন্তব্য করাও ভাল। ছোট শিশুদের মধ্যে প্রতিযোগিতার কোন ভাব দেখা যায় না। সেইজন্য "টুকলুর মত তুমি কি ভাল মাটির পুতুল বানাইতে পার?" এইরূপ নির্দেশে বিশেষ কিছু কাজ হয় না। তাহার চেয়ে যদি শিশুকে বলা হয় "আর একটি পুতুল তৈয়ারী কর," তাহা হইলে সে কাজে লাগিয়া যায়। শিশুদের ভুলের বিরূপ সমালোচনা অপেক্ষা তাহাদের কৃতকার্যতার প্রশংসা অনেক বেশী কার্যকরী হয়।

শিক্ষক শিশুদের নানাভাবে সহায়তা করিতে পারেন। শিশুর সমস্যা সমাধান যখন সাফল্যের পথে তখন তাহাকে উৎসাহিত করিয়া কোন কাজ করিতে না পারায় যখন নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছে তখন তাহাকে পরামর্শ দিয়া বা কাজের কিছু অংশ করিয়া দিয়া ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে যখন অবহেলা বা এড়াইয়া যাইবার ভাব দেখাইতেছে তখন তাহার সহিত দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করিয়া শিক্ষক বা পিতামাতা শিশুকে শিখিবার কাজে সহায়তা করিতে পারেন।

শিশুর শিক্ষায় তাড়াহুড়ার কোন স্থান নাই। যে বিষয়ের জন্য শরীরে ও মনে শিশু প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই তাহা শিখিবার জন্য তাহাকে পীড়াপীড়ি করিলে শিশুর মনে অসামার্থ্য ও হারিয়া যাওয়ার ভাব উৎপন্ন হয়; এবং এই ভাব মনে গাঁথিয়া গেলে অন্য কাজ যাহা সে চেষ্টা করিয়া দেখে নাই তাহা করিতে গেলেও অকৃতকার্যতার ভয় জাগিয়া উঠে এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবে সফলতা লাভ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। আবার অন্যদিকে কোন কৌশল বা নৈপুণ্য শিখিবার জন্য যখন শিশু দেহে ও মনে পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত তখন তাহাকে তাহা শিক্ষার সুযোগ না দিলে সে সুবর্ণসুযোগ জীবনে আর ফিরিয়া আসে না, অর্থাৎ তখন দেহমন সম্পূর্ণ উপযোগী থাকায় সেই কাজে সবচেয়ে বেশী আগ্রহ

সঞ্চার হইত এবং শিক্ষা শীঘ্র ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারিত। পরে শিখিতে গেলে আগ্রহের অভাব হয় এবং সন্তোষজনকভাবে ও দ্রুততার সহিত শিক্ষা হয় না।

প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরের প্রথমদিকে নিম্নোক্ত অবস্থাগুলি শিশুশিক্ষার সহায়ক বলিয়া দেখা গিয়াছে।

শিশুকে যথেষ্ট সুযোগ দিতে হইবে যাহাতে সে নিজেই ভাবিয়া চিন্তিয়া কি করিবে না করিবে তাহা ঠিক করিবে এবং তাহার দায়িত্ব উত্তরোত্তর গ্রহণ করিতে শিখিবে।

আগেই বলা হইয়াছে যে এই বয়সে শিশুকে যথেষ্ট সময় দিতে হইবে, তাড়াহুড়ার মধ্যে সে কিছু শিখিতে পারে না। তাহা ছাড়া যাহা তাহার সাধ্যে কুলায় এইরূপ কাজই দিতে হইবে। যতটুকু তাহার প্রয়োজন ততটুকু সাহায্যই করা উচিত তাহার বেশী নয়। তাহার আচরণের ভালর দিকটার উপরই জোর দিতে হইবে।

দয়া ও সুবিবেচনার উদাহরণ তাহার সম্মুখে রাখিতে হইবে যাহাতে সে গুণগুলি অনুকরণ করিতে পারে।

পরিবারে শিশুদের মধ্যে তুলনামূলক কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। ইহাতে শিশুদের মনে হীনমন্যতা ও অবাঞ্ছিত আচরণ সমস্যা উদ্ভব হইতে পারে।

কৃতকার্য হইবার শিক্ষা।

শিখিবার বিষয় যখন সাধ্যাতীত থাকে তখনই শিখনের অসুবিধা দেখা যায়। শিশু যদি অনুভব করে যে সে ক্রমাগতই অসফল হইতেছে তাহা হইলে শিখনের চেষ্টা সে ছাড়িয়া দিতে চায়।

শিশুদের দেখাইতে হইবে যে অসফল হইলে দমিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। অসাফল্যের কারণগুলি কি জানিতে হইবে যাহাতে পরের বারের চেষ্টায় ভুলত্রুটিগুলি আর না থাকে। সুতরাং অসাফল্য হতাশার কারণ নয়, শিখিবার সুযোগ। যে সব শিশুদের মধ্যে কিছুটা আত্মবিশ্বাস জন্মিয়াছে অসাফল্যে তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়ে না। অনেক শিশু অকৃতকার্য হইলে পুনর্বার

চেষ্টা করিতে পরাঙ্মুখ হয় বা বার বার সাহায্য প্রার্থনা করে বা অসাফল্যের আক্রোশে বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি ধ্বংসাত্মক আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় অথবা চেঁচামেচি করে বা চটিয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় শিশুদের ক্ষমতা বুঝিয়া শিশুদের কাজের ক্রম এমন হওয়া উচিত যাহাতে প্রথমে তাহারা কৃতকার্যতার আনন্দ লাভ করিতে পারে এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মায়। ইহার পর আস্তে আস্তে অধিকতর কঠিন কাজ তাহাদের দিতে হইবে তখন তাহারা বেশী অধ্যবসায়ের সহিত তাহা করিবে এবং কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকেই সাফল্য লাভের চেষ্টা করিবে। মধ্যে মধ্যে শিক্ষক প্রশংসাসূচক উক্তি করিয়া তাহাদের উৎসাহিত করিবেন কিন্তু কদাপিও তাহাদের কাজ তিনি করিয়া দিবেন না। এইরূপ অবস্থায় অসুবিধার সম্মুখে পড়িয়া আর বেশী কাঁদাকাটি, রাগা রাগি করে না বা ঘনঘন অন্যের সাহায্যের কাঙাল হয় না, নিজের চেষ্টায় অসুবিধাকে অতিক্রম করিয়া কৃতকার্য হইবার চেষ্টা করে।

ভাষা শিক্ষা।

শিশুর অভিজ্ঞতা যত বাড়িতে থাকে ততই তাহার ভাষাজ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। ভাষার সাহায্যে সে ক্রমে চিন্তা করিতে শেখে।

সামাজিক বোধের প্রভাব।

সামাজিক আদানপ্রদান ও আচার ব্যবহারের জন্য তাহার ভাষার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অনুকরণের দ্বারা সে ভাষা শিখিতে থাকে। প্রথমে আদেশ মানা ও নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করাই ভাষার প্রধান কাজ থাকে। বড়রা শিশুকে বলে, "দুধ খাও", "খেলা কর", "ঘুমাও," আবার শিশু "পুতুল দাও", "বেড়াতে চল", "খেতে দাও" —এইভাবে নিজের ইচ্ছা জানায়। অনেক সময় দেখা যায় সে একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে। মনে হয় এইরূপ পুনরাবৃত্তির দ্বারা কথা ও প্রত্যাশিত কাজের সে সংযোগ স্থাপন করিতে চায়।

শিশুর হঠকারীতাকে যদি প্রত্যেকবারই নিন্দা করা হয় এবং তাহার যে কাজ যুক্তি ও বিবেচনাপূর্ণ হয়, তাহার প্রশংসা করা হয় তাহা হইলে শিশু তাহার কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে।

প্রথম কথা বলিতে শিখিবার সময় শিশুকে বস্তু ও ঘটনার সহিত মিলাইয়া মিলাইয়া ঠিক শব্দ ও বাক্য বাছিয়া লইতে হয়। বিড়ালকে কুকুর বলিলে শুধরাইয়া দেওয়া হয়। পরে অন্য লোকে বস্তু ও ঘটনাকে যেভাবে বর্ণনা করে পাছে তাহা হইতে তাহার বর্ণনা ভিন্ন হইয়া যায় সেইজন্য সে ত্রস্ত হইয়া পড়ে।

তাহা ছাড়া, শিশু যাহা মুখে বলে তাহা কার্যে পরিণত করিতেও তাহাকে শিখিতে হয়। তাহাকে তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে হয় ও পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে হয়। তাহাকে কাজের সঙ্গে কথার সঙ্গতি বিধান করিতে হয়। তাহা ছাড়াও মনের অনুভূতিগুলিরও মিল সাধন করিতে হয়। সে যখন মনের দুঃখে কাঁদিতেছে তখম আমি ভাল আছি একথা বলিতে পারে না আবার যখন আনন্দিত চিত্তে খেলিতেছে তখন আমি দুঃখিত বলা যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তাহা তাহাকে বুঝিতে হয়।

এইভাবে সামাজিক সম্বন্ধ ও ব্যবহার এবং অনুভূতির উপলব্ধি ও প্রকাশ শিশুর ভাষা বৃদ্ধি ও যথাযথ ব্যবহারে যথেষ্ট সাহায্য করে, আবার, ভাষার বিকাশ ও উপযোগিতা উপলব্ধির ফলে শিশুর সামাজিক আচরণও সত্য ও উচ্চশ্রেণীর হইতে থাকে। দুইই দুইয়ের পরিপূরক।

ভাষা শিক্ষার সামর্থ্য অসামর্থ্য।

পিতামাতা ও শিক্ষককে একথা বুঝিতে হইবে যে সমস্ত শিশুর ভাষা শিক্ষার ক্ষমতা সমানভাবে থাকে না। ভাষা সম্বন্ধে স্মরণশক্তির এবং শব্দের মধ্যে পার্থক্য বিচারের অভাব অনেক শিশুর মধ্যে দেখা যায় এবং তাহাদের নির্বোধ বলিয়া মনে হয়। শিশুর ভাষা শিক্ষার সামর্থ্য অসামর্থ্যতা সম্বন্ধে বিবেচনা না করিয়া তাহাকে ভাল করিয়া কথা বলিবার জন্য বেশী তাড়না করিলে বাধা ও দ্বন্দ্বেরই সৃষ্টি হয়। শিশু হয়ত অপরিপক্বতা, অনভিজ্ঞতা বা মানসিক শক্তির অভাবের জন্য ভাষা শিক্ষায় আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। এইক্ষেত্রে অলসতা ও একগুঁয়েমীর জন্য সে শিখিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা এবং তজ্জন্য শাস্তি বিধান করা অতীব অন্যায়।

ভাষা শিক্ষার পরিবেশ।

যে স্থলে শিশুর যথার্থ প্রয়োজন বা অভাববোধ থাকে যাহা তাহাকে কথা বলিয়া ব্যক্ত করিতে হয় এবং যাহার ফলে তাহার অভাববোধ মেটে সেস্থলে শিশু নিজের গরজেই ভাষা শিখিতে চায়। যখন কোন বস্তু বা প্রাণীর সম্বন্ধে শিশুর আগ্রহ খুব প্রবল থাকে সেই শুভমুহূর্তেই বস্তু বা প্রাণীর নামের সহিত তাহাকে পরিচয় করাইয়া দেওয়া উচিত। মুগ্ধনেত্রে যখন শিশু বেলুন দেখিতেছে তখন মৌখিক ভাবে বেলুনের নাম বলিয়া দিয়া পরে লেখা নামের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে হয়। এইভাবে ভাষারূপ প্রতীকের সহিত আসল বস্তুর যোগাযোগ ঘটানর মধ্য দিয়া শিশুর ভাষা শিক্ষা সফলভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। যে শিশুরা বাড়ীর ভিতর ও বাহিরে নানারকম খেলনা লইয়া খেলা করিতে পায়, সহরে বা গ্রামে, মাঠে ময়দানে ও পাহাড় পর্বতে বেড়াইবার সুযোগ পায়; যাহাদের বাড়ীতে বাগান আছে; যাহাদের চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, সার্কাস, বনভোজনে লইয়া যাওয়া হয়; যাহারা নার্সারী ছড়া ও গল্প শুনিতে পায় এবং যাহাদের খেলার সঙ্গীসাথী ও পোষা জীবজন্তু আছে তাহারা তাহাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিবার তাগিদে অনেক কথা শিখিয়া ফেলে।

বড়রা শিশুদের সহিত যখন একত্রে থাকিবেন তখন কিছু কথাবার্তা শিশুদের মতন করিয়া বলা দরকার। ইহাতে শিশুরাও উৎসাহিত হইয়া তাহাদের মনের কথা বলে। এইভাবে শিশুদের সহিত কথাবার্তা কহিলে শিশুরা ভাষা প্রয়োগ করিতে শেখে।

গল্প।

এই বয়সে শিশুদের জীবনে গল্প একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকে। তাহাদের পরিচিত জিনিষ ও ঘটনা লইয়া রচিত গল্প শুনিতে তাহারা খুব ভালবাসে। ঘোড়ার ডাক, গাধার ডাক, শিয়ালের কাহুয়া, হাসের প্যাকপ্যাক ইত্যাদি শব্দ গল্পে থাকিলে তাহারা খুব মজা অনুভব করে। চলন্ত জিনিষের দিকে তাহাদের মনের খুব টান থাকে। চলন্ত গাড়ী, ঘোড়া,

মানুষ তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। গল্পের মধ্যে যেখানে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আছে তাহা শুনিতে তাহাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না ; কিন্তু যখনই ঘটনা আরম্ভ হয় তখন তাহারা একাগ্র হইয়া শুনে।

শিশু-ছড়া তাহাদের খুব প্রিয়। মুখস্থ করিয়া তাহারা ইহা বারবার বলিতে থাকে। বার বার বলিয়া শিশুরা তাহাদের গভীর অনুভূতিকে প্রকাশ করে। শিশু ছড়াগুলিতে আপাতঃ অসঙ্গতি দেখা যায় কিন্তু সেইগুলি শিশুমনের অবাধ ভাবানুষঙ্গ ও কল্পনাকে প্রকাশ করে এবং ইহার ধ্বনি তাহাদের মুগ্ধ করে ; যেমন,

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর—
নদেয় এল বান,
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে
তিন কন্যা দান।
এক কন্যা রাধেন বাড়েন,
এক কন্যা খান।
আর এক কন্যা গোঁসা করে
বাপের বাড়ী যান।"

যুগে যুগে এই বহু পুরাতন ছড়া শিশুমনে নূতন হইয়া দেখা দেয়—সুর করিয়া ছড়া কাটিতে কাটিতে তাহারা আর সব ভুলিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের রচিত ছড়ার একটুক্‌রা দেওয়া গেল।

"গলদা চিংড়ি তিংড়ি মিংড়ি
লম্বা দাঁড়ার করতাল,
পাকড়াশিদের কাঁকড়া ডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর,
লেজখানা যায় ছিড়ে,
পালতে মাদার, সেরেস্তাদার—
কুটছে নূতন চিঁড়ে।"

সব সময় ছড়ার অর্থবোধ না হইলেও ধ্বনির মনোহারিত্বই তাহাদের আকর্ষণ করে।

শিশুদের সরল গল্পে হাস্যরসও থাকা চাই। পরিচিত জিনিষ যদি অদ্ভুত অবস্থায় দেখে তাহা হইলে তাহারা খুব আমোদ পায়। গরু, ঘোড়া, ছাগল ইহারা যদি মানুষের মত কাপড় জামা পরিয়া থাকে এবং কথাবার্তা কয়, অথবা গরু যদি গাছে চড়ে, বাঘ যদি নিরামিষ খায়, হাতী যদি গর্তে পড়িয়া যায়, নেংটি ইঁদুর যদি বিড়ালের নাকে সুড়সুড়ি দেয়, গণ্ডার যদি হাসে—এই সব আশ্চর্য ও মজার জিনিষ তাহারা শুনিতে খুব ভালবাসে।

এখন পর্যন্ত নিজের কাজকর্ম ও অভিজ্ঞতাগুলিই তাহার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ; সেইজন্য গল্প তাহার এই সব পরিচিত জিনিষ ও অভিজ্ঞতা লইয়াই রচিত হওয়া উচিত। গল্পের মধ্য দিয়া অন্যদের সম্বন্ধে শিশুর সহানুভূতি ও উপলব্ধি জন্মায় ; বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া অন্যরা কি অনুভব করে তাহা সে বুঝিতে আরম্ভ করে। গল্পে কোন্ কাজগুলি ঠিক এবং কোন্‌গুলি নয় তাহা এবং কোন্ পরিস্থিতিতে কি করণীয় তাহা দেখান হয় এবং অনেক মনের মত কাজেরও হদিশ পাওয়া যায়।

শিশুদের ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতাগুলিকে একত্রে সাজাইয়া গল্প বানান যাইতে পারে। শিশু ভাত খায়, ক্ষেতে ধানগাছ জন্মাইতে দেখে, বাজারে চাউল বিক্রয় হইতে দেখে। এই বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলিকে একসূত্রে গাঁথিয়া সে যে ভাত খায় তাহা কোথা হইতে কিরূপে আসে তাহার গল্প শোনান যায়।

শিশুদের গল্পের কাহিনী ও ভাষা সরল ও সুবোধ হওয়া দরকার কারণ এই বয়সে তাহারা শব্দগ্রথিত করিয়া সরল বাক্য গঠন করিতে শিখিয়াছে।

শিশুশিক্ষায় রূপকথারও স্থান আছে। অনেক সময় শিশুদের অবদমিত ইচ্ছা রূপকথায় ছাড়া পায় এবং ইহাতে তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে। যাহা হউক এই সব গল্প শুনিলে শিশুরা শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়। গল্পে যদি অতিরিক্ত আতঙ্ক বা নিষ্ঠুরতার বর্ণনা না থাকে তাহা হইলে স্বাভাবিক শিশুর এই সব গল্প শুনিয়া কোন ক্ষতি হয় না বরঞ্চ এই বয়সের

রুচি স্বভাবে ক্রমাগত বাস্তবের শিক্ষা তাহাদের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে। রূপ কথায় কল্পনার রাজ্যে তাহারা একটু ছাড়া পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

বাজারের শিশু পাঠ্য ছড়া, ছবি, গল্পের বই বাহির হইয়াছে। এইগুলি সংগ্রহ করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে গল্পগুলি সত্যই উপভোগ্য হইয়াছে কিনা, গল্পের কাহিনী, চরিত্র ও ভাষা সবই কি শিশুদের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে—এই সকলের মধ্য দিয়া জীবন সম্বন্ধে তাহারা কতটা অন্তদৃষ্টি লাভ করিতে পারিবে।

স্মরণ রাখিবার শিক্ষা।

এই বয়সের শিশুরা অনেক কথা ভুলিয়া যায়। ইচ্ছা থাকিলে অনেক কথা স্মরণ রাখা যায়। সেইজন্য স্মরণ রাখিবার আগ্রহ তাহাদের মধ্যে জাগাইতে পারিলে তাহারা মনে রাখিবার চেষ্টা করে। নানাভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ইহা করা যাইতে পারে যেমন, "কাল যখন ষ্টেশনে বেড়াইতে গিয়াছিলে তখন কি কি দেখিয়াছিলে?" "দিদি তোমায় বাগানে লইয়া গিয়া কি কি ফুল তুলিয়াছিল?" "আজ কি দিয়া ভাত খাইয়াছ?" "দাদার ঘুড়ি যখন কাটিয়া গেল তখন দাদা কি করিল?" শিশুর সহিত কথাবার্তায় প্রসঙ্গ-ক্রমে শিশুকে এইভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে তাহার দেখাশুনা জিনিষগুলি গুছাইয়া লইয়া ভাল করিয়া বর্ণনা করিতে হয় এবং সে যখন বুঝে যে তাহার কথা বড়দের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেছে তখন সে তাহার অভিজ্ঞতাগুলি মনে রাখিবার চেষ্টা করে ও বর্ণনা করিবার মতন করিয়া গুছাইয়া লয়।

নার্সারী ছড়াগুলি সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে করিতে শিশুরা মুখস্থ করিয়া ফেলে। খুব ছোট বয়সে পুরা গল্প মনে রাখিতে পারে না তবে দুই তিনবার গল্প শুনিবার পর গল্প বলিবার সময় মাঝে মাঝে থামিলে তাহারা গল্পের অংশ বলিয়া দিতে পারে। একটু বড় হইয়া তাহারা পুরা গল্প বলিতে পারে।

সাথীদের সহিত মানাইয়া চলিবার শিক্ষা।

এই বয়সে শিশুরা আত্মকেন্দ্রিক ও প্রভুত্বপরায়ণ থাকে। অন্যদের সহিত

মানাইয়া চলিতে গেলে সহানুভূতি ও সহযোগিতা দরকার। এখন হইতেই স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা তাহাদের ঐ পথে লইয়া যাইতে হইবে। এই কাজে ধৈর্য ও কৌশল দুয়েরই প্রয়োজন।

অনেকে শিক্ষা বলিতে কেবল লেখাপড়া বুঝেন কিন্তু জীবনের পথে সুখে শান্তিতে চলিতে গেলে যে ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের নানাদিকের শিক্ষার প্রয়োজন হয় তাহা তাঁহাদের উপলব্ধি করা উচিত। লোকজনদের সহিত মানাইয়া চলিতেও যে শিখিতে হয় এবং এই শিক্ষার গুরুত্ব যে অনেকের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তাহা সমাজের অনেক লোককে দেখিলেই বুঝিতে কষ্ট হয় না। সকলের সুখসুবিধার সহিত নিজের সুখসুবিধা মিলাইয়া দেখা, অন্যদের কাজের গুণগ্রাহীতা, সুবিবেচনা ও সহৃদয়তা—এই সব সামাজিক জীবনের অভ্যাস ও হৃদয়বৃত্তির দিকগুলির শিক্ষা এই বয়সেই আরম্ভ হওয়া উচিত। ইহার বুনিয়াদ এই বয়সেই স্থাপিত হয়। পিতামাতা ও শিক্ষক যদি সৌজন্য-পরায়ণ হন এবং অন্যদের প্রতি অকৃত্রিম বন্ধুত্বের ভাব দেখান তাহা হইলে ছেলেমেয়েরাও সেই উদাহরণ দেখিয়া তাহারাও তাহাদের মনোভাব অকপটভাবে সামাজিক আকারে প্রকাশ করিতে শেখে।

যতদূর সম্ভব শিশুদের সামাজিক সম্বন্ধে সমস্যা মিটাইবার চেষ্টা ও নেতৃত্ব করিবার ইচ্ছাকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। ভাব ও আড়ির মধ্য দিয়া, কর্তৃত্ব-পূর্ণ নেতৃত্ব ও সহানুভূতিশীল নেতৃত্বের মধ্য দিয়া কি করিলে তাহারা সুখী হইতে পারে ইহা পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া উপলব্ধি করে এবং নিজেদের চাহিদার যাহাতে তৃপ্তি হয় এইরূপ করিতে গিয়া সামাজিক লেন দেনের মনোভাব ও কৌশল স্বাভাবিকভাবে শিখিতে থাকে। এই বিষয়ে কোন শিশু অপারগ হইলে বড়রা তাহাকে সামাজিক সঙ্গতি ও সঙ্গীদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে সহায়তা করিতে পারেন।

জোর করিয়া বন্ধুত্ব চাপাইয়া দেওয়া যায় না। সেইজন্য শিশুরা যখন একত্রে থাকিয়া একে অপরকে বুঝিবার চেষ্টা করে তখন উপযাচক হইয়া বড়দের হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। সাথীদের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ যেন শিশুর পক্ষে সুখকর হয়। প্রথমেই যদি সে আক্রান্ত হয় তাহা হইলে অন্যদের সহিত

বনিবনা হওয়া সুদূর পরাহত হইয়া যায়। তাহা ছাড়া শিশুরা একসঙ্গে বসিয়া থাকে না, সচলভাবে নানারকম খেলা করিতে থাকে। সেইজন্য শিশুকে তাহার সমবয়স্কদের সহিত খেলিবার কৌশল শিখাইতে হয়। যেমন, ট্রাই-সাইকেল চালান, বল খেলা, কোন কিছুর উপর চড়া ইত্যাদি।

অপেক্ষা করিতে শিক্ষা।

শিশুরা যখন কোন অভাব বোধ করে তৎক্ষণাৎ তাহা পাইতে বা মিটাইতে চায়। ক্ষুধাতৃষ্ণা পাইলে, কোন কাম্য বস্তু পাইতে ইচ্ছা করিলে তাহারা কাল-বিলম্ব না করিয়া তখনই তাহার নিবৃত্তি বা ইচ্ছাপূরণ করিতে চায়। সমাজে থাকিতে হইলে নানা কারণে আমাদের অভাব মিটান বা ইচ্ছাপূরণ কমবেশী সময়ের জন্য স্থগিত রাখিতে হয়। শিশুদিগেরও এখন হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে সে ধৈর্যের সহিত সন্তুষ্টচিত্তে ইচ্ছাপূরণের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে। বিকালে চিড়িয়াখানা যাওয়া হইবে, খোকা আবদার ধরিয়াছে সকালেই যাইতে হইবে। তাহাকে বুঝাইতে হইবে এত সকাল সকাল যাওয়া সম্ভব নয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রিয় খেলাগুলি ইতিমধ্যে খেলিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে। প্রিয় খেলা খেলিতে থাকিলে অপেক্ষা করা তাহার পক্ষে সহজ হইয়া উঠে। শিশুরা মনে করে তাহাদের অভাব বা আকাঙ্খা সঙ্গে সঙ্গে মিটান যাইবে না কেন। কিন্তু জীবনের পথে চলিতে চলিতে বুঝিতে পারে কিছু পরিমাণ আশাভঙ্গ, প্রত্যাখান ও বেদনা জীবনে অনিবার্যরূপে ভোগ করিতেই হয়। যতটা সম্ভব শিশুকে তাহার ইচ্ছামত চলিবার স্বাধীনতা দিলে এবং স্নেহপূর্ণভাবে যদি তাহাকে সমাজের নিয়ম মানিতে বলা হয় তাহা হইলে বড়দের কথামত চলিবার সম্ভাবনা তাহার বেশী থাকে।

ন্যায্য কাজ করিবার শিক্ষা।

শিশুর সমাজানুমোদিত কাজের প্রশংসা করিলে সে তাহাতে অভ্যস্ত হইতে অনুপ্রাণিত হয়। যে কাজ করিলে শিশু অনুমোদন পায় না বরং

নিন্দিত হয় এবং এমন কি শাস্তিও পাইতে হয় সেই কাজ তাহার চোখে ভুল ; আবার যে কাজের জন্য সে প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয় তাহা তাহার কাছে ঠিক। ভুল ও ঠিকের বিচার তাহার যদি নিয়মিতভাবে এইরূপে পুষ্ট হইতে থাকে তাহা হইলে সে সামাজিক মানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এইকথা মনে রাখিতে হইবে যে স্থূল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই শিশু ভালমন্দর পার্থক্য বুঝিতে পারে, সূক্ষ্ম নৈতিক বিচার বুদ্ধির মাধ্যমে নহে।

অনেকে মনে করেন যে এত অল্প বয়সে চরিত্রের শিক্ষার কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এই বয়সেই শিশুর জীবনে তাহার পিতামাতা ও শিক্ষকের মনোভাব, উপদেশ ও উদাহরণ গভীর ছাপ আঁকিয়া দেয়। অধ্যবসায়, অন্যদের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যান্য অভীপ্সিত আচরণের প্রাথমিক শিক্ষা এই বয়সেই সে পিতামাতা ও শিক্ষকের নিকট হইতে পাইতে থাকে।

শিশু ভাষা বুঝিবার পূর্বেই গৃহপরিবেশের হৃদয়বৃত্তির স্পন্দন বুঝিতে পারে। বাড়ীতে অন্য লোকদের প্রতি আস্থা ও সত্যকারের সৌহার্দ ও সম্প্রীতির ভাব যদি দেখান হয় তাহা হইলে শিশুও জীবনকে সেই দৃষ্টি দিয়া দেখে এবং তাহার মনেও মানব প্রীতি অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। বাড়ীতে সর্বদা যদি একটি শৃঙ্খলা ও নৈতিকবোধের ভাব বিরাজ করে তাহা হইলে ইহাকেই শিশু জগতের নিয়ম বলিয়া মনে করে এবং সানন্দে মানিয়া লয়।

তবে শিশুর সব ভাল কাজেরই অতিরিক্ত প্রশংসা করার দরকার নাই। ইহাতে সে প্রশংসা-লোলুপ হইয়া পড়ে। অন্যদিকে তাহার কাজের নিন্দার দ্বারা শিশু যেন নিজেকে পরিত্যক্ত না মনে করে। এইরূপ অবস্থায় ভয়, উৎকণ্ঠা ও অপরাধ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। পাপবোধের দ্বারা সমাজকে মানিতে বাধ্য হইলে আত্মাবমাননাই হয়।

ভয় না পাওয়ার শিক্ষা।

ভয়কে জয় করিতে হইলে ভয়ের মুখোমুখী দাঁড়াইতে হয়, ভয়কে এড়াইয়া গেলে বা ভয় হইতে পলাইয়া গেলে হয় না। আমরা অনেক অভিপ্রেত জিনিষ ভয়ের জন্য করিতে পারি না। শিশুরা অনেক জিনিষে ভয় পায় ; তাহার মধ্যে

উচু জায়গার ভয় ও অন্ধকারের ভয় অন্যতম। উপদেশ দ্বারা ভয় তাড়ান যায় না। যদি শিশুকে উঁচু জায়গার ভয় হইতে মুক্ত করিতে হয় তাহা হইলে শিশুকে উচু জায়গায় লইয়া যাইতে হইবে। প্রথমে যদি সে একা যাইতে ভয় করে তবে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। ভয়ের পরিস্থিতির মধ্যে যাওয়ার সহিত যদি সুখপ্রদ অভিজ্ঞতা যুক্ত হয় তাহা হইলে ভয় জয় করা খুব সহজ হইয়া যায়। উচ্চ স্থান হইতে যদি সে প্রিয় খেলনাগুলি লইয়া আসিতে পারে তাহা হইলে ক্রমে সে একলাই উচ্চস্থানে যাইতে সাহসী হয়। এইভাবে অন্ধকার ঘরে যদি সে প্রিয় বস্তুর সাক্ষাৎ পায় এবং অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালা ও নিভাইবার কৌশল আয়ত্ব করিতে পারে তবে ক্রমশঃ সে অন্ধকারের ভয়ও জয় করে। ভয়ের পরিস্থিতিতে সক্রিয় থাকিয়া কৌশল ও দক্ষতার সহিত কিভাবে তাহাকে উপভোগ্য করা যায় বা আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায় তাহার শিক্ষা শিশু উপযুক্ত সহায়তা পাইলে লাভ করিতে পারে।

অনেক সময় বাবামাকে দেখিতে না পাওয়ায় অন্ধকার ঘরে শিশু ভয়ে ঘুমাইতে চায় না। মা যদি এই সময় তাহার কাছে থাকিয়া সে কি করিয়া তাহার পুতুল, খেলনা ও বাবামার সঙ্গে খেলা করিয়াছিল এইরূপ তাহার মনোগ্রাহী অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেন বা তাহাকে গল্প শোনান তাহা হইলে মাকে হারানর ভয় তাহার থাকে না এবং নিশ্চিন্তমনে সে ঘুমাইয়া পড়ে। ভয়ের পরিস্থিতিকে কিভাবে আয়ত্বে আনিতে হয় তাহার জ্ঞান এবং অর্জিত কৌশল ও দক্ষতাই ভয়কে জয় করিবার প্রকৃষ্টতম উপায়।

সমগ্র ব্যক্তিত্বের শিক্ষা।

উপরের বর্ণনা হইতে দেখা যাইবে যে লেখাপড়ার উপর জোর না দিয়া শিশুর প্রক্ষোভ ও সামাজিক শিক্ষার উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। শিশুরা দেহে মনে এখন এমন হইয়া উঠে নাই যাহাতে তাহারা বিমূর্ত তাত্বিক জ্ঞান ও চিন্তাভাবনা করিতে পারিবে অথচ তাহার নিজের তৃপ্তির জন্য সমাজে থাকিয়া তাহার শিখিবার জিনিষ কত আছে। জগত ও জীবনের সহিত পরিচয়

এবং তাহাদের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নিজের ইচ্ছাপূরণ করার শিক্ষাই এখন মূখ্য। নিজেকে সমাজের সহিত মানাইয়া লইতে লইতেই তাহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গড়িয়া উঠে। সুখদুঃখ, হর্ষবেদনা জড়িত পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়া ব্যক্তিত্ব জন্মলাভ করে। পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী, সঙ্গীসাথী এবং নার্শারী স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহিত সম্বন্ধের মধ্য দিয়া প্রাক্ বিদ্যালয়ের শিশুদের নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা বা আত্মবোধ গঠিত হয়। ইহাদের নিকট স্বাধীনতা, স্নেহ ও সহায়তা পাইলে শিশু নিজের যোগ্যতা ও গুণাগুন আবিষ্কার করিতে পারে—এক কথায় সে নিজে যাহা তাহা আবিষ্কার করে এবং আত্মস্বরূপের তৃপ্তি লাভ করে। অন্যপক্ষে ইহারা যদি সর্বদাই তাহার নিজের মত হইয়া চলিবার পথে বাধা দেয় ও তাহা পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করে এবং নিয়ত বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করে তাহা হইলে সে নিজেকে হেয়, অযোগ্য ও অকৃতার্থ মনে করে।

এই বয়সে শিশুর ব্যক্তিত্বকে ভালভাবে বিকশিত করিয়া তুলিতে চাহিলে, তাহাকে অকৃপণভাবে স্নেহাদরে রাখিতে হইবে, তাহার মনের ভাব ও চাহিদা সহৃদয়তার সহিত বুঝিতে হইবে, তাহার নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতাকে বাড়াই-বার জন্য ও নিজের চিন্তা ও ভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা ও সাজসরঞ্জাম দিতে হইবে এবং তাহার কাজে সহায়তা করিতে হইবে।

নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের শিক্ষা।

দেহমনের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং শিক্ষার ধারার মধ্যে কোন ছেদ নাই। অলক্ষিতে দেহ মনে বিকাশ হইতেছে এবং কত জিনিষ শেখা হইয়া যাইতেছে। এই অবিচ্ছেদ্য ধারাকে ভাগ করিতে গেলে কৃত্রিম হইয়া যায়। দুই তিন বৎসর বয়সের শিশু পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের শিশুর সমান নয় তবুও তাহাদের প্রাক্ বিদ্যালয়ের স্তরে ধরা হইয়াছে; আবার পাঁচ বৎসর বয়সের শিশু ও ছয় বৎসর বয়সের শিশুর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই তবু তাহারা দুইটি আলাদা বিভাগে পড়ে। কোন কোন প্রাক্ বিদ্যালয়ের শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ নিম্ন-প্রাথমিক শ্রেণীর শিশুদের সমতুল্য হইতে পারে আবার কোন কোন নিম্ন-

প্রাথমিক শ্রেণীর শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ মন্দগতি হওয়ায় প্রাক্ বিদ্যালয়ের শিশুদের সমান হইতে পারে। তবে নির্দিষ্ট বয়স না ধরিয়া বয়স বিভাগকে এবং ব্যক্তিকে না ধরিয়া সমষ্টিকে ধরিলে কতকগুলি মূলগত বৃদ্ধি ও বিকাশের স্বাতন্ত্রকে আমরা দেখিতে পাই এবং সেই হিসাবেই স্তর বিভাগ করা হয়। নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু বলিতে আমরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী বুঝিব, বয়সে ইহারা ছয়, সাত ও আট বৎসর।

শিশুর জগত যদি উদ্দীপনাপূর্ণ ও বন্ধুত্বভাবাপন্ন হয় তাহা হইলে নব নব অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য সে প্রয়াসী হয়। এযাবৎ শিক্ষার প্রতি তাহার যে মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই মনোভাব লইয়াই সে বিদ্যালয়ে আসে। আমাদের দেশে নার্সারী স্কুলের পরেই যেন একটি ছেদ পড়িয়া যায়। প্রথম শ্রেণীতে আসিলেই শিক্ষক আশা করেন যে শিশু নিছক তাত্বিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে এবং ক্রমাগত ঐরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। এতদিন সে খেলাচ্ছলে প্রাণের আনন্দ মিশাইয়া কত নূতন নূতন অভিজ্ঞতা শিখিতেছিল যাহা তাহার কাছে অর্থপূর্ণ ও সজীব। বিদ্যালয়ে হঠাৎ কতকগুলি নীরস, অর্থহীন পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষা দিতে গেলে শিশু দমিয়া যায়, বিক্ষুব্ধ হয় ও বিদ্যালয় জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। সেইজন্য প্রথম শ্রেণীতে হঠাৎ কোন পরিবর্তন করা উচিত নয়। শিশু যেন এখানে আসিয়াও তাহার পরিচিত স্নেহভালবাসাপূর্ণ মধুর পরিবেশটি পায়। এখানেও সে যেন তাহার স্বতঃস্ফূর্ত খেলার স্বাধীনতা এবং তাহার চিন্তা ও ভাব প্রকাশের উপযোগী উপাদান ও সঙ্গীসাথী পায়। এইরূপ অবস্থাতেই তাহার মন বসে এবং বিদ্যালয় জীবনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে, আপনার করিয়া লয়। ইহার পর তাহার বৃদ্ধি ও বিকাশের সহিত তাল রাখিয়া ক্রমশঃ বিদ্যালয়ের পাঠে অভ্যস্ত করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় তাহার শিখিবার আগ্রহ বাড়ে এবং তাহার সামর্থ্য ও মেজাজ অনুযায়ী কাজ দিলে সে সুখী হয়। গতানুগতিক বিদ্যালয়ে এখনও এমন অনেক জিনিষ শিখান হয় জীবনে যাহার কোন মূল্য নাই এবং এইভাবে সময়ের অপচয় হয়। আবার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও অনুশীলন তাহাদের পক্ষে

সময়ের অপচয় হইয়া দাঁড়ায়, অন্যপক্ষে অল্পবুদ্ধি শিশুদের এমন সব বিষয়ে অনুশীলন করিতে বলা হয় যাহা পরে অধিক বয়সে অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে এবং শেখা সহজসাধ্য হয়। দুই অবস্থাতেই একঘেয়েমি ও অবসাদ উৎপন্ন হয় এবং ইহার পরে বিদ্যালয়ের কাজে ক্লান্তি এবং বিরাগ আসে।

কোন কিছু শিখিতে গেলে শিখিবার অভাব অনুভব করা চাই, শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থিত থাকা চাই এবং সে বিষয়ে কিছু করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া চাই।

শিশুদের মধ্যে আগ্রহ ও প্রেরণা, মানসিক সামর্থ্য, শিখিবার পদ্ধতি, সামাজিক সম্বন্ধ ও স্মৃতির পার্থক্য থাকায় তাহাদের কৌশল শিক্ষা, জ্ঞানার্জন এবং সমস্যা সমাধানের মধ্যেও প্রভেদ দেখা যায়।

সর্বদিকের শিক্ষা।

আজকাল শিক্ষা মানে শুধু বই পড়িয়া শিক্ষা নয়। শিশুরা ভাষা শেখে, কৌশল শেখে, মনোভাব শেখে, আচরণ শেখে। অভিপ্রেত পথে কাজ করা, চিন্তা করা ও অনুভব করাই এখন শিক্ষার আদর্শ। সমস্ত রকমের শিক্ষা একসঙ্গেই চলে। শিশু যখন পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিখিতেছে সে তখন নানারকম খেলা করিতে ও বড়দের ও সমবয়স্কদের সহিত সামাজিকভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেও শিখিতেছে। শিশু যদি একক্ষেত্রে অসফল হয় তখন যেক্ষেত্রে সে কৃতকার্য হয় তথায় তাহার চেষ্টা বাড়িয়া যায়। একই সময়ে সর্বক্ষেত্রে শিশুর সমান উন্নতি আশা করা যায় না। তবে জীবনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি শেখা অপরিহার্য সেইগুলিতে শিশু যেন অবহেলা না করে সে বিষয়ে মাতাপিতা ও শিক্ষককে অবহিত থাকিতে হইবে।

শিখনের অনুকূল অবস্থা।

যখন শিশুর দেহমনের পরিপক্বতা ও প্রস্তুতি থাকে, শিখিতে পারিব বলিয়া আত্মবিশ্বাস জন্মায় ও শিক্ষণীয় বিষয় তাহার কাছে অর্থপূর্ণ হয় তখন শিশু সবচেয়ে ভাল করিয়া শিখিতে পারে। তাহা ছাড়া উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম, উপাদান ও সঙ্গীসাথী এবং ইহাদের বাছিয়া লইবার স্বাধীনতা ও উপযুক্তস্থলে শিক্ষকের সহায়তা শিখনের পক্ষে প্রয়োজন।

শিখনের প্রস্তুতি।

শিখনের প্রস্তুতি নির্ভর করে শারীরিক অবস্থা, প্রক্ষোভের সঙ্গতি, আগ্রহ ও উদ্দেশ্যের উপর। দেহ ও মনের বৃদ্ধি ও বিকাশ যদি শিখনের উপযুক্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে অপেক্ষা করাই ভাল। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শরীর ও মনের বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের জন্য প্রাথমিক অনুশীলন উপকারী। যে ভাবেই হউক শিক্ষককে দেখিতে হইবে যে শিশু যেন সফলভাবে শিখনের জন্য প্রস্তুত থাকে।

আত্মবিশ্বাস।

শিশুর আত্মবোধের সহিত তাহার শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সে যদি নিজেকে অযোগ্য ও অপদার্থ মনে করে তাহা হইলে কোন কিছু শিখিতে তাহার মন সায় দেয় না। উপযুক্ত কাজকর্মে ও সঙ্গীসাথীদের সহিত মেলামেশায় সে যদি সাফল্যের স্বাদ পায় তবে তাহার নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে ধারণা বাড়িতে থাকে। শিক্ষক যদি তাহার মধ্যে যাহা কিছু বলিষ্ঠ ও ভাল তাহার দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সে যদি অনুভব করে তাহার জীবনে যাহারা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহারা তাহাকে ভালবাসে ও সমাদর করে তাহা হইলে সে তাহার নিজের মূল্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে থাকে। কোন শিশু হয়ত ভাল পড়ুয়া নয় কিন্তু অংকে ভাল, শিক্ষক যদি তাহাকে তাহার সহপাঠিদের অংক কষিতে সাহায্য করিতে বলেন তাহা হইলে সে তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং তাহার আত্মমর্যাদা বাড়ে। সাধ্যের মধ্যে কাজ করিবার চেষ্টা করিলেই সকলেই সফলকাম হইতে পারে। এইরূপ কাজে শিক্ষক সুকৌশলে সহায়তা দান করিবেন।

শিশু যদি অনুভব করে যে সে তাহার বাবামার আশা রাখিতে পারিতেছে না এবং বিদ্যালয়ের কাজেও প্রত্যহ অপারগ হইতেছে তাহা হইলে সে তাহার দ্বারা কিছু হইবে না এইরূপ ভাবিতে আরম্ভ করে। এইরূপ আত্মধারণা উৎপাদনাত্মক কাজ ও খেলার পক্ষে হানিকারক। এইরকম শিশুকে শুধু তাগিদ দিয়া কোন ফল হয় না। তাহার শক্তিসামর্থ্যের সীমার সম্বন্ধে অবহিত

হইয়া তাহার উপযোগী কাজ দেওয়া দরকার যাহাতে সে সাফল্যের আনন্দ ও গৌরব লাভ করে।

প্রতিযোগিতার দ্বারা কোন কোন ছেলেমেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ায় ও কাজের উৎসাহ ও চেষ্টা বাড়িয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু অনেকের মনে হীন-মন্যতাবোধ জন্মে। তাহারা ভাবে আমরা তো বড় কিছু হইতে পারিব না সুতরাং অনর্থক খাটিয়া লাভ কি। পরীক্ষায় ফেল বা খারাপ ফল করিবার ভয় এবং উৎকণ্ঠা শিশুদের শিখিবার, স্মরণ রাখিবার, এমন কি ঠিকমত কোন জিনিষ অনুভব করিবার শক্তিকে কমাইয়া দেয়। উৎকণ্ঠা হইতে মুক্ত থাকিতে পারিলে এবং প্রক্ষোভের সঙ্গতি থাকিলে যোগ্যতা ও নৈপুণ্য বাড়ে।

অকৃতকার্যতাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে মানিয়া লওয়া একটি অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয়। বুদ্ধি, সাহস ও সৎঅভিসন্ধি থাকা সত্বেও অনেক লোক অকৃতকার্য হয়। বাধা, বিঘ্ন, অন্তরায়, প্রতিবন্ধ ও পরাজয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী একথা শিশুরা ক্রমে ক্রমে অনুভব করে। সেইজন্য আশা আকাঙ্ক্ষার সীমারেখা যেন বাস্তবধর্মী হয় এবং আপনার শক্তিসামর্থ্যের সীমাকে প্রসন্নচিত্তে মানিয়া লওয়া ভাল। পিতামাতা যদি শিশু যেমন ও তাহার পক্ষে যাহা হওয়া সম্ভব এই সত্যকে হৃষ্টচিত্তে মানিয়া লন তাহা হইলে তাহার ব্যক্তিত্বের সম্ভাব্য পূর্ণবিকাশ নির্বিঘ্নে হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় সে যাহা করিতে চায় এবং যাহা করিতে পারে এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান না থাকায় বালক বা বালিকার কোন দুশ্চিন্তার কারণ থাকে না।

প্রতিযোগিতার আর একটি কুফল হইতেছে যে ইহা ঘৃণা ও আক্রোশ বাড়ায়। প্রতিযোগিতায় হারিয়া গেলে মুখ দেখান ভার হইয়া পড়ে। প্রতিযোগিতায় সাফল্য মানে অন্যদের উপর বিজয় লাভ। প্রতিযোগিতার আবহাওয়ার মধ্যে অল্প সামর্থ্যযুক্ত শিক্ষার্থী বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। শিক্ষক যতদূর সম্ভব সহযোগিতার ভিত্তিতে শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন। শিশুর মনে একটি কাজ ভাল করিয়া করিবার বা একটি সমস্যা নিজের চেষ্টায় সমাধান করিবার পরিতৃপ্তি আনা শিক্ষকের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অর্থপূর্ণ শিখন।

কোন বিষয় শেখার উদ্দেশ্য শিশু বুঝিতে পারিলে সে শিখিতে উৎসাহ বোধ করে ও ভাল করিয়া শেখে। তাহা ছাড়া যে বিষয় সে শিখিতে যাইতেছে তাহা যদি তাহার জানা আছে তাহার সহিত মিলে তবেই তাহা তাহার কাছে অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে। পূর্বপরিচিতের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নূতনত্বের প্রবর্তনই মনের কাছে গ্রহণীয় হয়। সম্পূর্ণ পরিচিত ও সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয় শিখিতে শিশুরা কোন আগ্রহবোধ করে না। তাহা ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা বেশী অপেক্ষা করিতে পারে না, তাহারা হাতে হাতে ফল পাইতে চায়। সেইজন্য তাহারা যেন বুঝিতে পারে যে তাহারা যে ফললাভের জন্য শিখিতেছে তাহা পাইতে বিলম্ব হইবে না।

একাগ্রতা।

জীবনে কোন কিছু বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে হইলে একাগ্রতা চাই-ই এবং এই একাগ্রতা ক্ষণিকের হইলে হইবে না, দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া দরকার। এই বয়স হইতেই এই গুণের বিকাশ শিশুদের মধ্যে হওয়া দরকার। শিশুদের যাহা মনোরঞ্জন করে সে জিনিষ শিখিতে ও করিতে তাহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া লাগিয়া থাকে। শ্রেণীর কার্যসূচী যদি বেশী ধরাবাঁধা নিয়মে বাঁধা না থাকে তাহা হইলে তাহারা তাহাদের মনোমত কাজে যতক্ষণ ইচ্ছা মনোযোগ দিতে পারে। লেখা, পড়া, গঠনাত্মক কাজ এইগুলি এই বয়সে রুটিন মাফিক বাঁধিয়া না দিয়া শিশুরা যতক্ষণ করিতে চায় ততক্ষণ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া দরকার। ঘণ্টা বাজাইয়া শ্রেণীর সময় বিভাগ করিয়া দিলে এইভাবে শিশুদের কাজ করা সম্ভব হয় না এবং তাহারা এক বিষয়ে বেশীক্ষণ মনোযোগ দিবার অভ্যাসও গঠন করিতে পারে না। যদি দেখা যায় কোন শিশু অল্পতেই অস্থির, বিগতস্পৃহ বা ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে তাহা হইলে শিক্ষক তাহার স্বাস্থ্য, বাড়ীর কাজ, বিশ্রাম ও ঘুমের সময়, বিদ্যালয়ের কাজ তাহার সামর্থ্য ও পরিপক্বতা অনুযায়ী হইয়াছে কিনা এইসব পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, পিতামাতা ও শিক্ষকের বুঝা দরকার যে শিশুর মনোযোগ দাবী

করিয়া পাওয়া যায় না। পরিপক্বতা ও আগ্রহ হইতেই স্বাভাবিকভাবে মনোযোগ আসে। মনোযোগ দিলে কাজে সফল হওয়া যায়, সেইজন্য মনোযোগ অনেকটা পুরস্কারের মত কাজ করে।

শিক্ষায় বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্থান।

শিশুদের নানামুখী বৃদ্ধি ও বিকাশের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য তাহাদের অভিজ্ঞতাও বিচিত্র ও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বেশ হিতকারী। বিদ্যালয়ের বাহিরে পাখী, প্রজাপতি, গাছের পাতা, ফুল ইত্যাদি নানাবিধ প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিশুরা খুব আনন্দের সহিত করে। বিভিন্ন পাখীর আকার, বর্ণ, গান এবং গতিবিধি শিশুরা খুব কৌতূহলের সহিত পর্যবেক্ষণ করে। অবশ্য শিশুরা শুধু পাখী দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না, পাখী পুষিতে চায়। শিশুরা পরম আগ্রহসহকারে পাখীকে খাওয়ায়, নাওয়ায়, এবং পায়রাজাতীয় পাখী হইলে বাসা বানাইতে সাহায্য করে।

মেঘমুক্ত আকাশে নক্ষত্র সমাবেশ দেখিতেও শিশুরা খুব ভালবাসে। সৌরমণ্ডলের বিরাট দূরত্ব, তারকাদের গঠন ও বর্ণ, তাহাদের সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী, এক মিনিটে ১,১০০ মাইল বেগে পৃথিবীর গতি—এই সবই শিশুদের কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়।

বাহিরে বেড়ানই শিশুদের পক্ষে পরম আনন্দদায়ক। শিশুদের সেইজন্য প্রকৃতির সন্তান বলা হয়। প্রকৃতির আলো বাতাসের মধ্যে তাহারা যেন স্বাভাবিকভাবে থাকে ও মনের আনন্দে খেলাধূলা করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও সজীবতার মধ্যে শিশুরা যেমন মিশিয়া যাইতে পারে শিক্ষক সেইরূপ পারেন না।

প্রাথমিক শ্রেণীর শিশুরা পরিবেশের অনেক জ্ঞানই স্বাভাবিকভাবে আহরণ করিয়া ফেলে। পল্লীতে তাহাদের বাড়ীর অবস্থান, বিদ্যালয়ে যাইবার রাস্তা, বাজার, ডাকঘর ইত্যাদির অবস্থান দেখাইয়া তাহারা মানচিত্র আঁকিতে পারে। শিশুরা এই সময় হইতে তাহাদের সমাজে যে সব কাজ হইতে দেখে

এবং যে সব কর্মী এই কাজগুলি করে তাহাদের সম্বন্ধে জানিতে আরম্ভ করে। ঝাড়ুদার, গোয়ালা, কৃষক, ডাকপিয়ন, পুলিশ ইত্যাদি কর্মীরা সমাজের কি কি সেবা করে শিশুরা আগ্রহভরে জানিতে চায়। শুধু তাহাই নহে তাহারা ইহাদের সহিত কথাবার্তা কহিতে এবং ইহাদের কাজে সাহায্য বা ইহাদের মত কাজ করিতে চায়। ভ্রমণে বাহির হইলে যেসব শিশু চুপচাপ থাকে তাহারা কথা কহিতে উৎসাহিত হয় এবং লাজুক ছেলেমেয়েরা গান, গল্প ও অন্যান্য কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। পিতামাতা ও শিক্ষক শিশুদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তৃপ্তির জন্য তাহাদের পর্যবেক্ষণের সময় ও সুযোগ দেবেন। পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য ম্যাগনিফাইং গ্লাস, তিন-পলা কাঁচ, চুম্বক ইত্যাদি সুলভ উপকরণ শিশুদের দেওয়া যাইতে পারে।

চিত্রাঙ্কন শিশুদের বিশেষ প্রিয়। ইহার মত সৃজনাত্মক কাজে ব্যাপৃত থাকিলে শিশুর অস্থিরতা কমিয়া যায় এবং মন ও কল্পনাকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগাইতে পারায় তাহারা সুখী হয়। সঙ্গীত, নৃত্য এবং অভিনয়ের মধ্য দিয়া শিশুদের সৃষ্টিধর্মী মন প্রকাশ পায়। তাহা ছাড়া একত্রে মিলিয়া মিশিয়া নাচগান করিবার মধ্য দিয়া একটি ঐক্যবোধও জাগে।

ব্যবহারিক কাজকর্মেও তাহাদের অনুরাগ কম নয়। প্রাথমিক স্তরের শিশুরা বিদ্যালয়ের টিফিনের, বৃক্ষলতা এবং পোষা পশুপক্ষীর পরিচর্যা এবং খুঁটিনাটি আরও অনেক ঘরের কাজকর্মের দায়িত্ব লইতে ভালবাসে।

প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুরা যাহা করে তাহার একটি মূল্য থাকে। তাহাদের উপর জোর করিয়া কিছু চাপাইয়া দেওয়া হয় না। উপযুক্ত পরিচালনাধীনে কর্মের মাধ্যমে যেসব শিশু শিখিতে পায় তাহারা গতানুগতিক বিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষিত শিশুদের অপেক্ষা বিষয়ের জ্ঞান কম শেখে না উপরন্তু তাহারা শেষোক্ত শিশুদের অপেক্ষা সামাজিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশে শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়।

শিখনে সহায়তা।

প্রথমে নানাবিধ প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাইতে পারে এমন অনুকূল পরিবেশের

মধ্যে শিশুকে রাখিতে হইবে। বিদ্যালয় এইরূপ একটি পরিবেশ। এইরূপ পরিবেশে থাকিয়া শিশু নানা অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং অনেক রকম উপাদান ও মালমশলা লইয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতে পারে। শিক্ষকের সাহায্যে সে এইভাবে আবিষ্কার করে সে কি কি বিষয় পারে এবং কি কি বিষয় পারে না, সে কি কি বিষয় পছন্দ করে এবং কি কি বিষয় অপছন্দ করে। দেখা যায় অনেক শিশু পরিবেশে যথেষ্ট সুযোগসুবিধা থাকা সত্বেও তাহা ব্যবহার করিতে চায় না। মনে হয় যেন তাহাদের মধ্যে কোন বাধা তাহাদের কর্মতৎপর হইতে দেয় না। এই বাধা অপসারিত হইলেই তাহাদের সামর্থ্যের উন্মেষ হইতে পারে। বিচক্ষণ শিক্ষক এই বাধাটির স্বরূপ কি স্থির করিয়া তাহা অপসরণের চেষ্টা করিবেন।

শিখনে সহায়তা দিতে গেলে প্রত্যেক শিশুটিকে ভাল করিয়া জানিতে হইবে, তাহার উপযোগী শিক্ষাপ্রদ মালমশলা তাহাকে দিতে হইবে, যে কাজ করিতে হইবে তাহার অর্থ বুঝিতে তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে এবং ভালভাবে সে যাহাতে তাহার কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারে তাহার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সাহায্য দান করিতে হইবে।

শিশুর ভুলভ্রান্তিগুলি দেখিলে বুঝা যায় শিশুর মন কিভাবে কাজ করিতেছে। ভুলেরও কারণ থাকে, ভুলের কারণগুলি অনুসন্ধান করিলে শিক্ষক শিশুকে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন এবং সেই উপলব্ধি সাহায্যে ভুলগুলি সংশোধন করিতে পারেন।

সব জিনিষই শিশুদের ঠেকিয়া শিখিতে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ইহাতে অনর্থক সময় ও চেষ্টার অপচয় হয়। শিশুদের শিখনে অল্প একটু সহায়তা দিলেই তাহারা শিখনের সবচেয়ে ভাল প্রণালীটি আয়ত্ত করিতে পারে। এইভাবে অনর্থক বিফলতার হাত হইতে তাহারা বাঁচিয়া যায়।

শিশুরা কি পারে না সেইদিকে নজর না দিয়া তাহারা কি পারে তাহার দিকেই শিক্ষককে নজর দিতে হইবে এবং সেই দিকেরই ক্রমোন্নতি সাধন করিতে হইবে। যতদূর সম্ভব তিনি তাহাদের অভাব বা প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করিবেন এবং তাহারা কি ভাবে বাড়িয়া উঠিতেছে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

শিক্ষোপকরণ ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম।

বিদ্যালয়ে যথেষ্ট স্থান থাকা দরকার যাহাতে শিশুরা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিতে পারে এবং অন্যের কাজের বিঘ্ন না ঘটাইয়া নিজের নিজের কাজ করিতে পারে। ডেস্ক ও চেয়ার থাকিলে সেইগুলি যেন অনায়াসে সরান যায়। তাহা হইলে ছোট ছোট দলে কাজ করিবার সময় সেইগুলি সেইভাবে সাজান যাইবে এবং অভিনয় বা খেলার সময় সেইগুলি একপাশে সরাইয়া রাখা যাইবে। তাহাদের কাজের জিনিষপত্র রাখিবার জন্য প্রত্যেকের একটি করিয়া তাক বা বাক্স থাকা দরকার। যথাস্থানে জিনিষপত্র রাখিলে তাহাদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা এবং শৃঙ্খলাবোধ জন্মে। এক কোণে ছোট আকারের যন্ত্রপাতি সমেত একটি বেঞ্চ রাখা যাইতে পারে।

ফুলের এবং পাতাবাহারী গাছ শিশুদের সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করে। ঋতুকালীন ফুলের শোভা দেখিতে তাহারা খুব ভালবাসে।

একটি টেবিলের উপর নানা বিষয়ের চিত্তাকর্ষক বই রাখিলে তাহারা সেইগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে চায়। লাল মাছের কাঁচের চৌবাচ্চা তাহাদের খুবই প্রিয়বস্তু। দেওয়ালে কতকগুলি ছবি নীচু করিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা উচিত এবং মাঝে মাঝে বদলাইয়া দেওয়া দরকার। বুলেটিন বোর্ডের সাহায্যে ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞপ্তি ও সংবাদ প্রকাশ করিতে শেখে। চড়িবার, ঝুলিবার এবং লাফাইবার জন্য দোলনা ও মই রাখিতে হইবে। গ্রামের বিদ্যালয়ে ফলফুলের গাছ এবং পুকুর থাকিতে পারে। বড় গাছের ছায়ায় ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া, কাজকর্ম ও খেলাধুলা করিতে পারে এবং পুকুরে সাঁতার দিতে পারে। তবে প্রত্যেক বিদ্যালয়েই একটি খেলিবার মাঠ থাকা দরকার। এই মাঠে জাঙ্গল জিম (উঁচুতে চড়িবার যন্ত্র), স্লাইড (গড়াইবার যন্ত্র) ইট, কাঠ ও বালির স্তূপ, কোদাল, এক চাকার ছোট ঠেলা গাড়ী, প্রত্যেক শিশুর জন্য আলাদা এক টুকরা বাগান করিবার জমি, পোষা পশুপক্ষীর জায়গা, পাখীদের স্নানের জায়গা এইসব উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম থাকিবে। শিশুরা এই সবের যত্ন নিজেরাই লইতে পারে।

কাজ শেখায় পারিপাট্য ও নৈপুণ্য অর্জন।

শিশুরা যখন কোন কাজ প্রথমে করিতে যায় তখন তাহাদের কাজ করিবার মধ্যে জড়তা ও আড়ষ্টভাব থাকে। অভ্যাসের দ্বারা কাজের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ আসে। শিক্ষক কাজের সঠিক উপায়টি তাহাদের সম্মুখে প্রদর্শন করিবেন যেমন রঙতুলি ব্যবহারের কাজে তিনি বলিবেন, "দেখ তুলিটি এইভাবে ধরিতে হইবে এবং রঙ এইভাবে লাগাইতে হইবে"।

দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ, কৌশল এবং অঙ্গভঙ্গীর সুসামঞ্জস্য শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, নৈতিক ও ব্যক্তিগত অভ্যাস গঠনের শিক্ষার সুযোগও আসিয়া যায়, যেমন সাথীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া খেলা, নিজের পালা আসিবার জন্য অপেক্ষা করা, সৎভাবে খেলা, কোন কাজের পরিকল্পনা করা, বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হওয়া, শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন কাজে লাগিয়া থাকা—খেলা এবং গঠনাত্মক কাজের মধ্য দিয়া এই সব অভ্যাস শিখিতে পারা যায়।

লিখিতে শেখা।

লিখিবার নৈপুণ্য একটি জটিল শিক্ষণীয় বিষয়। আঙ্গুলের পেশীগুলির সুসমন্বয় সাধিত হইলেই যে লিখিবার যোগ্যতা আসিয়া যায় তাহা নহে। অক্ষর সৃষ্টি করিবার উপযোগী পেশীর সমন্বয়ের সহিত লিপির অক্ষরগুলি শিশুর সুস্পষ্টভাবে খুঁটাইয়া দেখা চাই, নিজের লেখার সহিত লিপির লেখার তুলনা করিবার এবং ভুল হইলে তাহা লক্ষ্য করিবার ও সংশোধন করিবার সামর্থ্য থাকা চাই। শিশুর লেখা যাহাতে স্পষ্ট ও নির্ভুল হয় সেই দিকেই প্রথমে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, পরে দ্রুততা আসিবে। শিশুরা লিখিবার জন্য নানা রকমের প্রস্তুতি লইয়া বিদ্যালয়ে আসে। কেহ হয়ত বাড়ীতে লেখার অভ্যাস করিয়াছে, কেহ করে নাই। কাহারও হয়ত লেখার প্রথম প্রচেষ্টাকে বড়রা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা বিদ্রুপ প্রকাশ করায় লেখার প্রতি তাহার আগ্রহ কমিয়া গিয়াছে। শিক্ষককে সেইজন্য পূর্বে লেখার জন্য শিশুর প্রস্তুতি কিরূপ দেখিয়া লইয়া তাহার শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মাংসপেশীগুলি যখন লিখিবার উপযোগী হইয়া শিশুর বশে আসে এবং

লিখিবার মত মনের সামর্থ্য যখন জন্মায় তখন শিক্ষক শিশুর লিখিবার ইচ্ছা দেখিলেই উৎসাহ দিবেন। টিফিনের বাক্স, তোয়ালে, খেলনা ইত্যাদি শিশুর ব্যবহার্য দ্রব্য একসঙ্গে থাকিলে শিশুর বাছিয়া লইতে অসুবিধা হয়। তাহার নিজের জিনিষের উপর নিজের নাম লিখিয়া রাখিলে সহজেই তাহার জিনিষ খুঁজিয়া পায়। অভিনয়ে কে কি পার্ট করিবে তাহার সংলাপ লিখিতে মেধাবী শিশুরা উৎসাহ বোধ করে। বিদ্যালয়ে উৎসব অনুষ্ঠান পালন করিতে গিয়া তাহারা চিত্তাকর্ষক নিমন্ত্রণলিপি লিখিতে চায়। এই সব পরিস্থিতির মধ্যে স্বতঃ শিশুরা লিখিতে চায়। শিক্ষক সুকৌশলে এই উদ্যমকে কার্যে পরিণত করিতে সর্বতোভাবে সহায়তা করিবেন।

শিক্ষক শিশুদের ব্লাকবোর্ড ব্যবহার করিতে দিবেন এবং বোর্ডে ও খাতায় লিখিবার জন্য রঙ্গীন খড়ির পেন্সিল এবং সাধারণ পেন্সিল সংগ্রহ করিয়া দিবেন। স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিকভাবে বসিয়া ঠিকমত পেন্সিল ধরিয়া কিভাবে লিখিতে হয় তাহাও তিনি শিশুদের শিখাইতে পারেন। পেন বা পেন্সিলের উপর খুব অল্প চাপ পড়া উচিত।

বাড়ীতেও প্রবাসী মা বা বাবাকে নিজেদের কথা শিশুরা চিঠিতে জানাইতে চায় এবং প্রয়োজনমত বাজারের ফর্দ ইত্যাদি লিখিয়া মাকে সাহায্য করে। যাহা কিছুতে শিশু আগ্রহী হয় সে বিষয়ে সে লিখিতে চায়, সে ঠিকমত লিখিতে পারিতেছে কিনা তাহা সে জানিতে চায় এবং লেখার জন্য প্রশংসা পাইতে চায়। এইরূপ অবস্থায় শিশুর লেখার উন্নতি তাড়াতাড়ি হয়।

লেখার মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ করা।

কিছুটা লেখা শিখিবার পর, লেখার মধ্য দিয়া নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য শিক্ষক শিশুদের মধ্যে আগ্রহ জন্মাইতে পারেন। তাহাদের মনোগ্রাহী দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে তাহাদের গল্প বা কবিতা লিখিতে বলা যাইতে পারে। কোথাও বেড়াইয়া আসিবার পর যে সব জিনিষ তাহাদের ভাল লাগিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে তাহাদের লিখিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। তাহাদের কাছে অনুমতি লইয়া তাহাদের লেখা শ্রেণীতে শিক্ষক পড়িয়া

শোনাইতে পারেন। এইভাবে সার্কাস, মেলা প্রভৃতি দেখিবার এবং ঝড়বৃষ্টির দিনের অভিজ্ঞতা ছেলেমেয়েরা নিজেদের ভাষায় লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারে। এইসব জিনিষ লইয়া তাহারা যখন কথাবার্তা বলে তখন তাহাদের এইগুলি শিক্ষক লিখিয়া ফেলিতে বলিবেন। এইভাবে মনের ভাব লেখায় প্রকাশ করিবার আগ্রহ শিশুদের মধ্যে জন্মাইতে থাকে এবং কিছুপরে তাহারা নিজেদের কল্পনাকেও লেখায় প্রকাশ করিতে পারে।

আঁকিতে শেখা।

লিখিবার মত শিশুর আঁকিবার আগ্রহকেও শিক্ষক উৎসাহ দিয়া বাড়াইয়া তুলিবেন, প্রয়োজনীয় মালমস্‌লা সরবরাহ করিবেন এবং কিভাবে সেইগুলি ব্যবহার করিতে হয় দেখাইয়া দিবেন এবং তাহার আঁকার কৌশল ও আঁকা ছবির যাহা কিছু ভাল সেইদিকে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন। আঁকিবার আগে শিশুরা ভাল করিয়া চারিদিক পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া আসিতে পারে। তাহাদের মধ্যে ছবি দেখিবার ও বিচার বিশ্লেষণ করিবার অভ্যাসও জন্মাইতে হইবে। কোন্ ছবি দেখিতে ভাল কেন, এ বিষয়ে তাহারা বুঝিতে আরম্ভ করিলে তাহারা দেখিবে যে ছবির সংগঠন, গতিভঙ্গীমা, সঙ্গতি, বিশেষ আকার, তুচ্ছ বিষয়ের বর্জন এবং শিল্পীর আন্তরিকতা ছবির শোভা ও সৌন্দর্যের মূলে আছে।

শিক্ষক শিশুদের আঁকা ছবিগুলির সাহায্যেই ভাল ছবির গুণাগুণ সম্বন্ধে তাহাদের অবহিত করাইবেন। তাহাদের ছবিগুলির মধ্যে যাহা কিছু ভাল তাহাই তিনি তুলিয়া ধরিবেন। তিনি তাহাদের ছবি একটি একটি লইয়া বলিতে পারেন, 'দেখ নরেন কি সুন্দর রঙ ফলাইয়াছে,' 'রমেন কয়েকটি রেখার দ্বারা ভাবটি কি সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে,' 'শোভা ফুলটি চমৎকার আঁকিয়াছে,' 'দেখ সূর্যের চারিদিক হইতে রেখাগুলি চারিদিকে কেমন ছড়াইয়া গিয়াছে,' 'এই ছবিতে আলো ও অন্ধকারের আশ্চর্য সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে,' —এইভাবে শিক্ষক তাহাদের আঁকা ছবির ভাল দিকগুলি লইয়া আলোচনা করিলে কাহারও মনে নিরুৎসাহ আসে না অথচ তাহারা ছবির বিচারে দক্ষ

হইয়া উঠিতে থাকে এবং নিজেদের ছবি যাহাতে আরও ভাল হয় তাহার চেষ্টা করে।

চিত্রাঙ্কনের কাজের জন্য শিশুদের উপযোগী ছোট চিত্রফলক, রঙিন চক্ পেন্সিল, আঁকিবার কাগজ, রঙ তুলি, ব্রাস ইত্যাদি দ্রব্যগুলি রাখিতে হইবে। অভিনয়ের জন্য সিনারী রঙ করাও শিশুরা এইগুলির সাহায্যে করিতে পারে। রঙের কতখানি ঘনত্ব হইবে, রঙের বিভিন্ন মিশ্রণ, কি কাগজ কি অবস্থায় ব্যবহার করিতে হইবে—এই সব জিনিষ শিশুদের যত্নপূর্বক শিখাইতে হইবে।

পড়িতে শেখা

শিশুরা পড়িতে চাহে কেন ?

অর্থপূর্ণ কথ্য শব্দের সহিত সেই শব্দের মুদ্রিত প্রতীকের সংযোগ সাধন শিশুর পক্ষে বেশ চেষ্টার বিষয় এবং স্বভাবত সেই চেষ্টায় তাহাদের কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। কেহ যদি তাহাদের হইয়া পড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তাহারা খুশী হয়। তবে প্রথমে পড়িয়া তাহাদের জানাইয়া দিতে হইবে যে বইয়ের মধ্যে এমন সব গল্প, অভিযান, খবর এবং মজা আছে যাহা তাহারা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারে। ইহার পর তাহাদের নিজেদের চেষ্টায় পড়িবার জন্য প্রণোদিত করিতে হইবে।

গোড়া হইতেই শিশু জানে যে বিত্যালয়ে গিয়া লেখাপড়া করিতে হয় এবং সকলকে পড়িতে দেখিয়া সেও পড়ায় আগ্রহী হয়। সকলের মত হইয়াই শিশু থাকিতে চায়।

নিজের দক্ষতা দেখাইতে শিশু আগ্রহবোধ করে। পড়া শেখার উত্তেজনা এবং শেখা জিনিষ ব্যবহার করিতে সে খুবই ভালবাসে।

পড়িতে পারিলে সে প্রশংসা ও সমাদর লাভ করে। ইহাতে তাহার পড়া শেখার চেষ্টা বাড়িয়া যায়।

বিত্যালয়ের সর্বত্র পড়িবার জিনিষ ছড়াইয়া থাকে। শিক্ষক ব্লাকবোর্ডে শিশুদের জন্য লিখিয়া দেন। বুলেটিন বোর্ডে তাহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়

বিজ্ঞপ্তি পড়িতে হয়। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় অনেক জিনিষ লিখিবার ও পড়িবার দরকার হয়।

এইসব অভিজ্ঞতার দ্বারা শিশুরা বুঝিতে পারে পড়িতে পারা নিরর্থক নয়, ইহা তাহাদের পক্ষে বেশ অর্থপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক। না বুঝিয়া সুঝিয়া শুধু ছাপা অক্ষর উচ্চারণ করা নয়। অর্থ বুঝিয়া পড়িবার মধ্যে যে সুখ ও সার্থকতা আছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারিলে পড়িবার শিক্ষা গ্রহণে তাহারা সানন্দে অগ্রণী হয়।

কি ভাবে শিশুরা পড়িতে শেখে।

প্রথম পড়িতে শিখিবার সময় শিশুরা পরিচিত কথ্য শব্দের সহিত মুদ্রিত অক্ষর সমষ্টির সংযোগ সাধন করিতে থাকে। নীচের পরিলেখের সাহায্যে এই সংযোগ কিভাবে ঘটে তাহা দেখানর চেষ্টা করা হইয়াছে।

মুদ্রিত শব্দ	কথিত শব্দ	শব্দের অর্থ
পেয়ারা ←———	পেয়ারা ←{	যাহা খাইতে খুব ভাল, গাছের উপর যাহা জন্মায়, পাকা ও কাঁচা পেয়ারা, এক প্রকার ফল যাহা ফলের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়, যাহা হইতে জ্যাম, জেলী তৈয়ারী হয় ইত্যাদি।

শিশুকে ছাপার অক্ষরে পেয়ারা শব্দটি দেখাইয়া যদি পেয়ারা বলিয়া উচ্চারণ করা যায় তাহা হইলে পেয়ারা সম্বন্ধে তাহার পূর্বজ্ঞান মুদ্রিত শব্দ 'পেয়ারা'র সহিত যুক্ত হইয়া যায়। এইভাবে মুদ্রিত শব্দ তাহার কাছে অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে। সেইজন্য অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি থাকিলে পড়িতে শেখা অর্থপূর্ণ ও সহজ হইয়া যায়। অভিজ্ঞতার বর্ণনাও পড়িতে শেখাকে সরল করিয়া দেয়।

পড়িতে গিয়া শিশু অক্ষরগুলির আকার এবং শব্দের মধ্যে তাহাদের সম্বন্ধ দেখিতে ও চিনিতে শেখে, তাহাদের উচ্চারিত হইতে শুনে এবং নিজে উচ্চারণ করে, উচ্চারিত শব্দের সহিত মুদ্রিত অক্ষরগুলির সংযোগ সাধন করে এবং উচ্চারণের দ্বারা শব্দটির অর্থ গ্রহণ করিতে পারে। শিশু ক্রমশঃ অক্ষরগুলির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য চিনিতে শেখে। শিশুর মুদ্রিত শব্দ পড়িবার সময় যদি শব্দটি শিক্ষক উচ্চারণ করেন এবং উচ্চারিত শব্দটি যদি শিশুর পরিচিত হয় তাহা হইলে খুব তাড়াতাড়ি ও সহজে উচ্চারণ, মুদ্রিত শব্দ ও তাহাদের অর্থের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইয়া যায়। উপরের পরিলেখে এই বিষয়টি প্রদর্শিত হইয়াছে।

পড়িতে শিখাইবার পদ্ধতি।

পড়িতে শিখাইবার কোন একটি সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি আছে বলিয়া জানা নাই। শিশুদের উপযোগী করিয়া যে কোন পদ্ধতিকে মানাইয়া লইতে হইবে। কোন কোন শিশুর স্বর লইয়া বেশী অনুশীলন করিবার প্রয়োজন হয়। কোন কোন শিশু শব্দের অক্ষরগুলির উপর আঙ্গুল বা পেন্সিল দিয়া দাগ বুলাইতে বুলাইতে উচ্চারণ করিয়া যায় এবং পরে আদর্শ লিপি না দেখিয়াই লিখিতে চেষ্টা করে। যে শিশুরা অন্য পদ্ধতির সাহায্যে শিখিতে পারে না তাহাদের এইরূপ চেষ্টা বেদন পদ্ধতির সাহায্যে শেখান উচিত।

সাধারণভাবে ইহা দেখা গিয়াছে যে স্বীকৃত সবগুলি পদ্ধতিই মিলাইয়া মিশাইয়া শিশুদের উপযোগী করিয়া ব্যবহার করিলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে কোন একটি গল্প, কবিতা বা গদ্য বা গদ্যাংশ প্রথমে শিশুদের কাছে চিত্তাকর্ষকভাবে পড়িয়া শুনান হয়। তারপর নূতন শব্দগুলি শিক্ষক বোর্ডে লিখিয়া দেন এবং শিশুদের শুদ্ধভাবে ঐগুলি উচ্চারণ অভ্যাস করিতে দেন। নূতন শব্দগুলি শেখা হইয়া গেলে তাহারা বিষয়টি নিজেরা পড়ে। অন্য একদলকে আদর্শপাঠ না দিয়া প্রথমেই তাহাদের কোন চিত্তাকর্ষক বিষয় পড়িতে দেওয়া হয়। পরে প্রয়োজনানুসারে টানা মানে, বাক্যাংশের মানে এবং শেষে শব্দের মানে বলিয়া দেওয়া হয়। প্রথম

দল দ্বিতীয় দলের চেয়ে ছাপা হরফ ভাল করিয়া পড়িতে পারে এবং সমস্ত শব্দই উচ্চারণ করিতে পারে কিন্তু পঠিত অংশের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন থাকে। দ্বিতীয় দল বিষয়বস্তুতেই খুব বেশী আগ্রহী থাকে কিন্তু প্রথম দলের মত শব্দগুলিকে চিনিতে পারে না বা মুদ্রিত লাইন ধরিয়া পড়িতে পারে না। দুই দলই তাহাদের যাহা শেখান হয় তাহাই শেখে।

গোটা শব্দ দেখিয়া বলিতে শেখায় তাড়াতাড়ি শব্দ শেখা যায় বটে কিন্তু পরে যে সব বর্ণ দিয়া শব্দ গঠিত তাহারও জ্ঞান হওয়া দরকার, তাহা না হইলে বানান জ্ঞান হয় না এবং লিখিতে পারে না। সেইরূপ সম্পূর্ণ বাক্য দেখিয়া পড়িতে শেখায় তাহা অর্থপূর্ণ হওয়ায় শিশুর পক্ষে উপভোগ্য হয় এবং গোড়া হইতেই চিন্তার খোরাক জোগায়। প্রাথমিক অবস্থায় শব্দ ও বাক্য পদ্ধতির উপযোগিতা আছে কিন্তু উপযুক্ত সময়ে বিশ্লেষণও করিতে শিখিতে হইবে।

প্রাথমিক অবস্থায় শিশুদের নিজেদের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া পড়িতে শিখাইলে তাহা খুব স্বাভাবিক ও সুখের হয়। শিশুরা হয়ত ফুলের বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিল বা মিউজিয়াম দেখিয়া আসিয়াছে, বাড়ীতে মুরগীর ডিম হইতে বাচ্চা ফুটিয়াছে, বিদ্যালয়ে একজোড়া হরিণ আনা হইয়াছে। শিশুরা ঘরের লোকের মত শিক্ষককে ঘিরিয়া বসে। একজন তাহার যাহা ভাল লাগিয়াছে সে বিষয় বলিবে। অন্যরা তাহাদের কথা তাহার প্রসঙ্গের সহিত যোগ করিয়া দিবে। শিক্ষক ঠিক তাহাদের কথাগুলি বোর্ডে লিখিয়া দিবেন। পরে শিশুরা তাহাদেরই বোর্ডে লেখা কথাগুলি পড়িবে। ইহাতে তাহারা বেশ আনন্দ ও স্ফূর্তি অনুভব করে এবং নিজেদের গরজেই পড়িবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এইভাবে শিশুদের শব্দজ্ঞান বাড়িয়া যায় এবং শব্দ চিনিবার সামর্থ্য জন্মে।

এইভাবে একশত বা দুইশত শব্দ শিখিবার পর স্বরজ্ঞান শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। যে সব শব্দ শেখা হইয়াছে সেইগুলি যে যে বর্ণদ্বারা গঠিত সেইগুলির আকার ও উচ্চারণের সহিত শিশুদের পরিচিত করাইতে হইবে। প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে শিশুদের জানা শব্দগুলি লইয়াই তাহাদের পড়াইতে

হইবে। মুদ্রিত শব্দ, উচ্চারিত শব্দ এবং শব্দের অর্থ এই তিনই যদি শিশুর অজানা হয় তাহা হইলে তাহা পড়া তাহাদের পক্ষে শাস্তির স্বরূপ হয়।

এইরূপে বিভিন্ন পদ্ধতির সমবায়ে শিশুদের শব্দজ্ঞান যখন যথেষ্ট বাড়ে তখন তাহারা প্রথম পাঠের বইগুলি পড়িতে আরম্ভ করে এবং অনেক শব্দ শিখিতে থাকে এবং পড়িবার গতিও বাড়িয়া যায়। তাকে বা টেবিলের উপর শিশুপাঠ্য সহজ বই এবং সাময়িক পত্রিকা রাখিয়া দিলে অবসর সময়ে তাহারা সেগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে এবং কিছু কিছু পড়ে। প্রাথমিক তিনটি শ্রেণীতে পড়িবার উৎসাহকে বাড়াইবার জন্য শ্রোতাদের সম্মুখে পড়া, বুলেটিন বোর্ড পড়া ইত্যাদি বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা যাইতে পারে। প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রার্থনা সভায় খবর পড়া, বিদ্যার্থী পরিষদে কাজের বিবরণী পাঠ, আবহাওয়া ও অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি পাঠ ও দিনলিপি লেখা ও পড়ার বন্দোবস্ত আছে।

চাপ দিয়া পড়া শিখান অপেক্ষা পড়িবার স্বাভাবিক সামর্থ্যকে বিকশিত করিয়া তোলার পদ্ধতির দ্বারা অনেক বেশী ভাল ফল পাওয়া যায়। বস্তুতঃ চাপ দিয়া তাড়াতাড়ি পড়া শিখাইতে গেলে শিশু নিজেকে অসমর্থ ও অসহায় ভাবে এবং সফলতা আরও দূরবর্তী হইয়া যায়।

অর্থবোধের পরীক্ষা।

শিশুদের পড়া গল্প হইতে শব্দ চয়ন করিয়া শিক্ষক তাহাদের মানে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বা শব্দের অর্থপ্রকাশক ঠিক ছবিটি দেখাইতে বলিতে পারেন। যে পাঠ্যাংশটি তাহারা পড়িয়াছে—তাহা হইতে শিক্ষক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন অথবা তাহাতে যাহা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা বুঝিয়া শিশুদের তদনুযায়ী কাজ করিতে বলিতে পারেন, অথবা তাহাতে যে সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে তাহার সাহায্যে সোজা সোজা সমস্যা সমাধান করিতে বলিতে পারেন। শিশুদের উত্তর ও কাজ দেখিয়া বোঝা যায় তাহারা পাঠ্যাংশের অর্থ বুঝিয়াছে কিনা।

পড়িবার উপকরণ।

প্রথম পড়িবার সময় পড়িবার উপকরণ এমন হওয়া চাই যাহাতে শিশুরা তাহা আরও বেশী করিয়া পাইতে চায়। তাহা ছাড়া পড়িবার বিষয় এইরূপ সরল হওয়া উচিত যাহাতে তাহারা অনেক বেশী পড়িতে পারে। তাহাদের পরিচিত অভিজ্ঞতা লইয়া পড়িবার বিষয় বস্তু রচিত হওয়া উচিত। ইহার ফলে মুদ্রিত শব্দ উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা তাহার অর্থ বুঝিতে পারে এবং মুদ্রিত অক্ষরের প্রতীকগুলির সহিত অর্থের যোগাযোগ হইয়া যাওয়ায় তাহারা সেইগুলি তাড়াতাড়ি কার্যকরীভাবে শিখিয়া ফেলে।

পড়িবার চার্ট, ছবির বই এবং প্রথম পাঠের বইগুলিতে গল্পের আকারে বিষয়বস্তু রচিত হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া ইহা বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক হওয়া উচিত এবং কঠিনতার ক্রম অনুসারে লেখা উচিত। বসন্তের শোভা, উৎসবের দিন, বন ভোজনের আনন্দ এইসব বিষয় শিশুদের আগ্রহ সঞ্চার করিতে পারে। শিশুরা পশুপক্ষীদের সহিত একাত্মতা বোধ করে। সেইজন্য যেসব বইয়ে পশু-পক্ষীরা মানুষের মত কথা কহিতেছে ও আচরণ করিতেছে এইরূপ বর্ণনা আছে তাহা তাহারা পড়িতে খুব ভালবাসে। আর একটু বড় হইয়া তাহারা যখন তাহাদের চতুষ্পার্শ্বের ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধে জানিতে চায় তখন তাহারা জীবজন্তু সম্বন্ধে বাস্তবধর্মী গল্প, নানারূপ খবরাখবর এবং দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা সম্বলিত বইগুলি পরম আগ্রহে পড়িতে থাকে। শিশুপাঠ্য বইগুলি এমন বিচিত্র হওয়া চাই যাহাতে শিশুদের সবরকম আগ্রহ মেটান যাইতে পারে। ছবির বই হইতে আরম্ভ করিয়া পশুপক্ষীর গল্প, পৌরানিক কাহিনী, রূপকথা, প্রাচীনকালের কাহিনী, বড় লোকদের জীবনী সবই শিশুদের আগ্রহের বস্তু এবং এইসব বিষয় লইয়া লিখিত পুস্তক তাহারা আগ্রহভরে পড়ে।

কথা বলা ও শোনা শেখা।

সাধারণ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখান হয় বটে কিন্তু কার্যকরীভাবে কথা বলা ও শোনা শেখানর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় না। সফল নাগরিক

হইতে হইলে লিখিবার সামর্থ্যের সহিত বলিবার সামর্থ্যও থাকা দরকার। সেইজন্য প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের এই সামর্থ্যের উৎকর্ষতার উপরও জোর দেওয়া হয়। প্রাথমিক স্তরের শিশুদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে যত বেশী কথা বলিবার সুযোগ দেওয়া যায় ততই ভাল। বিদ্যালয়ে তাহারা যেন আলোচনা এবং বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট করিয়া বলিবার সুযোগ পায়। চিন্তাধারা যদি স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট থাকে তাহা হইলে ভাষাও যথাযথ নির্ভুল ও অনর্গল হয়।

অভিনয়ের মাধ্যমে শিশুদের কথা বলিবার আগ্রহ বাড়ে। শিশুরা সকলেই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিতে চায়। শ্রোতাদের সম্মুখে কথা বলিতে গেলেই ভাল করিয়া গুছাইয়া ও চিত্তাকর্ষকভাবে বলিতে হয়। শ্রেণীর সহপাঠিদের সম্মুখে শিশু দেখে যে সে যদি সুন্দর করিয়া কথা বলিতে পারে তাহা হইলে সকলে মন দিয়া শোনে ও উপভোগ করে কিন্তু সে যদি তাহার ভাবকে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারে তাহা হইলে তাহারা অমনোযোগী হইয়া পড়ে। কার্যকরীভাবে কথা কহিতে তখনই শিশু প্রণোদিত হয় যখন সে দেখে যে কথার প্রভাবে সে অন্যদের কিছু পছন্দ করাইতে, কাজ করাইতে বা শিখাইতে পারিতেছে।

কথা বলিবার মত কথা শুনিবারও সামর্থ্য শিশুদের লাভ করিতে হইবে। অন্য কেহ যখন কথা বলিতেছে তখন মৌন হইয়া তাহা শুনিবার অভ্যাস শৈশব হইতে গঠন করিতে হইবে। রেডিও ও ফিল্মের উপযোগিতাও এইক্ষেত্রে যথেষ্ট আছে। আলোচ্য বিষয়বস্তুর প্রদর্শন বা প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ ফিল্ম দেখান বা রেডিও শোনান যাইতে পারে। অপরের ভাষণ, ফিল্ম বা রেডিও দেখাশোনা শেষ হইয়া গেলে শিশুরা সকলে মিলিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল কি না সেই বিষয়ে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে আসিতে পারে। এই সব বিষয়ে শিশুরা যেমন প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে তেমনি অজ্ঞাতে তাহাদের মনে ভাষার লালিত্য ও পারিপাট্যের ছাপ পড়িয়া যায়।

শিশুদের ভাষাগত সামর্থ্যের বিকাশের জন্য পিতামাতা ও শিক্ষক নিম্নরূপভাবে চেষ্টা করিতে পারেন।

শিশুর শব্দজ্ঞান বাড়াইবার জন্য তাহাকে নব নব অভিজ্ঞতার মধ্যে লইয়া

যাইতে হইবে এবং সে বিষয়ে কথাবার্তা বলিতে হইবে। তাহা ছাড়া ছবি দেখাইয়াও কথাবার্তা বলা যায়।

প্রত্যেক সপ্তাহে কতকগুলি নূতন শব্দ প্রসঙ্গ ক্রমে শিশুর সহিত কথাবার্তার মধ্যে আনিতে হইবে এবং সেইগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। স্পষ্ট ও নির্ভুল-ভাবেই শিশুর সহিত কথাবার্তা বলা শ্রেয়। পরিষ্কার উচ্চারণসহ ধীরে ধীরে ও সরাসরিভাবে শিশুর সহিত কথা বলা দরকার। শিশুর প্রিয় গল্প ও ছড়া তাহাকে বার বার শোনান দরকার। শিশুকে নিজে নিজে পড়িতে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

চিত্তাকর্ষক ও প্রভাবশালী উপায়ে শিশুকে কথাবার্তা শিখাইতে গেলে অন্যদের সামনে শিশুকে কথা বলিবার সুযোগ দিতে হইবে। অন্য শিশুকে কোন বিষয় ব্যাখ্যা করিবার ভার শিশুকে দেওয়া ভাল।

শিশুর ভাষাগত ভুলভ্রান্তিগুলি সুকৌশলে শুধরাইয়া দিতে হইবে। অস্ফুট উচ্চারণ, বেশী বয়সে আধ আধ কথা বলা এবং তোৎলামী এই দোষগুলি শিশুদের ভিতর বেশী দেখা যায়। এই দোষগুলি উপেক্ষা করা উচিত নয় কারণ এইগুলি আরও খারাপের দিকে যাইতে পারে। স্বরযন্ত্রের বৈকল্য, ভুল শোনা, দোষযুক্ত কথার অনুকরণ, প্রক্ষোভিক অসঙ্গতি, স্বরোৎপাদক যন্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব এইরূপ এক বা একাধিক কারণের ফলে কথা বলিবার দোষ জন্মে। কি কারণে দোষের উৎপত্তি হইয়াছে প্রথমে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং তাহার পর বিশেষজ্ঞের সাহায্যে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

অঙ্ক শেখা।

অঙ্ক শিখিবার আগে শিশু সংখ্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে। বিদ্যালয়ে ছোট ছোট দলে কাজ করিবার সময় কোন্ দলে কয়জন আছে, গাছের পাতা কে কয়টা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে, কতজন ছেলেমেয়ে আজ শ্রেণীতে আসে নাই —এইসব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুরা সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে। ২৫ খানা বই, ৪০ টি পেন্সিল, ষ্টেজের উপর ১২ জন ছেলেমেয়ে, ৮০ টি জমান টিকিট

২০টি গাছ হইতে পাড়া আম—এইরূপ জানা সংখ্যার একত্র সমাবেশ দেখিয়া শিশুদের পরিমাণ জ্ঞান জন্মে। তাহারা নানাজিনিষ যখন দুইভাগ, তিনভাগ, চারভাগ এবং কখনও কখনও ছয়, সাত, আট এবং আরও বেশী ভাগে ভাগ করে তখন তাহাদর ভগ্নাংশ সম্বন্ধে ধারণা হয়। একটু বড় হইয়া যখন তাহারা দোকান হইতে জিনিষপত্র কেনে এবং হিসাব করিয়া পয়সা দেয় ও নেয় তখন টাকা পয়সার অর্থ তাহারা বুঝিতে পারে এবং প্রসঙ্গক্রমে সহজ হিসাব বুঝিতে পারে। মহাপুরুষদিগের জন্মদিন ও শিশুর নিজের জন্মদিন পালনে তারিখ ও বয়স জানিবার ও লিখিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। বোর্ডে বা খাতায় লেখা দৈনন্দিন কার্যসূচী অনুসরণ করিবার জন্য তাহার ঘড়ি দেখিয়া সময় বলিবার অভ্যাস হইতে থাকে। খেলাঘর তৈয়ারী করিতে করিতে ও নিজের ওজন ও দৈর্ঘ মাপিবার সময় সের, মণ, ইঞ্চি ও ফুটের ব্যবহার শেখে। এইরূপ প্রত্যক্ষভাবে সংখ্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালের গাণিতিক দক্ষতার ভিত্তিস্বরূপ হইয়া থাকে।

যদি পাটীগণিত জীবনের কাজে লাগাইবার ও সহজে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে ইহাকে অর্থপূর্ণভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। নিম্নোক্ত তিনপ্রকার অর্থ শিশুদের শিখিতে হইবে।

১। অখণ্ড সংখ্যা, ভগ্নাংশ এবং সের, ফুট ইত্যাদি পরিমাণের অর্থ।

২। যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি মূল গাণিতিক প্রক্রিয়াগুলির অর্থ।

৩। অঙ্ক কষিবার যুক্তির অর্থ।

যোগ শিখাইতে গিয়া প্রথমেই যান্ত্রিক উপায়ে শিখাইতে গেলে শিশুদের পক্ষে তাহা কঠিন ও অর্থহীন হইয়া পড়ে; কিন্তু যদি তাহাদের সংগৃহীত পাতাগুলি গুনিয়া 'সবশুদ্ধ কটি পাতা'—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয় তাহা হইলে তাহার অর্থ তাহারা বুঝিতে পারে ও যোগের প্রক্রিয়া সহজে বুঝিতে পারে। যোগফল আলাদা সংখ্যাগুলি হইতে বড় এবং তাহা হইবার কারণ কি তাহা যেন তাহারা বুঝিতে পারে। শিশুরা অঙ্ক কষিবার যুক্তিটি ঠিকমত বুঝিতেছে কিনা জানিতে হইবে। তাহারা কি পদ্ধতিতে অঙ্ক কষিতেছে শিক্ষককে তাহা জানিতে হইবে শুধু উত্তরটি নিভু'ল হইয়াছে কিনা দেখিলে চলিবে না।

প্রাথমিক স্তরে অঙ্ক শিখাইবার সময় নিম্নলিখিত কথাগুলি শিক্ষক স্মরণ রাখিলে উপকার পাইতে পারেন।

শিশু শ্রেণীতে কিরূপ গাণিতিক পূর্ব অভিজ্ঞতা লইয়া আসিয়াছে তাহা জানিয়া সেইমত তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশুর যদি মানসিক পরিপক্কতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা যথেষ্ট না হইয়া থাকে এবং সেই অবস্থায় তাহাকে পাটীগণিতের সমস্যা এবং প্রক্রিয়াগুলি শিখিতে বলা হয় তাহা হইলে সে পাটীগণিতকে দুরূহ বিষয় বলিয়া মনে করে এবং শিক্ষার ভার সামলাইতে পারে না।

দৈনন্দিন জীবনে সংখ্যা ব্যবহারের যে প্রয়োজন হয় তাহার সুযোগ লইয়া শিক্ষিকা পাটীগণিতের মূল তত্বগুলি ও প্রক্রিয়াগুলি শিশুদের উপযোগী করিয়া শিখাইবেন। এইরূপ সংখ্যাগত সমস্যা তাহাদের কছে তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠে।

সংখ্যাতত্ব প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে শিখান উচিত। পরবর্তী পর্যায়ে যাইবার আগে প্রথম পর্যায়ের বিষয়বস্তু ভাল করিয়া ও সম্পূর্ণ করিয়া শিশুরা বুঝিল কিনা তাহা দেখা দরকার। তাড়াতাড়ি করিতে গেলে হিতে বিপরীত হয় এবং না বুঝিবার ফলে ভুলভ্রান্তি বেশী হয় এবং ভুল পদ্ধতিতেও তাহারা অভ্যস্ত হইয়া যাইতে পারে। শিক্ষায় তাড়াতাড়ি করিতে গেলে সময় ও শক্তি অপচয়ই বেশী হয়।

অঙ্ক শিখাইবার সময়ও শিশুদের যোগ্যতার পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং পদ্ধতিকে প্রত্যেকের যোগ্যতার উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে।

যখন অঙ্কে ভুল হইতে থাকে তখন ভুলের কারণ বা উৎস কোথায় তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে, ভুল সংশোধন না করিয়া আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। পাটীগণিতে ভুল রাখিয়া দিলে ক্রমবর্ধমান হারে ভুল জমিতে থাকে। শিশু এক শ্রেণী হইতে যত উচ্চ শ্রেণীতে যাইতে থাকে অমীমাংসিত সমস্যাগুলির বোঝা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। কোন্ কোন্ গাণিতিক দক্ষতায় শিশু কাঁচা, পাটীগণিতের প্রতি তাহার মনোভাব কিরূপ এবং তাহার সফলতার পথে কোন দৈহিক বা প্রক্ষোভিক অসঙ্গতি বাধাস্বরূপ হইয়া আছে কিনা তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে।

সামাজিক হইবার শিক্ষা।

শিশুরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিবাদ করিয়া ফেলে। ইহার প্রধান কারণ শিশু অন্যের অনুভূতি ধারণা করিতে পারে না এবং সে যাহা করিতেছে তাহার প্রভাব অন্যের উপর কিরূপ পড়িতেছে তাহা বুঝিতে পারে না। তাহার নিজের ভাল লাগিতেছে বলিয়া অন্যের খেলনা কাড়িয়া লইলে সে যে দুঃখ পাইতে পারে এবং তাহার কার্যের ফলে সে যে শত্রু ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে এবং দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে পারে এইসব বিষয় শিশু বুঝে না। আদান প্রদানের দ্বারাই যে নিজের সুখ ও শান্তি বজায় রাখা যায় ও অন্যের বন্ধুত্ব ও সমাদর অর্জন করা যায় ইহা শিশুকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া শিখিতে হইবে।

অন্য শিশুরা কিভাবে অনুভব করে তাহার সংবেদনশীলতা, গুণগ্রাহীতা দায়িত্ব বোধ এবং অপরের মঙ্গলাকাঙ্খা—এই সবই শিখিবার জিনিষ। শিশুর মধ্যে স্বাধীনতার যে ইচ্ছা আছে তাহাকে অবলম্বন করিয়া দায়িত্বজ্ঞান শেখান যায়। দলের নিয়ম মানিয়া চলিয়া সে যদি তৃপ্তিপ্রদ অভিজ্ঞতা লাভ করে তবে সে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করিতে শেখে। তবে এই বয়সে শিশু যতটুকু সামাজিক ব্যবহার দেখাইতে সমর্থ তাহাতেই পিতামাতা ও শিক্ষিকাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, তাহার কাছ হইতে তাহার পক্ষে যাহা অসম্ভব তাহা আশা করা উচিত নয়। সমাজ ও নীতিমূলক গল্পের মাধ্যমেও তাহাদের সামাজিক বোধ জাগ্রত করা যাইতে পারে। শ্রেণীর মধ্যে যাহাতে প্রীতিপূর্ণ সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে তাহা শিক্ষিকার দায়িত্ব। তাহা ছাড়া শিশুরা যদি নিজেরা আলোচনাদ্বারা তাহাদের সামাজিক আচরণের নিয়ম উদ্ভাবন করে তাহা হইলে চাপাইয়া দেওয়া নিয়ম অপেক্ষা নিজেদের প্রণীত নিয়ম তাহারা বেশী আন্তরিকতার সহিত পালন করে।

শেষ শৈশব ও প্রাক-কৈশোরের শিক্ষা।

মধ্যম শ্রেণীগুলির অর্থাৎ চতুর্থ হইতে অষ্টম শ্রেণীর শিশুরা তাহাদের অপেক্ষা কমবয়স্ক শিশুদের চেয়ে ভাল করিয়া শিখিতে পারে। এখন তাহাদের স্নায়ু ও মাংসপেশীর সংযোগ আরও কার্যকারী হইয়াছে, স্মৃতিশক্তি ও সমস্যা সমাধানের

সামর্থ্য বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া তাহারা এখন সজ্ঞানে শিখিবার জন্যই শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইবার দক্ষতা বাড়িয়াছে। তাহাদের এইসব শক্তি সামর্থ্য জন্মিয়াছে সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা শিখিতে না চাওয়ার ভাব তাহাদের অল্প বেশী দিনের জন্য জন্মায়, এখন কিছুটা তাহারা যেন বশে থাকিতে চায় না। তাহাদের দেখাশুনার জিনিষ এবং যাহা তাহাদের পক্ষে দরকারী ও অর্থপূর্ণ মনে করে সেইগুলি তাহারা বাছিয়া লয়।

শিশুকে সামাজিক করিয়া তুলিতে হইলে তাহাকে পুরস্কৃত করিতে হইবে। শিশু আপন প্রবৃত্তিবশে চলিয়া তৃপ্তি পাইতে চায়। সামাজিক কাজকর্ম তাহার স্বভাব হইতে আসে না সুতরাং সেই কাজের ফলেই সে কোন তৃপ্তি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখে না। সেইজন্য পুরস্কারের রূপে যদি সেই তৃপ্তি আনিয়া দেওয়া যায় তবেই সে সেই কাজ শিখিতে ও করিতে প্রণোদিত হয়। পেন, পেন্সিল খাতা, পুতুল, ডাকটিকিট শিশুরা সংগ্রহ করিতে চায় এমন কি চুরী করিয়াও তাহারা মনোমত জিনিষ সংগ্রহ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। ইহাতে তাহাদের সংগ্রহ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হয়, তাহারা তৃপ্ত হয়। এখন যদি চুরী না করিবার জন্য এবং এমন কি নিজেদের জিনিষ অন্যদের সহিত ভাগ বাঁটোয়ারা করিবার জন্য বলা হয় তবে এইসব সামাজিক কাজ তাহাদের কি তৃপ্তি আনিয়া দিবে তাহা তাহারা দেখিতে পায় না। সেইজন্যই প্রয়োজন হয় কৃত্রিম পুরস্কারের বা তাহার জন্য প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করা। চুরী করিলে শিশু যদি তাহার সঙ্গীদের সমাজে গৃহীত না হয় তাহা হইলে তাহার দলভুক্তি প্রবৃত্তি ক্ষুন্ন হয় ও সে অসহায় বোধ করে। তাহাকে সামাজিক স্বীকৃতির সান্ত্বনা দিলে সে চুরী করা ছাড়িবে। আবার নিজের জিনিষ অন্যদের সহিত ভাগ করিয়া খেলিলে বা উপহার স্বরূপ কাহাকেও দিলে সে যদি পিতামাতা বা শিক্ষকের প্রশংসা লাভ করে তাহা হইলে সে ঐরূপ সামাজিক কাজে অভ্যস্ত হইতে থাকে কারণ তাহাদের স্নেহ তাহার একান্ত কাম্য। শিশুর মানস ক্ষেত্রে এইরূপ বিচিত্র শক্তি খেলা করে এবং তাহাকে নানারূপ কাজকর্মে প্রবৃত্ত করে বা নিবৃত্ত রাখে। ব্যক্তিত্ব গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তিগুলি পরস্পরের সহিত আপোষের দ্বারা ভারসাম্য রাখে।

সাধারণতঃ শিশুরা তাহাদের লেখাপড়ার কাজ ভাল করিলে প্রশংসা পায়। ভাল করিয়া পড়া তৈয়ারী করা, পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া, উন্নতি করা, পিতামাতাকে সাহায্য করা, দীনদুঃখীকে দয়া দেখান, শান্ত হইয়া থাকা, সৌজন্যপরায়ণ ও বাধ্য হওয়া, খেলাধূলায় পারদর্শীতা দেখান, অন্যকে কিছু দেওয়া বা অন্যদের সহিত অংশগ্রহণ করা, সৃজনাত্মক কাজ করা—এই সব করিলে শিশুরা প্রশংসিত হয়। প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শুধু তাত্ত্বিক বিদ্যাবত্তা, শান্তস্বভাব, শীলতা বা বাধ্যতার জন্য শিশুরা তত প্রশংসিত হয় না যত হয় তাহাদের দেওয়া ও অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কাজ এবং খেলাধূলা ও সংগঠন শক্তির জন্য। যে আচরণ প্রশংসিত হয় সেই আচরণে অভ্যস্থ হওয়ার প্রবণতাই শিশুদের মধ্যে জন্মে। সুতরাং শিশুরা কি কাজের জন্য প্রশংসিত হইতেছে জানিলে তাহাদের ভবিষ্যৎ আচরণ কি হইবে বলিতে পারা যায়।

পূর্ব শৈশবের মত শিশুর তাহার চারিদিকের জগতকে জানিবার জন্য কৌতূহল এবং শরীর ও মনে সক্রিয় থাকিবার উল্লাস এখনও থাকে। তাহা ছাড়া সে নিজের নিকট হইতে যাহা আশা করে এবং অন্যেরা তাহার কাছ হইতে যাহা আশা করে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। তাহার এই আত্মবোধ সে কি জিনিষ শিখিবে এবং কি শিখিবে না তাহার নির্বাচনে সাহায্য করে। সেইজন্য কোন্ কাজে তাহার আগ্রহ সঞ্চার হইবে তাহা নির্ভর করে সেই কাজ তাহার আত্মবোধের তৃপ্তি বা পরিপুষ্টি সাধন করে কিনা এবং তাহাতে সে সফল হইতে পারিবে কিনা তাহার উপর। যদি দেখা যায় শিশু যাহা তাহার শেখা উচিত তাহা শিখিতে অনিচ্ছুক হয় তাহা হইলে সে তাহার আত্মবোধকে ঐ শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তিত হইতে দিতে চায় না ইহাও ঐ অনিচ্ছার কারণ হইতে পারে। যদি তাহাকে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্বেও শিখিতে হয় তাহা হইলে সে নিজেকে উৎপীড়িত মনে করে এবং অবাঞ্ছিত শারীরিক উপসর্গ আবির্ভূত হয়। শিশুর যে স্বাতন্ত্র আছে তাহাকে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং তাহার আত্মবোধ ক্ষুণ্ণ না হয় তাহা হইলেই সে সব চেয়ে ভাল করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে।

সমাজের মধ্যে থাকিলে শিশুর আত্মতৃপ্তি ও আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে অনেক কিছু একান্ত প্রয়োজনবোধেই শিখিতে হয় যেমন অন্য ব্যক্তিদের সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করা, সমবয়স্কদের সহিত বেশী ঝগড়াঝাটি না করিয়া মানাইয়া চলা, নিজেদের কাজের পরিকল্পনা করা এবং স্বাবলম্বী হওয়া। শিশুর এই সব চেষ্টাকে শিক্ষক মূল্য দিবেন এবং তাহার এই বিকাশের কাজে সহায় স্বরূপ হইবেন। শিশু যদি শিক্ষককে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে তাহার সহিত শিখিতে তাহার কোন আপত্তি থাকে না।

বিদ্যালয়ে এমন সব কাজকর্ম ও অভিজ্ঞতার সমাবেশ রাখিতে হইবে যাহা শিশুদের উপযোগী এবং শিক্ষকের ভূমিকা হইবে পরিচালক, শিক্ষাদাতা এবং পরামর্শদাতার। প্রত্যেক শিশুর শক্তি সামর্থ্য, আগ্রহ অনাগ্রহ, ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান থাকিলেই শিক্ষক শিশুদের শিক্ষা পরিচালনা করিতে পারেন। শিক্ষাদাতা হিসাবে তাঁহাকে জানিতে হইবে শিশুরা পড়া, অঙ্ক কষা এবং অন্যান্য মূল প্রক্রিয়াগুলি কিভাবে শেখে। পরামর্শদাতা হিসাবে শিক্ষককে শিশুদের অসুবিধাগুলি জানিতে হইবে এবং সেইগুলিকে অতিক্রম করিতে সাহায্য করিতে হইবে।

শুধু উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম ও শিক্ষা পদ্ধতির বন্দোবস্ত করিলেই যে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ রচিত হয় তাহা নহে। সবই প্রায় বিফল হইয়া যায় যদি শিক্ষকের সহিত ছাত্রছাত্রী এবং ছাত্রছাত্রীদের পরস্পরের সম্পর্ক মধুর ও বিশ্বাসের না হয়। সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেই শিক্ষার কাজ দ্রুত অগ্রসর হয়—এইরূপ অবস্থায় শেখা শিশু ও শিক্ষকের উভয়ের পক্ষেই প্রাণবন্ত ও সুখের হয়। বিভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য এবং বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষার জন্য কি কি অবস্থা ও শিক্ষাপ্রণালী সর্বোত্তম তাহা শিক্ষককে আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করিতে হইবে।

বিদ্যালয়ে শিশুদের এমন সব জিনিষ শিখাইতে হইবে যাহা তাহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং যাহা অন্য কোথাও শিক্ষা দেওয়া হয় না। যেমন গ্রামীন সমাজে জমির ও বনজ সম্পদের ব্যবহার এবং তাহাদের উর্বরতা ও বৃদ্ধি

কিভাবে হইতে পারে তাহা শিশুদের শিক্ষা করা উচিত। তাহা ছাড়া সফলভাবে হাঁস মুরগী ও গবাদি পশুপালন, পৌর ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন, শিশুপালন, উত্তম নাগরিক হইবার শিক্ষা, সমাজ কল্যাণকর কাজ করা, সমসাময়িক জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত পরিচিত থাকিবার জন্য পাঠ করা—এই সমস্তই গ্রামবাসী ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত হওয়া উচিত। যেসব বিখ্যাত ঘটনা ও মহান ব্যক্তি আমাদের দেশ ও জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে পুস্তক ও কাব্য উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিলে দেশাত্মবোধ জাগে ও অনুপ্রেরণা লাভ করা যায়। ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে ভ্রমণ এবং ঐ প্রসঙ্গে আমাদের বর্তমান জীবন ও ভবিষ্যতের দায়িত্ব সম্বন্ধে অতীতের জ্ঞান হইতে আমরা কি কি অভিজ্ঞতা ও সাহায্য পাইতে পারি তাহার আলোচনা ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করিয়া শিক্ষকের করা উচিত। এইভাবে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে শিশুরা বুঝিতে শেখে এবং একাত্মতা বোধ করে।

বিদ্যালয়ের বাহিরে শিক্ষা।

শিশুরা বিদ্যালয়ের বাহিরেও অনেক জিনিষ শেখে। বস্তুতঃ শিশুদের প্রত্যেক নূতন অভিজ্ঞতাই তাহাদের কাছে শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতা। শিশুরা ক্রমাগতই শিখিতেছে। বাড়ীতে, খেলার মাঠে ও তাহাদের সমাজে কত কি জিনিষই তাহারা না শেখে। বস্তুতঃ গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ—এই তিন মিলিয়াই প্রত্যেক শিশুকে মানুষ করিয়া তোলে। কোন একটিই শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সেইজন্য বিদ্যালয়ের বাহিরের শিক্ষাও গৌণ নহে। বরঞ্চ আধুনিক শিক্ষায় এই তিনটি পরিবেশের প্রভাব যাহাতে একই বাঞ্ছিত দিকে গিয়া শক্তিশালী হয় তাহার জন্য নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একথাও অনেকক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে গৃহ ও সমাজের প্রভাব প্রতিকূল হইলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা অনেকটা ব্যর্থ হইয়া যায়।

আজকাল ছেলেমেয়েদের উপর সিনেমা, রেডিও ও গল্প উপন্যাসের প্রভাব বড় কম নয়। সুনির্বাচিত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় লেখাপড়া ও কাজকর্মের

সহিত সুসঙ্গত হইলে এই সবের প্রভাব কল্যাণকর হয় কিন্তু ইহাদের বাড়াবাড়ি বা শিশুদের পক্ষে অনিষ্টকারক হইলে তাহাদের চরিত্রের শোভনতা ও শালীনতা নষ্ট হয় এবং পড়াশুনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেক উপন্যাস ও নাটকে অপরাধ, রোমহর্ষণ অত্যাচার, উৎকট কাম, আতঙ্ক এবং হত্যার বর্ণনা বা চিত্র থাকে। এইগুলি অবাস্তব, সমাজবিরোধী এবং মাত্রাধিক প্রক্ষোভ সঞ্চার করে। এইগুলিতে বেশী আসক্ত হইলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে মূল্যবোধ শোচনীয়ভাবে কমিয়া যায়। যেসব সমাজবিরোধী কাজকর্মের কথা তাহারা আগে ভাবিতেও পারিত না তাহা এখন সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া যায়।

তবে উপন্যাস, নাটক এবং রেডিও কার্যসূচী যদি বালকবালিকাদের উপযোগী করিয়া সুপরিচালিত হয় তাহা হইলে অপকারের বদলে উপকারই করে এবং সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষার বাহন হইতে পারে। ইহাদের মাধ্যমে সংসার এবং মানব সম্পর্ক সম্বন্ধে তাহারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে পারে। সিনেমা, নাটক ও রেডিও সূচী এমন হওয়া দরকার যাহাতে পরিবারের সকলে একসঙ্গে দেখিতে বা শুনিতে পারে এবং পরে ইহা লইয়া সমালোচনা করিতে পারে। এইগুলি বালকবালিকাদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক মান ও আদর্শের ধারণাকে স্পষ্ট করিয়া তোলে। তাহাদের এখন হইতে বুদ্ধিহীন তামাশা ও প্রকৃত হাস্যরস অবাস্তবতা ও জীবনধর্ম এবং তুচ্ছ ও প্রয়োজনীয় জিনিষ—এইগুলির পার্থক্য বিচার করিতে শিখিতে হইবে। শিশুমহল ও বিদ্যার্থী পরিষদের রেডিও প্রোগ্রামগুলি তাহারা শুনিতে পারে। শিশুদের উপযোগী সিনেমা নাটকের আমাদের দেশে খুবই অভাব। বর্তমানে বালকবালিকাদের জন্য শিক্ষাপ্রদ নাটকগুলি বিশেষ করিয়া ঐতিহাসিক দৃশ্য, কার্টুন, ভ্রমণ ও এ্যাডভেঞ্চারের ছবিগুলি বাছিয়া দিলে তাহারা সেইগুলি নির্বিবাদে দেখিতে পারে। মোট কথা, সিনেমাই হউক, রেডিওই হউক অথবা উপন্যাসই হউক—ইহারা যদি বালকবালিকাদের উপযোগী হয়, জগৎ, সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে সত্যকার জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে এবং তাহাদের মনকে উদ্দীপিত ও আমোদিত করিতে পারে তাহা হইলে এইগুলির পরিণাম শুভ হয়।

এই বয়সে বালকবালিকাদের মধ্যে প্রাণপ্রাচুর্য, কর্মশক্তি, কল্পনা ও শিখিবার অদম্য আগ্রহ থাকে কিন্তু অনভিজ্ঞতা ও অপরিণত মনের জন্য পরিচালনার অভাবে তাহারা বিশৃঙ্খল ও ধ্বংসাত্মক কাজকর্মে লিপ্ত হইতে পারে। একসঙ্গে তাহাদের প্রাণশক্তির তৃপ্তি ও সমাজবোধ জাগ্রত করিবার জন্য নানারূপ সংগঠন আছে। পূর্বে বয়েজ স্কাউট, গার্লস গাইড ইত্যাদির যেরূপ প্রচলন ছিল এখন আর সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বালকবালিকাদের জন্য শিবির (Youth Camp), ব্রতচারী, এন. সি. সি., ভ্রমণকারী দল (Hiking party), শিশু নাটকাভিনয়ের দল—ইহাদেরও প্রচলন খুবই নগণ্য এবং ইহাদের সুযোগ খুব কম ছেলেমেয়েই পায়। তবে এইরূপ সংগঠনের মধ্য দিয়া তাহাদের শারীরিক, সামাজিক ও প্রক্ষোভের বিকাশ উৎকৃষ্টভাবে হইতে পারে।

এইসব সংগঠনের মধ্যে তাহারা তাহাদের মনোমত কাজকর্ম বাছিয়া লইতে পারে, নিজেদের চিন্তা প্রকাশ করিতে পারে, অন্যদের কথা মন দিয়া শুনিতে শেখে, কাজের পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে, অন্যদের মতামত ও পছন্দ অপছন্দকে স্বীকার করিতে শেখে। নিজের ও দলের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তৈয়ারী করিতে শেখে। সাধ্যমত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে উৎসাহিত হয়। এখানকার অভিজ্ঞতার ফলে তাহারা বাড়ীর কর্তব্য কাজ আরও ভাল করিয়া করিতে শেখে, পরিবেশের পারিপাট্য ও সৌন্দর্যের বোধ জন্মে এবং পারিবারিক সম্পর্ক বুঝিতে পারে। সমাজসেবা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি স্থাপনের পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করে।

কাজ, আমোদপ্রমোদ ও বন্ধুত্ব সবই একসঙ্গে দেহ ও মনকে ভরাইয়া রাখে। তাহারা অন্যদের সহিত অভিযোজন করিতে শেখে ও দলের মধ্যে নিজের স্বরূপকেও আবিষ্কার করে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষা

ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে শিক্ষকের জ্ঞান।

ছাত্রছাত্রীদের ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেই শিক্ষক সফলভাবে তাহাদের শিক্ষা দিতে পারেন। শিখাইতে শিখাইতেই শিক্ষক শিশুকে বুঝিতে থাকেন।

শিশুদের মধ্যে দৈহিক অবস্থা ও পরিপক্কতা, বৌদ্ধিক সামর্থ্য ও আগ্রহ, প্রক্ষোভিক বিকাশ এবং তাহাদের গৃহের অবস্থার যে পার্থক্য দেখা যায় তাহা তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। জীবনীশক্তির অভাবেও অনেক বালকবালিকা বিদ্যালয়ের পড়াশুনা ভাল করিয়া পারে না। হয়ত দীর্ঘপথ তাহাদের হাঁটিয়া আসিতে হয় এবং যে খাদ্য তাহারা খাইতে পায় এবং তাহাতে যে কর্মশক্তির জোগান আছে তাহা পথ হাঁটাহাঁটিতেই নিঃশেষিত হইয়া যায়, বিদ্যালয়ের কাজের জন্য আর অবশিষ্ট থাকে না। তাহা ছাড়া আমাদের দেশের দারিদ্র-পীড়িত গ্রামগুলিতে শিশুরা এতই অপর্যাপ্ত খাদ্য খাইতে পায় যাহা তাহাদের ক্রমবর্ধমান দেহের পক্ষে ও শিক্ষার কাজে খুবই শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। আজকাল বিনামূল্যে বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থার কথা সরকার চিন্তা করিতেছেন, ইহা যদি কার্যকরী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সেবার সম্প্রসারণ (N. E. S.), সমাজ শিক্ষা এবং গ্রামোন্নয়নমূলক সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলির সাহায্যে গ্রামগুলির আর্থিক উন্নতির আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হয় তবেই জাতীর মেরুদণ্ড এই বালকবালিকাদের জীবনীশক্তি বাড়িতে পারে। ভাল মানসিক সামর্থ্য থাকিলে ভাষাগত কাজ ও বিমূর্ত চিন্তন শিশু করিতে পারে। প্রত্যক্ষ, স্মৃতি এবং সম্বন্ধ দেখিবার ক্ষমতা না থাকিলে কিছুই শিখিতে পারা যায় না। কোন কোন ছাত্রাছাত্রীর প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি থাকিলেও সম্বন্ধ দেখিবার ক্ষমতা তেমন থাকে না। তাহার ফলে তাহাদের সোজা সোজা তথ্য বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না বটে কিন্তু তথ্য গুলিকে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করিয়া কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারে না কারণ এইরূপ করিতে গেলে তথ্য সমাবেশের মধ্যে সম্বন্ধ দেখিবার ক্ষমতা থাকা চাই। কোন কোন প্রক্ষোভিক অবস্থা শিক্ষাকে করে সুগম আবার কোন কোনটি শিক্ষার বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। প্রক্ষোভের দিক হইতে এই বয়সের বালকবালিকারা শিখিবার জন্য উন্মুখ থাকে। প্রথম হইতেই যদি বিদ্যালয়ের কাজে তাহারা সফল হইতে থাকে তাহা হইলে তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস জন্মায়। আত্মবিশ্বাস তাহাদের স্বাবলম্বী করিয়া তোলে এবং তখন খানিকটা প্রতিকূল সমালোচনা বা অবস্থা তাহাদের মুসরাইয়া দিতে পারে

না। এই বয়সে নিশ্চিন্ততার এবং আত্মসম্মানের বোধ জন্মাইলে তাহারা তাহাদের শক্তিসামর্থ্যকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাইতে শেখে।

পরীক্ষায় ভাল ফললাভ করিবার জন্য অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা মনকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে। ভাল ফল না হইলে মনে আসে অসন্তোষ এবং এই অসন্তোষের ফলে বালক বা বালিকা বিদ্যালয় ছাড়িয়াও দিতে পারে। বস্তুতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল পূর্তির পূর্বেই বিদ্যালয় ত্যাগের (drop-out) ইহা একটি অন্যতম মুখ্য কারণ। প্রমোশন না পাইলে ছেলেমেয়েদের নিজেদের অযোগ্য মনে করে। অবশ্য শিশুর পাঠকৃতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া তাহাকে প্রমোশনও দেওয়া যায় না কারণ সে উঁচু ক্লাশের মানের সমকক্ষ হইতে পারে না। এইরূপ শিশুকে প্রমোশন দিলে শিক্ষককে তাহার জন্য বেশী সময় দিয়া তাহার অপূর্ণতার প্রতিষেধক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের সে সময় থাকে না।

পিতামাতার নিজেদের শিক্ষাদীক্ষা, শিক্ষার প্রতি তাহাদের মনোভাব, তাহাদের পেশাগত ও সামাজিক পদমর্যাদা, শিশুর সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যাশা ও উচ্চাকাঙ্খা, গৃহ ও পল্লীর পরিবেশে শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহ ও উদ্দীপনা, গৃহকাজের চাপ—এই সমস্ত অবস্থাই শিশুর শিক্ষায় প্রভাবশালী হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে গৃহ পরিবেশের অবস্থা যদি মোটামুটি অনুকূল ও উৎসাহ-ব্যঞ্জক হয় তাহা হইলে শিশু তাহার সামর্থ্যানুসারে বিদ্যালয়ে সাফল্য লাভ করিতে পারে।

অবশেষে একথা বলা যায় যে শিশুকে বুঝিতে এবং তাহার শিক্ষা সফলতার সহিত পরিচালনা করিতে হইলে শিশুকে প্রত্যহ পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং পরীক্ষার ফল এবং শিশুর সম্বন্ধে অন্যান্য খবরাখবর তাঁহার পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের পরিপূরক হইবে।

আত্মমূল্যায়ন।

বালকবালিকাদের ব্যক্তিগত ও দলগত কাজকর্মের মূল্যায়ন তাহাদের নিজেদেরই করিতে দিতে হইবে। ইহাও তাহাদের শিক্ষার অংশ এবং ইহার

দ্বারা তাহারা যে শিক্ষায় অগ্রসর হইতেছে তাহা বুঝিতে পারে। তাহাদের সাহায্যের জন্য তাহারা নিম্নরূপে লিখিয়া আত্মমূল্যায়ন করিতে পারে, যথা :—

আমি——উন্নতি করিয়াছি।

আমার——উন্নতি করা প্রয়োজন।

যতদূর পারিয়াছি আমি——করিয়াছি।

এইরূপে প্রয়োজনানুসারে লিখিয়া শূন্য স্থানগুলি বালকবালিকাদের পূরণ করিতে হইবে।

নূতন কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে বালকবালিকারা যাহাতে পুরাতন কাজের অভিজ্ঞতা হইতে লাভবান হইতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একটি কাজ শেষ হইলে তাহারা সকলে মিলিয়া কাজে কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে সে বিষয়ে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা যাহাতে আরও কার্যকরী হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারে। কাজে যদি বিফলতা আসিয়া থাকে তাহা হইলে পরিকল্পনার মধ্যে কি দোষত্রুটি ছিল সেইগুলির আলোচনা করিতে পারে। খেলা বা কাজের মধ্যে যদি বাদবিতণ্ডা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে খেলা বা কাজের নিয়ম সম্বন্ধে বা কোন বিশেষ বালক বা বালিকার আচরণ সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব তাহাদের নিজেদেরই বিচার বা মীমাংসা করিবার ভার দিতে হইবে। মোটকথা বালকবালিকা, পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষিকাকে তলাইয়া দেখিতে হইবে যে শিক্ষা বাস্তবিক কতদূর সম্পন্ন হইয়াছে।

বিদ্যালয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমাবেশ

অপরোক্ষ অভিজ্ঞতা।

দৈনন্দিন জীবনে অপরোক্ষ অভিজ্ঞতাই শব্দের অর্থের ভিত্তিস্বরূপ। বালকবালিকারা "সততা", "সৌন্দর্য", "ন্যায়", "ভক্তি" ইত্যাদি শব্দের মানে তাহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুসারেই করিয়া থাকে। ভাল লোকেদের সঙ্গ পাইলে শিশু সততার মানে বুঝিতে পারে। প্রকৃতিতে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে সুন্দরকে উপলব্ধি করিলে সে সৌন্দর্যের ধারণা করিতে পারে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সম্পদ না থাকিলে ভাষা হইয়া যায় দুর্বল ও শূন্যগর্ভ।

ভ্রমণেও বালকবালিকারা অনেক শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতা লাভ করে। ভ্রমণ আরম্ভ করিবার পূর্বে ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। কোন ঐতিহাসিক স্থানে যাইতে হইলে তৎকালীন ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং ভাস্কর্যশিল্প দেখা উদ্দেশ্য হইতে পারে। বয়নশিল্পে ব্যবহারিক জ্ঞানকে বাড়াইবার জন্য বালকবালিকারা কোন শ্রেষ্ঠ সরকারী বা বেসরকারী হস্ত বয়নশিল্পাগার পরিদর্শন করিতে পারে। হস্তশিল্পের দোকানে যাইতে পারে এবং হস্তশিল্পের প্রদর্শনী দেখিতে পারে। ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্বে কি কি জিনিষ দেখিতে হইবে তাহার স্পষ্ট ধারণা লইয়া যাওয়া এবং ফিরিয়া আসিয়া যাহা যাহা দেখা হইল তাহার সারাংশ প্রণয়ন করিয়া লওয়া ভাল।

এই বয়সে বালকবালিকারা সমাজের কর্মী কাহারা এবং তাহারা কি কাজ করে, নিজেদের এলাকার মাটির প্রকৃতি, গাছপালা, পশুপক্ষী, ইতিহাস, লোককথা ও লোকসঙ্গীত ইত্যাদি খুব ঔৎসুক্যভরে জানিতে চায়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে "আমাদের গ্রাম" এই প্রকল্প অনেক সময় লওয়া হয়। ইহা করিতে গিয়া বালকবালিকাদের গ্রামের ইতিহাস জানিতে হয়। বাবা, মা, ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা ও গ্রামের প্রাচীন লোকদের কাছ হইতে বালকবালিকারা গ্রামের ইতিহাসের সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করে, গ্রামে কি কি খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় ও শিল্পবাণিজ্য কি আছে তাহার অনুসন্ধান করে, ব্যবসায়ী ও কর্মীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে, গ্রামের জল সরবরাহ, যানবাহন, পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহ ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য তাহাদের সাধ্যমত সংগ্রহ করে। অর্জিত জ্ঞান ও ধারণার সাহায্যে তাহারা গ্রামের একটি মডেল তৈয়ারী করে, গ্রামের মানচিত্র আঁকে। তাহা ছাড়া নানারূপ চার্ট ও ছবির সাহায্যে গ্রামের জীবনকে চিত্রিত করে। পরে তাহারা তাহাদের কাজের একটি প্রদর্শনী সাজাইয়া গ্রামের লোকদের তাহা দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করে। এই সকল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাহাদের সমাজ শিক্ষা হয়, শব্দজ্ঞানের বৃদ্ধি পায় ও স্পষ্টতা জন্মে, কাজ প্রবর্তন করিতে, দায়িত্ব গ্রহণ করিতে, কার্যকরীভাবে পড়িতে, লিখিতে ও সমস্যা সমাধান করিতে শেখে। অন্যদের সহিত ভাব ও চিন্তার আদানপ্রদান করিবার ক্ষমতা লাভ এইরূপ কাজের একটি মূল্যবান পরিণাম। যে সব

পরিস্থিতির মধ্যে বালকবালিকারা লিখিবার, পড়িবার ও কথা বলিবার যথার্থ চাহিদা অনুভব করে সেইরূপ পরিস্থিতিই লেখাপড়ায় উন্নতির পরিপোষক।

শিক্ষোপকরণ।

বিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার থাকা চাই। ইহাতে সহজ হইতে কঠিন এবং নানা বিষয়ের বই থাকিবে। এইরূপ হইলে ছেলেমেয়েরা সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুসারে তাহাদের উপযোগী বই বাছিয়া লইতে পারে। গ্রন্থাগারের সংগ্রহের মধ্যে নাটক ও ছোট গল্পকেও বিশেষ স্থান দিতে হইবে কারণ এইগুলি পড়িয়া শিশুরা মানবিক সম্পর্কের জ্ঞান লাভ করে।

সম্ভব হইলে প্রত্যেক শ্রেণীতে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য রাখা যাইতে পারে। শ্রেণীর গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে শিখিলে ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে শেখে আবার বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে অভ্যস্থ হইলে সর্বসাধারণের গ্রন্থাগারগুলি ব্যবহার করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে শিশু বিভাগ থাকিলে ভাল হয়। এখানে শিশুরা আসিয়া ছবির বই দেখিতে পারে, সোজা সোজা বই পড়িতে পারে, আট বৎসর বয়স হইতে তাহাদের বাড়ীতে বই লইয়া যাইতেও দেওয়া যাইতে পারে। শিক্ষক কিভাবে বই বাছিতে হয়, কিভাবে পড়িতে হয় এইসব বিষয়ে ছেলেমেয়েদের পরামর্শ দিবেন। বাস্তবিক পক্ষে ছোটবেলা হইতে গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে না শিখিলে বড় হইয়াও গ্রন্থাগার ব্যবহারের দিকে ঝোঁক থাকে না। অথচ গ্রন্থাগার ব্যবহার না করিলে মনের সর্বতোমুখী বিকাশ সম্ভব হয় না।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পুস্তকভাণ্ডার বাড়াইবার জন্য মাঝে মাঝে পুস্তক সংগ্রহের অভিযান চালাইয়া স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ হইতে উপযুক্ত বই সংগ্রহ করা যাইতে পারে। স্কুলবোর্ড ও সরকারের কাছেও পুস্তকের জন্য সাহায্য চাওয়া যাইতে পারে। এখন ইহা বেশ উপলব্ধি করা গিয়াছে যে কেবল নির্ধারিত পুস্তকের (text book) দ্বারা শিশুদের সর্বরকম চাহিদা মিটান যায় না এবং বহু প্রকারের বই না দিলে তাহাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব হয় না।

চিত্তাকর্ষক বিষয় সমূহের ব্যাপক পঠনের ফলেই শব্দজ্ঞান বাড়ে এবং দ্রুত পাঠ অভ্যাস হয়। প্রাক্-কৈশোরে বালক বালিকারা স্বেচ্ছায় যত বেশী পড়ে অন্য কোন সময় তাহারা এত বেশী পড়ে না। এইরূপ ব্যাপক পঠনকে আরও উৎসাহ দিতে হইবে এবং উদ্দীপিত করিতে হইবে। সুনির্বাচিত বইগুলি হইতে তাহারা যে আনন্দ পায় তাহাই পুরস্কারের কাজ করে।

সম্প্রতি সরকারের উদ্যোগে কর্মশালার মাধ্যমে শিশু সাহিত্য রচিত হইতেছে। বর্তমানে বাজারে যেসব শিশু সাহিত্য প্রচলিত আছে সেইগুলির একটি শ্রেণীবদ্ধ নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রণীত হওয়া দরকার এবং প্রত্যেক স্কুলে এইরূপ তালিকা রাখা দরকার। আজকাল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতি স্থাপনের দিনে শিশু পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েদের কথা এবং দেশবিদেশের নানা ধর্মাবলম্বী, নানা জাতি ও রাষ্ট্রের ব্যক্তিদের বর্ণনা সম্বলিত পুস্তক থাকা দরকার। এইগুলি পড়িয়া বালক বালিকারা অন্য দেশের জীবন জানিতে পারে এবং মানুষ মাত্রেই যে প্রীতির পাত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ তাহা শেখে। প্রত্যেক পুস্তক পাঠের পর শিক্ষক যদি সুকৌশলে ঐ পুস্তক সম্বন্ধে বালক বালিকাদের লইয়া আলোচনা করেন তবে ভাল হয়। ইহাতে অনেক ভুল ধারণা দূর হয়, অর্থের স্পষ্টতা আসে, তাহাদের আনন্দ বাড়ে এবং পাঠকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করিতে শেখে। সুদৃশ্য পুস্তক মনোরমভাবে সাজাইয়া রাখিলে, শিক্ষক বা গ্রন্থাগারিক পুস্তক হইতে হৃদয়গ্রাহী অংশ পাঠ করিলে, ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পুস্তক সমালোচনা লিখাইলে এবং পুস্তক ও প্রবন্ধ লইয়া কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা চালাইলে বালক-বালিকাদের পুস্তকপাঠে অনুরাগ জন্মায়।

দলগত অভিজ্ঞতা।

দলের মধ্যে থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় তাহা বেশ শিক্ষাপ্রদ। শিক্ষক যদি ছেলেয়েদের লইয়া এক সঙ্গে শ্রেণীর কাজের পরিকল্পনা করেন তাহা হইলে শিশুরা শিখিতে বেশী আগ্রহী হয়। তাহারা যখন দেখে যে শ্রেণী পরিচালনায় তাহাদের হাত আছে তখন শ্রেণীর কাজে তাহাদের গুরুত্ব

উপলব্ধি করে এবং যেহেতু দৈনিক কাজকর্ম নির্ধারণে তাহারা অংশগ্রহণ করে সেইহেতু তাহাদের কি করিতে হইবে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে এবং সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে।

ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া কাজ করিলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। ছোট দলে প্রত্যেক শিশুর চাহিদা মিটান সম্ভব হয়। প্রত্যেক দল বা সমিতি কোন বিষয়ের একদিক লইয়া পড়াশুনা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং নিজেদের অর্জিত জ্ঞান বা তথ্যসমূহকে সংকলন করিয়া যে বিবরণ তৈয়ারী করে তাহা শ্রেণীর সমক্ষে নির্ভুল ও স্পষ্ট করিয়া বলে। অন্যদের সমক্ষে বক্তব্য বিষয় বলিতে যাওয়ায় বিষয়টিকে ভাল করিয়া বুঝিতে হয়—ইহার মধ্যে একটি সামাজিক প্রেষণা থাকে। অবশ্য দলের মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রাণময় সম্পর্ক স্থাপন না করিতে পারিলে এইরূপ দল লইয়া কাজে সফলতা লাভ হয় না। ছাত্রছাত্রীদের গুণাগুণ, সামর্থ্যাসামর্থ্য জানিয়া শিক্ষক শিক্ষিকাকে দলবিভাগ করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকে তাহার বিশেষ গুণ বা নৈপুণ্যকে দলের কাজে লাগাইতে পারার দায়িত্ব লইতে পারে। তিনি প্রত্যেক দলকে তাহাদের কাজ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দিবেন এবং সকলে মিলিয়া যাহাতে কাজটি সুসম্পন্ন করিতে পারে তাহাতে সাহায্য করিবেন। দলের কাজে শিশু যদি আত্মমর্যাদা লাভ করিতে পারে এবং দলের কাজে গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাহা হইলে তাহার শিক্ষার মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়।

শিক্ষায় শিক্ষকের শিক্ষাদানের গুরুত্ব।

দলগত অভিজ্ঞতা, স্নেহভালবাসার সম্পর্ক ও প্রচুর শিক্ষোপকরণ থাকিলেও শিক্ষক সুকৌশলে শিক্ষাদান করিতে না পারিলে কিছুই সার্থক হইয়া উঠে না। সেইরূপ শিশুর আগ্রহ ও অভ্যাসকে শিক্ষক যদি সফলতার পথে না লইয়া যান তাহা হইলে শিশু হয়ত যাহা শিখিবার নয় তাহা শিখিবে বা ভুল অভ্যাস করিতে থাকিবে। শিক্ষকের সাহায্যে নিজের কাজকে বিশ্লেষণ ও তাহার ভাল মন্দ বিচার করিতে না পারিলে ভুল থাকিয়া যায় এবং শিশু

ভুলকেই বারংবার অভ্যাস করিতে থাকে। কিন্তু শিক্ষক সাহায্য করিলে সে প্রথম হইতেই কাজের ঠিক পদ্ধতিকেই অভ্যাস করে।

বালক বালিকারা যতদূর সম্ভব তাহাদের শিক্ষার কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝিতে পারে এবং তাহাদের কাজের কি ফল হইতেছে তাহা জানিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় তাহাদের আগ্রহ ও চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকে। যে কাজ তাহারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সে কাজ তাহারা নিজেদের গরজেই করে—বাহিরের পুরস্কারের প্রলোভনের দরকার হয় না। শিক্ষক তাহাদের কাজের অন্তর্নিহিত গুণের জন্যই কাজের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে, বিদ্যালাভের মূল্য বুঝিতে এবং উত্তম অধ্যয়নের পদ্ধতি শিখাইতে চেষ্টা করিবেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ চিত্রাঙ্কন শিক্ষার কথা ধরা যায়। এই শিক্ষার প্রথমে শিশুর চারিপাশে যে সব জিনিষ আছে তাহাদের আকার প্রকার, বর্ণ এবং সাম্য বৈষম্য সযত্নে পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য শিক্ষক তাহাকে উৎসাহ দিবেন, তাহার অঙ্কিত চিত্র অপেক্ষা কিছু ভাল চিত্রের সহিত তাহাকে পরিচয় করাইয়া দিবেন, চিত্র পরিকল্পনা এবং বর্ণ সমাবেশের সূত্রগুলি তাহার সৃজনের মধ্যে যাহাতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহাতে সাহায্য করিবেন, তাহার সাফল্যে উৎসাহ দেখাইবেন এবং যাহা কিছু সে আন্তরিক যত্নের সহিত করিবে তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে আত্মসমালোচনার ভাবও জাগাইতে হইবে যাহাতে সে তাহার কাজে স্বইচ্ছায় আরও উন্নতি করিতে তৎপর হয়।

শব্দ চয়ন ও বাক্যবিন্যাসের মধ্য দিয়া বালক বালিকার লেখার উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। তাহাদের প্রয়োজন মত ভাষায় অলঙ্কারের প্রয়োগ ও বিভিন্ন বাক্যগঠন প্রণালী তাহারা শিখিতে পারে। বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা ব্যবহার না করিয়া সরল অথচ শক্তিশালী ভাষা তাহাদের লেখায় ব্যবহার করিতে শেখা উচিত। এইরূপ ভাল লেখাকে শিক্ষক সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখিবেন। তাহারা যেইরূপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলে সেইরূপ তাহাদের লেখাও যাহাতে প্রাণময়, গতিশীল ও সাবলীল হয় সেই বিষয়ে শিক্ষক তাহাদের উৎসাহ দিবেন।

বানান শিখাইতে গিয়া শিক্ষক প্রথমে ছেলেমেয়েরা বর্তমানে যে শব্দগুলি ব্যবহার করে সেইগুলি বাছিয়া লইয়া একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন। তাহারা প্রত্যেক শব্দের মানে বুঝে কিনা তাহা তিনি পরখ করিয়া লইবেন। বাক্যে ও লেখায় শব্দের প্রয়োগের দ্বারা শব্দের অর্থ পরিষ্কার হয়। তাঁহাকে এমন ভাবে স্কুলের কাজ কর্মের পরিকল্পনা করিতে হইবে যাহাতে বালক বালিকারা যেগুলির বানান শিখিতে হইবে সেই শব্দগুলিকে দেখিবার, শুনিবার, উচ্চারণ করিবার ও লিখিবার বারংবার সুযোগ পায়। শিক্ষক শব্দগুলির সহিত তাহাদের পরিচয়কে স্পষ্টতর করিবার জন্য নির্ভুল ও স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবেন, শব্দ গঠনের বিশেষত্বের দিকে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন এবং বানান করিতে গিয়া যাহা কিছু অসুবিধা ঘটে তাহাও বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন। কোন কোন শিশুর পক্ষে বড় বড় লেখা হরফের উপর পেন্সিল বুলাইলে উপকার হয়। বিশুদ্ধ বানানের দিকেই শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে, তাহাদের ভুলের দিকে নহে। তাহাদের রচনার মধ্যে শুধু ভুলগুলিকে না দেখাইয়া যে শব্দগুলির বানান ভুল হইয়াছে সেইগুলির বিশুদ্ধ বানানসহ তাহাদের দেখান উচিত। পড়া ও লেখার মধ্য দিয়া শব্দের যথাযথ প্রত্যক্ষ হইলে বানান ভুলের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। যে শব্দগুলির তাহারা বানান ভুল করে শুদ্ধ বানানসহ সেইগুলি তাহারা বারংবার লিখিলে উপকার হইতে দেখা যায়।

সন্দেহ স্থলে বালক বালিকাদের অভিধান ব্যবহার করিতে শিখাইতে হইবে। শুদ্ধ বানান লিখিবার জন্য তাহাদের মনে আগ্রহ সঞ্চার হওয়া চাই।

সমস্যা সমাধন করিবার শিক্ষাও খুব মূল্যবান। সমস্যার পরিস্থিতিতে থাকে একটি লক্ষ্য। লক্ষ্যে পৌছাইবার বাধা বা অসুবিধা সমস্যার সৃষ্টি করে এবং লক্ষ্যে পৌছাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জোগায়। প্রক্ষোভজনিত, অসামর্থ্য ও অনভিজ্ঞতার কারণে কখনও কখনও শিশুরা সমস্যা সমাধান করিয়া অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইতে পারে না। বিদ্যালয়ে একটি সুন্দর ফুলফলের উদ্যান রচনা করা একটি সমস্যা হইতে পারে। শিক্ষককে বুঝিতে হইবে ছেলেমেয়েদের উদ্যান রচনা করিবার প্রকৃত ইচ্ছা আছে কি না এবং ইহাকে সমস্যারূপে

তাহারা গ্রহণ করিতেছে কি না। যেহেতু উদ্যান রচনায় তাহাদের অভিজ্ঞতা নাই সেইহেতু এই সমস্যার প্রকৃতি ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইবে। এ সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় যেমন কি কি গাছ লাগাইতে হইবে, কিভাবে বেড়া দিতে হইবে, কিভাবে জমিকে উর্বরা করিতে হইবে, ফুল গাছের কেয়ারী কেমন হইবে, বাগানের রাস্তা কিরূপ হইবে এবং লাল কাঁকড় দেওয়া হইবে কি না ইত্যাদি তাহারা শিক্ষকের সহায়তায় সংগ্রহ করিবে। সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া ছাটিয়া গুছাইয়া লইতে হইবে। এইবার উদ্যান-রচনা-রূপ লক্ষ্যে পৌঁছাইবার উদ্ভাবিত উপায়গুলি কার্যকরী হইবে কি না তাহার বিচার করিতে হইবে এবং নির্বাচিত কার্যগুলি যেমন জমি নির্বাচন, মাপা, বেড়া দেওয়া, আগাছা তোলা, সার দেওয়া ইত্যাদি করিতে হইবে এবং লক্ষ্যে পৌঁছাইবার পর অর্থাৎ এক্ষেত্রে উদ্যান রচিত হইলে যে পদ্ধতিগুলির দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছান গেল তাহাদের উপযুক্ততা নির্ধারণ করিতে হইবে।

পাটীগণিতের শিক্ষায় গাণিতিক প্রক্রিয়াগুলিকে শিশুদের কাছে অর্থপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। ৭৮ হইতে ৪৬ বিয়োগ না বুঝাইয়া বা যান্ত্রিকভাবে অঙ্কটি না দিয়া তাহাদের যদি এইভাবে বুঝান হয় যে ৭৮ এবং ৪৬ হইতেছে—

৬ দশক ও ১৮ একক

ইহা হইতে বাদ দিতে হইবে ৪ দশক ও ৬ একক

তাহা হইলে তাহারা অঙ্কের অর্থ বুঝিয়া বিচারসহ করিতে পারে, মুখস্থ যান্ত্রিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করিতে হয় না। এইরূপ অর্থের উপলব্ধির সহিত পাঠ দান করিলে শিশুরা নিজেই গাণিতিক নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ অঙ্ক নিজেদের চেষ্টাতেই করিতে পারে। এইরূপ শিক্ষার দ্বারাই গণিত শিশুদের কাছে অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে।

তাহা ছাড়া পাটীগণিতের শিক্ষা ক্রম অনুসারে হওয়া উচিত—সহজ হইতে কঠিন, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম। এক ধাপের বিষয় সম্পূর্ণভাবে না শেখা হইলে উচ্চতর ধাপে যাওয়া উচিত নয়। নীচের দিকে অপূর্ণতা থাকিলে বিফলতা, হতাশা, উৎকণ্ঠা এবং গণিতের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিবে। শিক্ষককে

মনে রাখিতে হইবে যে শ্রেণীর সব ছেলেমেয়ের গাণিতিক সামর্থ্য এক নহে এবং অনেকে পাটিগণিতের সূক্ষ্ম দিকটি ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং সকলকেই একই মানে আনিবার বৃথা চেষ্টা ও সময়ের অপব্যয় করা উচিত নহে। তাহা ছাড়া ইহাতে অসমর্থদের মধ্যে বিফলতার বেদনা সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং সামর্থ্যানুসারে শিক্ষককে শিক্ষা দিতেই হইবে।

অন্যদের বুঝিতে পারিবার শিক্ষা।

পরিবারে, বিদ্যালয়ে ও খেলিবার সঙ্গীসাথীদের সহিত থাকিতে থাকিতে শিশু বুঝিতে পারে তাহার কাজ বা কথা অন্যরা কিভাবে গ্রহণ করিতেছে। অন্যদের সহিত বনিবনা না করিয়া কেবল নিজের খেয়ালখুশী মত চলিবার জেদ করিলে সে দেখে যে দল তাহাকে পরিত্যাগ করে কিন্তু অন্যদের প্রতি সহানুভূতির ভাব দেখাইলে তাহারা তাহার বন্ধু হইয়া যায়। এইভাবে সে তাহার আচরণকে সামাজিক করিয়া তোলে। যে সব শিশুর ভিতরে সামাজিক সংবেদন কম থাকে তাহার পক্ষে শিক্ষকের সহায়তা দরকার।

আত্মজীবনী ও বাস্তবধর্মী গল্প, উপন্যাস পাঠ করিলে বালক বালিকারা মানুষের আচরণ ও ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে। ইতিহাসে যে সব মহান নেতা ও ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তাহারা পাঠ করে তাঁহাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভাব উৎপাদনকারী কার্যাবলী হইতে তাঁহাদের প্রেরণা ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে জানিতে পারে। অন্যদের ব্যক্তিত্বকে বুঝিবার পক্ষে ভাল চলচ্চিত্র, রেডিও ও নাটকের মূল্য আছে।

অন্যদেশের বালক বালিকাদের জানিবার আগ্রহও ছেলে মেয়েদের খুব থাকে। চলচ্চিত্র ও গল্পের মাধ্যমে তাহারা দেশবিদেশের বালকবালিকাদের সহিত পরিচিত হইতে পারে। এইগুলির সাহায্যে ঐ সব বালক বালিকারা কি বিষয়ে কথাবার্তা বলে, কি বিষয় লইয়া চিন্তা করে, কি খেলা খেলে এবং কিভাবে তাহাদের সময় অতিবাহিত করে—এইসব বিষয়ে তাহারা জানিতে পারে। দেশবিদেশের ছেলেমেয়েদের সহিত চিঠির আদান প্রদান করিতে পারে, ইহাতে একটি ব্যক্তিগত ও সত্যকারের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের স্থান হইতেছে গৃহ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। দয়া, সুবিচার ও বন্ধুত্ব যেখানে বিরাজ করে সেখানে আধ্যাত্মিক চেতনা স্বতঃই স্ফুরিত হয়। বালকবালিকারা সহজেই মনের ভাব বুঝিয়া লয় এবং তাহারাও সৎ এবং সদয় হইয়া উঠে। শুধু উপদেশের দ্বারা নীতি ও আধ্যাত্মিকতা শেখান যায় না। জীবনে পালনের দ্বারাই বালকবালিকারা ইহাদের তাৎপর্য বুঝে এবং তাহাদের চরিত্র ঐভাবে গঠিত হয়। বিভিন্ন ধর্মের সারমর্ম তাহাদের উপযোগী করিয়া বলা যায় এবং সমস্ত ধর্মের চরম লক্ষ্য যে এক, কেবল লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই পার্থক্য—এই বিষয়টি তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে। ইহাতে সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব আসিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন বয়সে ছেলেমেয়েরা কিভাবে শেখে সেই বিষয়ে প্রথমভাগে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনায় বুঝা যায় যে 'শেখা' জিনিষটি খুবই জটিল এবং 'শেখা' যে কিভাবে ঘটে তাহা কোন একটি মতবাদ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। যাহা হউক, বহু দিন হইতে মনোবিদরা 'শেখা' কিভাবে ঘটে ইহা লইয়া গবেষণা করিয়া আসিতেছেন এবং ফলস্বরূপ কয়েকটি শেখার সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মনোবিদরা প্রধানতঃ জীবজন্তুদের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কিরূপে তাহারা শেখে এবং পরে মানুষ লইয়াও এই বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। জীবজন্তুদের শিখিবার প্রক্রিয়া যেহেতু সরল সেইহেতু শেখা কিভাবে ঘটে তাহা ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং শিখিবার নিয়মকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। যদিও জীবজন্তুদের শিক্ষার সহিত মানুষের শিক্ষার পার্থক্য আছে কিন্তু একটি মূলগত ঐক্যও আছে। সেইজন্য জীবজন্তুদের উপর পরীক্ষার ফল মানুষের বেলায় সাধারণ-ভাবে খাটিলেও মানুষের শিক্ষা আরও জটিল ও উন্নত।

আমরা এখন ই,এল, থর্ণডাইকের শিক্ষার সূত্রগুলি, গেষ্টাল্ট মনোবিদদের মতবাদ এবং প্যাভলভের 'কনডিসনিং' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। তাঁহারা যে পরীক্ষাগুলি করিয়াছিলেন সেইগুলির বর্ণনা এখানে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষাভিত্তিক যে সিদ্ধান্তগুলি মানুষের শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করিতে পারে সেইগুলিই আমরা বিবেচনা করিব।

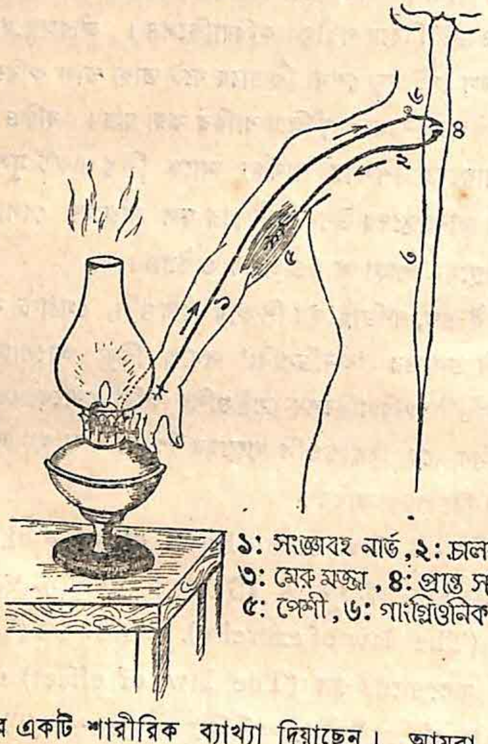
থর্ণডাইক মোট ৮টি শিক্ষা সূত্রের (Laws of learning) আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ৩টি মুখ্য ও ৫টি গৌণ। মুখ্য ৩টি সূত্রের নাম—অনুশীলনের সূত্র (The law of exercise), প্রস্তুতির সূত্র (The law of readiness) ও ফলভোগের সূত্র (The law of effect) এবং ৫টি গৌণ সূত্রের নাম—একই বহিঃস্থ উদ্দীপকে বিভিন্ন সাড়ার সূত্র (The law of multiple response to the same external stimulus), প্রতিন্যাস, মনঃসংলগ্নতা বা স্বভাবের সূত্র (The law of attitude, set or

disposition), আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (The law of partial activity), সদৃশীকরণ বা উপমানের সূত্র (The law of assimilation or analogy), অনুষঙ্গ-মূলক সঞ্চালনের সূত্র (The law of associative shifting)।

মূখ্য সূত্রগুলি।

অনুশীলনের সূত্র (The law of exercise)।

শিক্ষণীয় বিষয় বার বার অভ্যাস না করিলে শিক্ষা পাকা হয় না। সেইজন্য বারবার করিয়া পাঠ পড়িতে হয় যাহাতে তাহা মনে গাঁথিয়া যায়। থর্ণডাইক



১: সংজ্ঞাবহ নার্ভ, ২: চালক নার্ভ,
৩: মেরু মজ্জা, ৪: প্রান্ত সন্নিকর্ষ,
৫: পেশী, ৬: গাংগ্লিওনিক নার্ভ কোষ।

এই প্রক্রিয়ার একটি শারীরিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আমরা জানি যে দেহের নার্ভতন্ত্রের (Nervous system) সাহায্যে বাহিরের উদ্দীপক যেমন দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ—ইহাদের আমরা জানিতে পারি এবং উদ্দীপকের সম্বন্ধে

কিছু করিবার থাকিলে বা অভিযোজিত হইতে হইলে অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া যথোপযোগী কিছু করিয়া থাকি। এক কথায় বলা যায় জীব উদ্দীপককে সাড়া দেয়। ছবিতে দেখা যাইতেছে যে আংগুলটি হ্যারিকেনের গরম কাঁচের সংস্পর্শে আসায় উত্তাপের অনুভূতি সংজ্ঞাবহ নার্ভ দ্বারা বাহিত হইয়া গ্যাংগ্লিওন নার্ভকোষে (Ganglionic cell) পৌঁছায় এবং এই উত্তাপের বার্তা মেরুমজ্জাস্থিত চালক নার্ভকোষে (Motor cell) প্রান্তসন্নিকোষের দ্বারা (Synaptic junction) অর্থাৎ একপ্রকার নার্ভীয় সংযোগের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। তখন আবার চালক নার্ভকোষের বহির্গামী বাহুতে নার্ভ তরঙ্গ বহিয়া চলে হাতের মাংসপেশীতে এবং ঐ মাংসপেশীকে সঙ্কুচিত করে। ফলে আংগুল গরম কাঁচ হইতে নিরাপদ দূরে আসিয়া পৌঁছায়। ইতিমধ্যে প্রান্তসন্নিকর্ষযোগে আংগুলে ছেকা লাগিয়া যাওয়ার খবর মেরুমজ্জার মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছায় এবং ছেঁকা লাগিয়া যাওয়ার দরুণ বেদনাবোধ হয়। অবশ্য এই সমস্ত কার্য চক্ষুর নিমেষে ঘটে এবং আংগুল ইচ্ছা করিয়া গরম কাঁচ হইতে সরাইবার আগেই হাতের মাংসপেশীর সঙ্কুচন আপনা আপনি ঘটিয়া যায়। ইহাকে প্রতিবর্তক প্রতিক্রিয়া বলে। শারীরিক কাজগুলির মধ্যে প্রতিবর্ত সরলতম ক্রিয়া। অবশ্য ছবিতে বুঝিবার জন্য আরও সরল করিয়া দেখান হইয়াছে।

দেখা যায় স্বাধীনতা দিলে খুব অল্পবয়সী অনভিজ্ঞ শিশু আগুন দেখিলে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দেয় কিন্তু বুঝে যে আগুনের স্পর্শ বেদনাদায়ক। একবারের কথা হয়ত ভুলিয়া যইেতে পারে কিন্তু দুই তিনবার এইরূপ অভিজ্ঞতা হইলে সে আগুন দেখিলেই হাত গুটাইয়া লয় বা আগুনের দিকেই যাইতে চাহে না। আমরা বলিতে পারি যে সে আগুন হইতে বাঁচিতে শিখিয়াছে। পরে আগুন সম্বন্ধে শুনিলে বা পড়িলেও সে ভয় পায়। এখানে আগুন উদ্দীপক এবং সাড়া হইতেছে হাতের মাংসপেশীর সঙ্কুচন। এখানে নার্ভপথে আঙ্গুল হইতে মেরুমজ্জা হইয়া মাংসপেশীতে যে নার্ভতরঙ্গ একবার বহিয়া গেল তাহা যত বেশীবার বহিবে ততই নার্ভপথের সংযোগগুলি দৃঢ় হইবে এবং তরঙ্গ প্রবাহিত অনায়াসে হইতে থাকিবে।

বুঝিবার সুবিধার জন্য খুব একটি সরল শিখিবার কাজের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল কিন্তু মানুষের শেখা সব সময় অত সোজা নহে; বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শিক্ষা জটিল হইতে জটিলতর হইতে থাকে এবং মেরুমজ্জা ও মস্তিষ্কের মধ্যে খুব জটিল, ব্যাপক ও সূক্ষ্ম নার্ভপথের সংযোগ স্থাপিত হইতে থাকে এবং যতই বারবার এক কাজ করা যায় ততই নার্ভপথ সুদৃঢ় হয় এবং শিক্ষা স্থায়ী হয়।

থর্ণডাইকের অনুশীলনের সূত্রের দৈহিক ভিত্তির ব্যাখ্যা অবশ্য খুবই সংক্ষেপে করা হইল। তবে, ইহাতেই বুঝা যাইবে মনে গাথিয়া যাওয়ার অর্থ কি। সেইজন্য শিক্ষাকে স্থায়ীত্ব দিতে গেলে বারংবার অভ্যাসের দরকার। নামতা পড়া, বারবার বানান লেখা, শব্দকে বারবার ব্যাখ্যা ও ব্যবহার করিয়া শব্দ ও অর্থের যোগসাধন করা, অভিনয়ের অংশ মুখস্থ করা ও রিহার্সাল দেওয়া—এইসব কাজই এই সূত্রের কার্যকারীতার প্রমাণ। বস্তুতঃ শিখিতে গেলে যে অনুশীলনের দরকার ইহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ব্যাপক ও বহুদিনের অনুশীলন ব্যতিত সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তিতে ভুলভ্রান্তিহীন নিখুঁত পারদর্শীতা লাভ করা যে সম্ভব নহে তাহা কাহারও অজানা নহে।

অভ্যাস না রাখিলে অর্জিত দক্ষতা বা জ্ঞানের স্মৃতি কমিয়া আসে। বস্তুতঃ অনভ্যাসের দৈর্ঘ যত বেশী হয় ভুলিয়া যাওয়ার পরিমাণও তদনুরূপ হয়। মানুষ যাহা ব্যবহার করে তাহাই সে ধরিয়া রাখে। যে শব্দগুলি আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করি সেইগুলির বানান ভুল সচরাচর হয় না এবং যে শব্দগুলি আমরা কথাবার্তায় ও লেখায় ব্যবহার করি সেইগুলির মানেও আমরা ভুলিয়া যাই না।

সাময়িক উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য আমরা যে বক্তৃতা তৈয়ারী করি ও বলি এবং শৈশবে যে সব কবিতা মুখস্থ করা হইয়াছিল সেইগুলি যদি বহুকাল আর ব্যবহার না করা হয় তাহা হইলে সেইগুলির অধিকাংশ প্রায় ভুলিয়া যাই এবং বড় হইয়া আবার সেইগুলি পড়িলে দেখা যায় অনেক জিনিষ মনে পড়ে বটে কিন্তু কিছু কিছু মনে হয় একেবারে নূতন। এই ভুলিয়া যাওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয় অনুশীলনের অভাব। ভুলিয়া যাওয়ার আর একটি কারণ

এই হইতে পারে যে, যে সব নূতন জিনিষ শেখা হইতেছে তাহারা পুরাতণ শিক্ষাকে যেন মুছিয়া ফেলে। অন্য কথায় বলা যায় মানসপটের পুরাতণ শিক্ষার ছাপকে মুছিয়া ফেলিয়া নূতনের ছাপ পড়ে। অবশ্য ইহা আংশিক সত্য হইলেও সমগ্র সত্য নহে। তবে যে কারণেই হউক এ কথা সত্য যে অনুশীলন না করিলে সাধারণতঃ আমরা বিদ্যা ও কর্মনৈপুণ্য ভুলিয়া যাই এবং অনুশীলনের দ্বারা শিক্ষার কার্য অগ্রসর হইতে থাকে এবং তৎবিষয়ের স্মৃতি স্থায়ী হয়।

যেহেতু অনুশীলনের অভাবে ধৃতি সম্ভব নয় সেইহেতু বালকবালিকাদিগকে এমন সব বিদ্যা, কৌশল ও নৈপুণ্য শিখিতে সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করিতে দেওয়া উচিত যাহা তাহাদের জীবনে সত্যই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবে এবং সেইজন্য সেইগুলি বারবার ব্যবহার করিবার দরকার হইবে। সেইজন্য প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে এমন সব জিনিষ শিখিবার জন্য রাখা হইয়াছে যাহার প্রয়োজন শিশুর বর্তমান ও পরবর্তী জীবনে বারবার ঘটিতেই থাকিবে (persistent life situations)। এই সব শিক্ষা হইবে শিশুর স্থায়ী জীবনসম্পদ। অবশ্য বিদ্যালয়ে আরও কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয় থাকে যেগুলি অল্পমেয়াদী কিন্তু যাহাদের সামাজিক মূল্য আছে। আভিনয়ের 'পার্ট' কেহ সারাজীবনের জন্য মুখস্থ রাখিতে চাহে না, সেইরূপ বিতর্ক সভার বিশেষ বক্তৃতা। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইগুলির আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তবে বলা যাইতে পারে এই সব অস্থায়ী অভিজ্ঞতার ফলে বিশেষ মনোভাব বা রসগ্রহণ করিবার স্থায়ী ক্ষমতা লাভ হইতে পারে। অভিনয় ও বক্তৃতার ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা জন্মাইতে পারে এবং ভবিষ্যতে অভিনয় দেখা ও বক্তৃতা শুনিবার স্পৃহা জাগে। এই সব ক্ষেত্রে মনোভাব ও অনুভূতিগুলি থাকিয়া যায় কিন্তু সাময়িকভাবে মুখস্থ করা জিনিষগুলি ভুলিয়া যাইতে হয়।

এতক্ষণ এই সূত্রের সাহায্যে আমরা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছি যে অনুশীলনের দ্বারাই শিক্ষা চলিতে থাকে এবং স্থায়ী হয়। তাহা হইলে অনুশীলন যত করা হইবে শিক্ষার পরিমাণও কি তত হইবে? দেখা গিয়াছে অনুশীলন ও শিক্ষার পরিমাণের মধ্যে এইরূপ অনুপাত নাই। আগ্রহ যত

বেশী হয় অনুশীলনের প্রয়োজন তত কমিয়া আসে। লেখাপড়া, গানবাজনা, হাতের কাজ সর্বক্ষেত্রেই করিতে-হয়-করিতেছি এইরূপ মনোভাব লইয়া দীর্ঘ সময় ধরিয়া অনুশীলন করিলেও যাহা না হয় আগ্রহভরে অল্প অভ্যাসেই তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী শেখা যায়। তাহা ছাড়া আগ্রহভরে যাহা শেখা হয় তাহার ধৃতিও দীর্ঘস্থায়ী হয়। সুতরাং অনুশীলনের সূত্রে যান্ত্রিকভাবে কার্যকরী নহে—প্রক্ষোভের প্রভাব ইহার উপর যথেষ্ট আছে। পুনরাবৃত্তিই শিক্ষার একমাত্র চাবিকাঠি নহে যদি না ইহার সহিত যুক্ত থাকে আগ্রহ ও উদ্দেশ্য।

এই কথা মনে রাখিলে শিশুদের প্রতি শিক্ষক সুবিচার করিতে পারেন। বানান, পাটীগণিত, ইতিহাস ভূগোলের তারিখ ও নাম মুখস্থ—এইগুলি শিশুদের দীর্ঘ সময় ধরিয়া মুখস্থ করিতে বাধ্য করিলে ফল সেই পরিমাণ হয় না। যতক্ষণ আগ্রহ থাকে ততক্ষণ অনুশীলনের সার্থকতা, আগ্রহ চলিয়া গেলে বিরক্তি ও অবসাদের সৃষ্টি হয় এবং সেইক্ষেত্রে হাজার অনুশীলনেও শিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলে না।

অর্থ না বুঝিয়া কিছু শিখিতে গেলে বহু অনুশীলনের দরকার হয় এবং তাহাও অনেকক্ষেত্রে তেমন কার্যকরী হয় না; কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয় যদি অর্থপূর্ণ হয় তাহা হইলে বেশী অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না এবং শিক্ষাও হয় পাকা। শব্দের বানান বা মূল গাণিতিক বিষয়গুলি শিশু যদি নানারূপ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া লাভ করে তাহা হইলে খুব কমই অনুশীলনের দরকার হয়। পড়িবার সময় শিশুরা শব্দের সহিত পরিচিত হয়। ঐ শব্দগুলি যদি তাহারা বাক্যে ও রচনায় ব্যবহার করে এবং পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অন্য বইয়ে ঐ শব্দগুলি ব্যবহৃত হইতে দেখে তাহা হইলে খুব অল্প অনুশীলনেই বিশুদ্ধ বানান শিখিতে পারে এবং এইভাবে শিখিবার ফলে আরও অনেক নূতন শব্দ বুঝিতে শেখে। পাটীগণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও অনুরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া বিষয়টিকে অর্থপূর্ণ করিয়া তুলিতে অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যায়।

সবশেষে এইকথা বলা যায় যে অনুশীলনের বারংবারতাই যথেষ্ট নহে।

ইহার সহিত থাকা চাই আগ্রহ, চাহিদা এবং অর্থবোধ ; তাহা হইলে অনুশীলন জ্ঞানার্জনকে সার্থক করিয়া তোলে।

প্রস্তুতির সূত্র (The law of readiness)।

আমারা যখন দেহ ও মনে কোন কিছু শিখিবার বা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকি তখন তাহা কার্যকরীভাবে শিখিতে বা করিতে পারে এবং মনেও সন্তোষ বা তৃপ্তি লাভ করি। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যখন দৌড়াইবার ভঙ্গীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে তখন সঙ্কেত পাইবামাত্র প্রত্যেকে তাহার চরমতম গতিতে দৌড়াইতে পারে এবং এইরূপ দৌড়াইতে পারায় তৃপ্তিও পায়। কিন্তু যখন কেহ অলসভাবে শুইয়া বা বসিয়া আছে তখন তাহাকে দৌড়াইতে বলিলে হয় সে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে বা বাধ্য হইয়া দৌড়াইতে হইলে তাহার পূর্ণ পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবে না এবং মনে মনেও অসন্তুষ্ট থাকিবে। অন্যপক্ষে, যখন খেলার মাঠে আসন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য খোলোয়াড়রা উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছে এমন সময় যদি ঝড়বৃষ্টির ফলে খেলা বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে সকলে মনমরা হইয়া বাড়ী ফিরিবে।

যখন কোন বালক বা বালিকা মন তৈয়ারী করিয়া পড়িতে বসে তখন সে পাঠে গভীরভাবে মনঃসংযোগ করিতে পারে, অন্য জিনিষে তাহার মন বিক্ষিপ্ত হয় না কারণ সে তাহার বিষয়ে তখন আগ্রহশীল থাকে। শিশুদের মনের প্রস্তুতি সৃষ্টি না করিতে পারিলে লেখাপড়া বা কাজকর্ম শিক্ষা দেওয়া ব্যর্থ হইয়া যায়।

সেইজন্য শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য শিশুদের মনে তাহাদের পাঠ শিখিবার জন্য উন্মুখতার সৃষ্টি করা। উন্মুখতার সৃষ্টি হওয়া মানেই সেই কাজটি করিয়া ফেলিবার আকাঙ্খা। কৌশলী শিক্ষক চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া শিক্ষণীয় বিষয়ে শিশুদের কৌতূহল উৎপন্ন করেন এবং কৌতূহল উৎপাদিত হওয়ার মানেই ঐ বিষয় জানিবার জন্য মন প্রস্তুত হইয়া যায়। অন্যদিকে, শিক্ষক যদি পাঠ্যপুস্তকের একটি পাঠের পর আর একটি পাঠ যান্ত্রিকভাবে পড়াইয়া যান তাহা হইলে শিশুরাও নিষ্ক্রিয়ভাবে গতানু-

গতিকতার সহিত তাহাদের পাঠ করিয়া যায়; কিন্তু তাহাতে শিক্ষার মধ্যে না থাকে প্রাণ আর না থাকে কার্যকারীতা।

প্রগতিশীল ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সমস্যা সমাধান এবং প্রকল্প পদ্ধতির সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক মানসিক প্রস্তুতি ও আগ্রহের সৃষ্টি করা হয়। গতানুগতিকভাবে কোন বিষয় শিক্ষা না দিয়া শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় এমন একটি শিক্ষামূলক পরিকল্পনার রূপায়ণ বা সমস্যা সমাধানের পরিস্থিতির রচনা করেন যাহা করিতে করিতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া যায়। এইরূপ কাজে ছাত্রছাত্রীদের স্বাভাবিক প্রেরণা থাকে এবং তাহাদের কাজ উদ্দেশ্যাভিমুখী হয়। কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের প্রস্তুতি বা আগ্রহ সমভাবে থাকে বা বাড়িতে থাকে। ভারতবর্ষের নদীর প্রকল্প করিতে গিয়া ভারতবর্ষের রিলিফ ম্যাপ এবং মডেল তৈয়ারী করে। নদীর উৎসতে জল ঢালিয়া নদীর সত্যকারের গতি তাহারা নিরীক্ষণ করে এবং নদী সংক্রান্ত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ-পরিচয় কাজ করিতে করিতে শেখে। গতানুগতিক বানাইয়া চিঠি লেখা অভ্যাস না করিয়া তাহারা সত্য সত্যই অন্য ব্যক্তিদের সহিত চিঠিতে যোগাযোগ স্থাপন করিতে উৎসাহিত হয়। ইহাতে যাহাতে তাহাদের চিঠি ভাল, নির্ভুল ও চিত্তাকর্ষক হয় সেদিকে তাহারা আগ্রহভরে মন দেয়—সত্য সামাজিক সম্পর্ক তাহাদের উদ্দীপ্ত করে।

শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠা ধরিয়া পড়াইলে ইতিহাস শিশুদের মনোরঞ্জন করিতে পারে না এবং তাহারাও ইতিহাসের কথা জানিবার জন্য উন্মুক্ত হয় না। কিন্তু শ্রাব্য ও দৃশ্য শিক্ষা সহায় (audio-visual aids), প্রকল্পের কাজ বা ঐতিহাসিক স্থানে ছাত্রছাত্রীদের ভ্রমণে লইয়া গিয়া ইতিহাস পাঠদানের সহিত ঐ সকল অভিজ্ঞতাগুলি সঙ্গীকৃত করা যায় তাহা হইলে ইতিহাস পাঠ করিবার জন্য তাহাদের মনে উন্মুখতা জন্মিবে। শিক্ষণীয় বিষয়কে এইভাবে সত্য ও বাস্তব করিয়া তুলিলে তাহারা যেরূপ আগ্রহশীল হইয়া উঠে পুস্তকের বিমূর্ত বিষয়ের দ্বারা সেইরূপ কখনও হইতেই পারে না। আর, একবার আগ্রহের সৃষ্টি হইলে তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করে ও অনেক বেশী শেখে।

ফলভোগের সূত্র।

সাধারণতঃ কোন কিছু শেখার ফলে আমরা সন্তোষ লাভ করি বা তৃপ্তি পাই তবে সেই শেখাটা স্থায়ী হয়। আর কিছু শেখার ফলে যদি আমরা দুঃখবেদনা বা অতৃপ্তি ভোগ করি তাহা হইলে সেই শেখার মধ্যে জোর থাকে না, তাহা ভুলিয়া যাইবারই সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং এই সূত্রটি শিক্ষার শেষে আমাদের মনের অনুভূতি বা প্রক্ষোভের অবস্থার সহিত সম্বন্ধিত। যখন শিশু প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারে তখন সে তাহার কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হয় এবং প্রশ্নরূপ উদ্দীপকের সহিত উত্তরূপ সাড়ার সম্বন্ধ দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। অন্য কথায় বলা যায়, এই কাজের দৈহিক ভিত্তি অর্থাৎ নার্ভ সংযোগ বা বন্ধন (bond) মস্তিষ্কে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয়। কিন্তু উত্তর যদি ঠিক না হয় তাহা হইলে মনের অসন্তোষ এই সংযোগকে মুছিয়া ফেলে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে তৃপ্তি বা সন্তোষ শিক্ষাকে করে দৃঢ় ও স্থায়ী এবং অসন্তোষ বা বিরক্তি শিক্ষাকে করে দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী।

তৃপ্তি ও বিরক্তি যে জিনিষ বর্তমানে শেখা হইতেছে তাহার উপর প্রভাব বিস্তার ত করেই, তাহা ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ আচরণ কিরূপ হইবে তাহা নির্ধারণ করে। যে সব পরিস্থিতি বা সমস্যা তাহাদের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল ভবিষ্যতে সেইগুলি তাহারা এড়াইয়া চলিতে চায় এবং যেইসব বিষয়ে তাহারা সন্তোষ ও তৃপ্তি পাইয়াছিল আগ্রহভরে তাহা আবার করিতে চায়। এইরূপে বর্তমান শিক্ষার ফলে যে সন্তোষ বা বিরক্তি উৎপন্ন হয় তাহা ভবিষ্যতের মানসিক প্রস্তুতি কিরূপ হইবে তাহা নির্ধারণ করে।

ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের কাজে সফল হইলে আনন্দ ও গৌরব অনুভব করে এবং সে কাজ আরও শিখিবার আগ্রহ তাহাদের বাড়িয়া যায় কিন্তু তাহাতে বিফল হইলে নিরানন্দ বোধ করে ও ক্ষুণ্ণ হয় এবং সে কাজ শিখিতে পরাঙ্মুখ হয়। আবার যে কাজে তাহারা সফল হয় সে কাজ তাহারা বার বার করিতে চায় এবং বিফলতায় সে কাজের আর অনুশীলন করে না।

এই সফলতা ও বিফলতার আলোচনায় একটি জিনিষ শিক্ষকের লক্ষ্য করিবার আছে। সাফল্য ও অসাফল্যের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও আচরণের উপর

প্রভূত প্রভাব আছে দেখিলাম। কিন্তু যেসব শিক্ষার্থীর বুদ্ধি ও সামর্থ্য বেশী তাহারাই সাফল্যের আশ্বাস বেশী করিয়া পাইবার সুযোগ লাভ করে এবং যাহাদের বুদ্ধি ও সামর্থ্য কম তাহাদেরই অসাফল্যের অগৌরব ভোগ করিতে হয় বেশী। ফলে বুদ্ধিমানরাই সাফল্যে আরও উদ্দীপিত হইয়া উঠে এবং অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা অসাফল্যের জন্য আরও পিছাইয়া যায়। আমাদের শিক্ষাদর্শন যদি এই হয় যে সকলকেই তাহাদের শক্তি সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষা দেওয়া তাহা হইলে প্রত্যেককেই সফল হইবার সুযোগ দিতে হইবে। কাজ ও সামর্থ্যের মধ্যে যদি সঙ্গতি থাকে তাহা হইলে প্রত্যেকেই তাহার কাজে সফল হইবে। শিক্ষক যদি সহানুভূতির সহিত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে তাহাদের সামর্থ্য অনুসারে কাজ বাছিয়া লইতে সাহায্য করেন তাহা হইলে ইহা সম্ভব হইতে পারে।

যে তিনটি সূত্রের কথা আলোচিত হইল তাহারা পৃথকভাবে আলোচিত হইলেও বস্তুতঃ তাহারা পৃথক বা পরস্পর নিরপেক্ষ নহে। তিনটিই পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধিত। শিক্ষা সন্তোষজনক হইলে এবং তাহাতে প্রস্তুতি থাকিলেই অনুশীলন সম্ভব হয়। আবার অনুশীলনের ফল আশানুরূপ ও সন্তোষজনক হইলে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কাজেও মানসিক প্রস্তুতি থাকে কিন্তু যে শিক্ষার্থী অসফল হইয়াছে তাহা সে পরে তাহার পাঠে আবার আরম্ভ করিতে চাহে না অর্থাৎ তাহার মানসিক প্রস্তুতি থাকে না। সেইজন্য বিস্তৃত শিক্ষার কাজ তখনই সম্ভব হয় যখন ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের কাজের মধ্যে পায় সফলতার তৃপ্তি এবং এই সন্তোষ ও তৃপ্তি আরও বেশী করিয়া পাইবার জন্য তাহারা তাহাদের পাঠ ও কাজ শিখিবার চেষ্টাকে ক্রমাগত বাড়াইয়াই দিতে থাকে এবং এইভাবে সফল অনুশীলনের দ্বারা সে শিক্ষনীয় বিষয়ে ক্রমশঃ অধিকতর দক্ষ হইয়া উঠিতে থাকে।

গৌণ সূত্রগুলি

একই বহিঃস্থ উদ্দীপকে বিভিন্ন সাড়ার সূত্র (The law of multiple response to the same external stimulus)

আমরা জানি যে বিড়ালকে কুকুরে তাড়া করিলে সে পলাইতে থাকে।

কিন্তু যদি বিড়াল দেখে যে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছাইবার পূর্বেই তাহার আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা হইলে পথে গাছ বা উঁচু জায়গা থাকিলে সে তাহার উপর চড়িয়া আত্মরক্ষা করে। সে সুযোগও যদি তাহার না থাকে এবং সে কোণঠাসা হইয়া পড়ে তখন সে আক্রমণের ভঙ্গীতে রুখিয়া দাঁড়ায়। এখানে কুকুররূপ একই উদ্দীপক বিড়ালের মধ্যে তিন প্রকার সাড়া উৎপন্ন করিল। অর্থাৎ, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কার্যকরী সাড়াগুলি বাছিয়া লইবার শিক্ষাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। ছেলে-মেয়েরা যখন উঁচু জায়গা হইতে ফল হাত বাড়াইয়া বা লাফাইয়া পাড়িতে পারে না তখন ঢিল ছুঁড়িতে বা গাছে উঠিতে শেখে। তাহাতেও কৃতকার্য না হইলে লগির ব্যবহার শেখে। ক্রমবিকাশের স্তরে প্রাণী যত উন্নত হয় উদ্দীপকে তাহার সাড়ার বৈচিত্র্যও বাড়ে ও শিক্ষাও বৈচিত্র্যপূর্ণ ও উন্নত হয়। শৃগাল আঙুর ফল পাইবার জন্য শুধু লাফাইতেই জানে ও না পাইলে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়।

প্রতিন্যাস, মনঃসংলগ্নতা বা স্বভাবের সূত্র (The law of attitude, set or disposition)

যে খুব গান ভালবাসে সে যখন জ্বরাক্রান্ত হয় তখন গানও তাহার কাছে বিস্বাদ লাগে। শোক ও দুঃখের সময় হাস্যরসের গল্প বা কবিতা লিখিতে শেখা বিরক্তকর। আবার, দেহ যখন সুস্থ ও মন প্রফুল্ল তখন বালিকারা নাচ শিখিবার জন্য উন্মুখ থাকে। যে বালকের বিদেশী ভাষা শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা আছে সে ঐ ভাষা শিখিবার জন্য প্রস্তুত থাকে ও সুযোগ পাইলেই আগ্রহভরে শিখে। সুতরাং, ব্যক্তির দেহ ও মনের অবস্থার উপর শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে। জ্বর অবস্থায় গান অরুচিকর হইলেও জ্বর হইতে কিভাবে আরোগ্যলাভ করা যাইতে পারে, জ্বরের উৎপত্তির কারণ কি, জ্বর প্রতিরোধের উপায় কি—যদি খুব বেশী জ্বর না থাকে তাহা হইলে রোগী এই সব বিষয় আগ্রহভরে শুনিতে ও শিখিতে চায়।

আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (The law of partial activity)

অরণ্যপথে বাঘের থাবার ছাপ দেখিয়া আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের

শিবিরে ফিরিয়া আসি বা সশস্ত্র হইয়া যাই। আকাশের কোণে কাল মেঘ দেখিলে দূরযাত্রা স্থগিত রাখি ; ঘরের ভিতরে নিরাপদ হইয়া বসি। এখানে বাঘ উপস্থিত নাই অথচ তাহার চিহ্ন দেখিয়াই বাঘ থাকিলে আমরা যেরূপ আচরণ করিতাম তাহাই করিলাম। সেইরূপ, ঝড়বৃষ্টি হয় নাই তবুও ঝড় বৃষ্টির চিহ্ন কালো মেঘ দেখিয়াই ঘরে আশ্রয় লইলাম যাহা ঝড়বৃষ্টি উপস্থিতিতেই সাজে। এই সূত্র প্রতিপন্ন করিতেছে যে সমস্ত পরিস্থিতিটি উপস্থিত না থাকিলেও তাহার গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমগ্র প্রতিক্রিয়াটিই সৃষ্টি করিতে পারে। বালক বালিকাদের এইভাবেই শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে পরিস্থিতির অংশই তাহাদের মধ্যে সমগ্র প্রতিক্রিয়াটি জাগাইতে পারে।

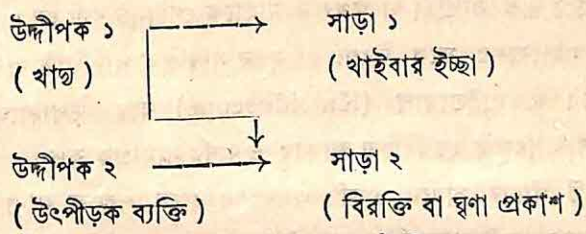
সদৃশীকরণ বা উপমানের সূত্র (The law of assimilation or analogy)

ছোট শিশু কুকুরকে ডাকিতে শিখিয়াছে। সে পরে ছাগল ও বিড়ালকে দেখিয়াও কুকুর বলিয়া ডাকে। ছাগল বা বিড়ালকে প্রথম দেখিলে সে হয়ত কিছুই বলিত না কারণ তাহারা তাহার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকিত। কুকুরের সহিত সে পরিচিত হইয়াছে এবং তাহাকে ডাকিতে শিখিয়াছে। এখন সে কুকুরতুল্য প্রাণী দেখিয়া কুকুরের সম্বন্ধে যেভাবে সে সাড়া দিয়াছিল সেইরূপ সাড়া এখানেও দেয় অর্থাৎ তাহাদেরও কুকুর বলিয়া ডাকে। সুতরাং এক পরিস্থিতিতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সদৃশ পরিস্থিতিতেও সেই প্রতিক্রিয়া উদ্দীপ্ত হয়। পটীগণিতে উদাহরণ দেওয়া হয় যাহাতে প্রশ্নের সদৃশ সমস্যায় ছাত্রছাত্রীরা একই সমাধানের উপায় ব্যবহার করিতে পারে। অবশ্য বুদ্ধি ও বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সদৃশীকরণও উন্নত ও সূক্ষ্ম হইতে থাকে। শিশু প্রথমে সব জন্তুকেই কুকুর বলিয়া সম্বোধন করিলেও পরে বোঝে এই সাদৃশ্যের মধ্যেও পার্থক্য আছে ; সেইজন্য তাহাদের নামও পৃথক। পার্থক্য-সূচক বৈশিষ্ট্যগুলি তখন সে লক্ষ্য করে। সুতরাং জন্তু কোন্ কোন্ সাধারণ বৈশিষ্ট্যে একশ্রেণীর এবং একশ্রেণীর হইয়াও বিভিন্ন জন্তুদের পরস্পরের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি কি তাহা অনুধাবন করিতে পারে। ঠিক

অনুরূপভাবে পাটীগণিতের প্রশ্নমালা বা ত্রিকোনমিতির অনুশীলনী ইত্যাদি মূলতঃ উদাহরণের মত হইয়াও সূক্ষ্মভাবে পৃথক থাকে। বালক বালিকাদের ইহাদের মধ্যে সদৃশীকরণ করিতে শিখিতে হয়। এক ক্ষেত্র হইতে অনুরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষা সঞ্চালন এই সূত্র অনুযায়ীই হয়।

অনুসঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (The law of associative shifting)

সাড়া এমন উদ্দীপকে সঞ্চালিত হইয়া যাইতে পারে যাহা তাহার স্বাভাবিক উদ্দীপক নহে। দুই উদ্দীপক যদি একত্রে বেশ কিছুকাল ধরিয়া বর্তমান থাকে তাহা হইলে সাড়ার এইরূপ সঞ্চালন সম্ভব হয়। খাইতে শিশুরা ভালই বাসে কিন্তু তাহাকে খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে যে ব্যক্তি তাহার উপর জবরদস্তী করে তাহার প্রতি বিরক্তি ক্রমে খাদ্যের প্রতি বিরক্তিতে পর্যবসিত হয় এবং তখন সেই ব্যক্তির অবর্তমানেও খাদ্যে বিতৃষ্ণা আসে।



উদ্দীপক ১ ও ২ সাড়া ১ ও ২ জাগায়; উদ্দীপকদ্বয় বহুকাল একত্রে থাকায় উদ্দীপক ১ সাড়া ২ জাগাইতে আরম্ভ করিল। এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করিব।

শিক্ষায় গেষ্টাল্‌ট্ মতবাদ।

থর্ণডাইকের সূত্রগুলি উদ্দীপক ও সাড়ার নার্ভীয় সংযোগের ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। গেষ্টাল্‌ট্ মতবাদীরা মনে করেন যে কোন বিশেষ উদ্দীপকের সহিত বিশেষ সাড়ার সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারাই শিক্ষার কাজ হয় না। তাঁহারা

বলেন উদ্দীপক সাড়া সংযোগ মতবাদে (connectionism) শিক্ষা কার্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখা হইয়াছে। তাঁহাদের মতে বিশেষ উদ্দীপক নহে, উদ্দীপক সমষ্টির একটি বিশেষ গড়ন বা বিন্যাসই শিক্ষাকার্য নির্ধারণ করে। শিক্ষার্থীর কাছে কোন একটি উদ্দীপকের কোন অর্থ হয় না কিন্তু উহা যখন উদ্দীপক সমষ্টির সঙ্গে থাকে তখন সব মিলাইয়া অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে অথবা একটি বিশেষ উদ্দীপকের যাহা অর্থ উহা যখন উদ্দীপক সমষ্টির মধ্যে থাকে তখন মিলিতভাবে অন্য অর্থ প্রকাশ করে। শিশুর কাছে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলির কোন অর্থ থাকে না কিন্তু তাহাদের সমষ্টি যখন তাহার চেনা জিনিষকে প্রকাশ করে তখন তাহা অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে। রাত্রির আকাশে একটি নক্ষত্র নহে, নক্ষত্রের সমষ্টি মিলিয়া সপ্তর্ষীমণ্ডল, কালপুরুষ ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছে। সঙ্গীতের সপ্তস্বর পৃথকভাবে কোন রাগ সৃষ্টি করিতে পারে না। বিশেষভাবে গ্রথিত স্বরসমষ্টি রাগ উৎপন্ন করে। সিনেমার পৃথক পৃথক ভাবে তোলা ছবিগুলি যখন একটি নির্দিষ্ট গতিতে পর্দায় ফেলা হয় তখন আমরা একটি অখণ্ড দৃশ্য প্রবাহই দেখি। এইভাবে পৃথক উপাদানগুলির সমন্বয়ে গড়িয়া উঠে এক সমগ্রতা বা অখণ্ডতা যাহাকে গেষ্টাল্ট্ বলা হয়। উপাদানের বিভিন্ন সমাবেশের ফলে উৎপন্ন হয় নূতন সামগ্রিক পরিস্থিতি বা নূতন অখণ্ড অনুভূতি। কেলাইডস্কোপ (Kaleidoscope) যন্ত্রে উপাদানের বিভিন্ন সমাবেশে আবির্ভূত হয় বিভিন্ন আকার ও বর্ণের সামগ্রিক রূপ।

একটি খাঁচার সামনে একটি ৩ বৎসর বয়সে শিশুকে আনা হইয়াছিল। খাঁচার মধ্যে একটি পুতুল ছিল এবং খাঁচার বাহিরে দুইটি কাঠি ছিল, কাঠি দুইটিকে জোড়া না দিলে পুতুলটিকে খাঁচার বাহিরে টানিয়া আনার উপায় ছিল না। প্রথমে সে একটি কাঠি পরীক্ষা করিয়া দেখিল এবং তাহা দিয়া পুতুলটিকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিল; উহাতে অসফল হইয়া সে দ্বিতীয় কাঠিটিও ঐরূপে ব্যবহার করিয়া দেখিল। তারপর সে বার বার বলিতে লাগিল, আমি পারিব না, আমি পারিব না।

তারপর খাঁচার উপরের বরগাগুলির ফাঁক দিয়া নীচের দিকে একটি কাঠি ঢুকাইয়া পুতুলের নাগাল পাইবার চেষ্টা করিল। না পারিয়া সে রাগে

গরগর করিতে লাগিল এবং বলিল, 'আমি পারিব না'। তিনবার পুতুলটিকে পাইবার জন্য সে ঐভাবে চেষ্টা করিল। শেষে সে বলিল, 'পুতুল চায় না যে আমি তাহাকে পাই'—এই বলিয়া সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিল।

চতুর্থবার তাহাকে ঐরূপভাবেই খাঁচার সম্মুখে রাখা হইল। প্রথম প্রথম তাহার আচরণ আগের মতই হইল। শেষে সে বলিল, 'আচ্ছা, একটি কাঠির সহিত আর একটি কাঠি জুড়িয়া দিয়া কি হয় দেখা যাক'। দুইটি কাঠিই সে তুলিয়া লইল, পরীক্ষা করিয়া দেখিল তারপর কাঠি দুইটিকে জোড়া দিয়া দিল এবং খুব সোৎসাহে 'বা! বা!' বলিয়া পুতুলটির দিকে জোড়া কাঠিটি বাড়াইয়া দিয়া পুতুলটিকে টানিয়া আনিল। এই পরীক্ষায় প্রথম সামগ্রিক পরিস্থিতির উপাদানগুলি ছিল খাঁচা, পুতুল ও দুইটি স্বতন্ত্র কাঠি। এই সামগ্রিক পরিস্থিতির মধ্যে শিশুর যাহা উদ্দেশ্য অর্থাৎ পুতুলটিকে পাওয়া তাহা সিদ্ধ হইতেছিল না এবং ফলে তাহার মনে অতৃপ্তি ছিল। পুতুলটি পাইয়া তৃপ্ত হইবার জন্য সে উপস্থিত উপাদানগুলি লইয়া চেষ্টার কসুর করে নাই। ইহাতে যখন সাফল্য আসিল না তখন তাহার মনে অন্য এক সামগ্রিক পরিস্থিতির উদয় হইল যাহাতে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিবার জন্য উপাদানের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করিতে হইল অর্থাৎ কাঠি দুইটি স্বতন্ত্র না রাখিয়া এক করা হইল। উপাদানের অন্যরূপ সমাবেশে নূতন এক সামগ্রিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইল এবং শিশুর কাছে তাহা অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিল অর্থাৎ সে বুঝিল এইরূপ সামগ্রিক পরিস্থিতিতেই সে তাহার অভীষ্ট সাধন করিতে পারিবে। এই যে একসঙ্গে কার্যকারণরূপ সমগ্রের মূর্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া মনে অকস্মাৎ উদয় হওয়া ইহাকেই গেষ্টাল্ট্ মতবাদীরা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিক্ষা বলিয়াছেন। এইভাবে পাটীগণিতের বা ধাঁধার সমস্যার সমাধান অকস্মাৎ মনে উদয় হয়।

আজকাল নানা বিষয়ের পৃথক পাঠদান না করিয়া তাহাদের একত্র করিয়া সামগ্রিকভাবে পাঠদান দেওয়া চলিতেছে। ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান সমাজবিদ্যায় সমন্বিত হইয়া গিয়াছে। জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং জড়বিজ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞানে পর্যবসিত হইয়াছে। কর্মের মাধ্যমে শিক্ষায় অনেক ছোট

ছোট শিক্ষার ক্ষেত্র একই পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। এই সকলই গেষ্টাল্ট্ মতবাদের যথার্থতা প্রতিপন্ন করে। খণ্ড হইতে অখণ্ড ও অংশ হইতে সামগ্রতায় প্রত্যাবর্তনই আধুনিক শিক্ষার প্রবণতা। মণিপুরী, কথাকলী ইত্যাদি কঠিন নাচ শিখাইবার সময় অনেকে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী আলাদা আলাদা করিয়া শেখান—ফলে গোটা জিনিষটার ধারণা না হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ নাচের ভঙ্গীতে আসিতে বেশ বেগ পাইতে হয়। সেইরূপ, সঙ্গীত শিক্ষাতেও আলাপবিস্তার তান-বাঁট-সরগম-অলংকার ইত্যাদি আলাদা করিয়া শিখাইলে অখণ্ড ভাব প্রকাশক সামঞ্জস্যপূর্ণ কলাকৃতিসহ সঙ্গীত পরিবেশন খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু গোড়া হইতে যদি গানের আলাপ-তান-বাঁট সমেত সমগ্র রূপটি শিক্ষার্থী শিখিতে পায় তাহা হইলে অনেক আনন্দের সহিত ও অর্থপূর্ণভাবে শিখিতে পারে এবং সঙ্গীতের ব্যঞ্জনাও স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়।

সেইরূপভাবে সমস্ত পাঠ্য বিষয়ে যেমন ভূগোল, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি সর্ব বিষয়েই যদি শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় বিষয়ের সামগ্রিক কাঠামো বা বিন্যাসের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা অংশগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝিতে পারে এবং উহাদের কি অর্থ তাহাও বুঝে।

প্রকল্প, সাঙ্গীকৃত শিল্পকাজ এবং সমস্যা সমাধান পদ্ধতিগুলির যথার্থ ব্যাখ্যা আমরা পাই গেষ্টাল্ট্ শিক্ষাসূত্রের মধ্যে। এইসব পদ্ধতিতে শিক্ষার একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র থাকে যেখানে ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের আগ্রহ ও চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন বিষয় শিখিয়া নিজেদের লক্ষ্যে পৌছায়। যে সব জিনিষ তাহারা শেখে তাহারা সেইগুলির অর্থপূর্ণ সঙ্গতি ও তাৎপর্য বুঝে। বিস্তৃত ক্ষেত্রে নানা জিনিষ শিখিয়া নানা জিনিষের পরস্পরের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া তাহারা সেইগুলিকে একটি সামগ্রিকতায় সংগঠিত করিতে শেখে। একটি পরিস্থিতিকে শিক্ষাপ্রদ করিতে হইলে নিম্নোক্ত অবস্থাগুলি বর্তমান থাকা চাই।

শিক্ষার্থীর মনে অভাববোধ বা অতৃপ্তি থাকা চাই তবেই সে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হইবে। অভাববোধ ও তৃপ্তি পাওয়ার পথে যেন একটি ফাঁক থাকে—এইটাই সমস্যা। এই ফাঁক যতক্ষণ না ভর্তি হয় ততক্ষণ

শিক্ষার্থীর মনে থাকে অস্বস্তি বা অতৃপ্তি (Tension)। সমস্যা সমাধানের উপকরণগুলি শিক্ষার্থীর গোচরে থাকা চাই। অন্তর্দৃষ্টির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের সঙ্গে সমস্যা সমাধান হইয়া যায় বা উক্ত ফাঁকটি ভর্তি হইয়া যায়। ইহার পরেই আসে তৃপ্তি। এইরূপ শিক্ষার লক্ষণ আকস্মিকভাবে সমাধানের সূত্র আবিষ্কার এবং অনুরূপ সমস্যায় পরে উক্ত সমাধানের উপায় সোজাসুজি ব্যবহার করিবার ক্ষমতা লাভ।

কন্‌ডিসনিং। (Conditioning)

থর্ণডাইকের অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্রে (The law of associative shifting) আমরা দেখিয়াছিলাম যে বিশেষ অবস্থায় আমরা এমন উদ্দীপকে সাড়া দেই যাহা সাড়ার স্বাভাবিক উদ্দীপক নহে। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক প্যাভলভ প্রথমে এই সত্যটি আবিষ্কার করেন। ইহাকে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার বলা যায় কারণ অভীষ্ট উদ্দীপকের সহিত সাড়ার সংযোগ সাধনের দ্বারাই শিক্ষার কার্য চলে এবং মানুষের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক আচরণ ব্যাখ্যা করা যায়।

এই কার্য কিভাবে সাধিত হয় কতকগুলি উদাহরণ দ্বারা দেখান হইল। শিশুরা যখন প্রথম শব্দ শেখে তখন শব্দের অর্থের সহিত মুদ্রিত শব্দের যোগাযোগ করাইয়া দেওয়া হয়, যেমন ঃ—

উদ্দীপক ১ (মুদ্রিত শব্দ)	→	সাড়া ১ (উদাসীনতা)
উদ্দীপক ২ (উচ্চারিত শব্দ)	→	সাড়া ২ (অর্থবোধ)
উদ্দীপক ১ + উদ্দীপক ২	→	সাড়া ২
উদ্দীপক ১	→	সাড়া ২

শিশুর কাছে মুদ্রিত শব্দের কোন তাৎপর্যই প্রথমে থাকে না, সে ঐ বিষয়ে উদাসীন থাকে। ধরা যাউক শব্দটি 'পেয়ারা'। উচ্চারিত 'পেয়ারা' শব্দরূপ উদ্দীপকে শিশু অর্থবোধরূপ সাড়া দেয় কারণ পেয়ারা কি সে

সম্বন্ধে তাহার পূর্ব হইতেই জানা ছিল। এইবার দুইটি উদ্দীপকই যদি এক সঙ্গে শিশুর কাছে উপস্থাপিত করা যায়, অর্থাৎ মুদ্রিত শব্দ 'পেয়ারা'র সহিত 'পেয়ারা' শব্দটি উচ্চারণ করা হয় তাহাতে সে অর্থবোধরূপ সাড়া দেয়। এইরূপ যদি বারংবার ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে পরে মুদ্রিত শব্দ 'পেয়ারা' দেখিলে অর্থবোধরূপ সাড়া দেয়; এখন আর 'পেয়ারা' র উচ্চারিত শব্দরূপ উদ্দীপকের দরকার হয় না। অন্য কথায় বলা যায় সাড়া ২ উদ্দীপক ২ হইতে উদ্দীপক ১এ সঞ্চালিত হইয়াছে। এখন সাড়া ২কে সঞ্চালিত সাড়া (condition response) বলা হয়।

অনুরূপভাবে দেখান যায়, যে বস্তুগুলি ভয়ের ছিল না তাহারা ভয়ের উদ্দীপকের সহিত যুক্ত হইয়া ভয়ের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। সাপ, বন্যজন্তু, বজ্র বিদ্যুৎ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদিতে এইভাবে ভয় সঞ্চালিত হয়। সেইরূপ আবার দেশপ্রেম, লোকসেবা, সৌজন্যপূর্ণ ভদ্র আচরণ ইত্যাদিও সঞ্চালিত সাড়া সাহায্যে হইয়া থাকে। শ্রেণীতে যে সব বিষয়ের পাঠদান হয় বা শিক্ষামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয় সেইগুলির প্রতি শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের মনে অনুকূল বা প্রতিকূল মনোভাব জন্মাইতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা যদি শিক্ষককে তাঁহার গুণের জন্য ভালবাসে তাহা হইলে তিনি যাহা শিখান তাহাতেও তাহাদের প্রীতি ও আগ্রহের সঞ্চার হয়।

উদ্দীপক ১	→	সাড়া ১
(বিদ্যালয়ের কাজ)		(উদাসীনতা)
উদ্দীপক ২	→	সাড়া ২
(শিক্ষক)		(ভালবাসা বা শ্রদ্ধা)
উদ্দীপক ১+উদ্দীপক ২	→	সাড়া ২
উদ্দীপক ১	→	সাড়া ২

আগের দৃষ্টান্তের মত এই দৃষ্টান্তটি আশা করি পাঠকপাঠিকা ব্যাখ্যা করিয়া লইতে পারিবেন। সেইজন্য শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব শিক্ষা পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং শিক্ষার কার্যকারীতা নির্ধারণ করে। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা পান। তিনি যাহা শিক্ষা দেন তাহার

সহিত তিনিও যুক্ত হন এবং তাঁহার প্রতি তাহাদের অনুকূল মনোভাব থাকায় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি তাহাদের অনুরাগের সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার কাজ কার্যকরীভাবে অগ্রসর হয়। অন্যপক্ষে, শিক্ষকের প্রতি ছাত্রছাত্রীরা বিরক্ত থাকে ও বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে ফলে তিনি যাহা শিখান তাহা তাহাদের মনে অনুরাগের সৃষ্টি না করিয়া বিতৃষ্ণা বা বিরক্তির সৃষ্টি করে এবং শিক্ষার কাজও সন্তোষজনকভাবে হয় না।

শিক্ষককে মনে রাখিতে হইবে যে সাড়ার সঞ্চালন যান্ত্রিকভাবে হয় না। সঞ্চালনের পিছনে চাহিদা ও আগ্রহ থাকা চাই এবং সঞ্চালনের ফল আশানুরূপ বা তৃপ্তিকারক হওয়া চাই। এই সকল অবস্থাগুলি না থাকিলে সঞ্চালন কার্যকরী হয় না।

শিক্ষার যে সূত্র ও মতবাদগুলি আলোচনা করা হইল সেইগুলি কোন একটি মানুষের শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারে না, যদিও শিক্ষার এক এক ক্ষেত্রে এক একটিকে প্রধান বলিয়া মনে হয়। মানুষের শিক্ষায় এই সবগুলিরই প্রভাব আছে। নৃত্য শিক্ষাকে উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। নৃত্য শিক্ষকের নৃত্যের আদর্শ দেখিয়া শিশুরা অনুকরণ করে কিন্তু প্রথমেই ঠিক ঠিক নৃত্যভঙ্গী আয়ত্ত হয় না। অনেক ভুলভ্রান্তি ও চেষ্টার পর নাচের কায়দাগুলি ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত হয়। এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে হঠাৎ যেন একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় বা বিশেষ বিশেষ নৃত্যভঙ্গীর কায়দা হঠাৎ যেন মানসনেত্রে স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং আর অধিক চেষ্টা না করিয়াই যথাযথ অঙ্গবিন্যাস করিতে পারা যায়। নাচের কায়দা ঠিক ঠিক হইলে মনে আসে তৃপ্তি। তখন সেই কায়দা বারবার অনুশীলন করিবার জন্য শিক্ষার্থী উন্মুখ হয়। নৃত্য শিক্ষা অভ্যাসগত হইয়া স্থায়িত্বলাভ করিলে নৃত্যকক্ষে বা নৃত্যের সহিত জড়িত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সংস্পর্শে আসিলেই নৃত্যস্পৃহা বা নৃত্যপ্রসঙ্গ মনে জাগিয়া উঠে। এইরূপ মানুষের অধিকাংশ শিক্ষা সম্বন্ধেই উপরের প্রক্রিয়াগুলি প্রযোজ্য।

পরিভাষা

অভীক্ষা	...	Test
অভিযোজন	....	Adaptation
অন্তঃক্ষেপ	...	Introjection
অবয়ব	....	Structure
অবটুগ্রন্থি	...	Ductlers gland
অনুষঙ্গ	...	Association
আত্মচেতন	....	Self-conscious
ইন্দ্রিয় স্থান	...	Sense organ
উদ্দীপক	....	Stimulus
উনমানসতা	...	Feeble mindedness
উনমানস	....	Feeble minded
ঋণাত্মক	....	Negative
কৌশল	...	Technique
গ্রন্থি	....	Gland
চালক নার্ভ	....	Motor nerve
চেষ্টা বেদন	...	Kinaes thesis
দুষ্ক্রিয়	....	Delinquent
ধারণা	....	Concept
ধৃতি	....	Retention
নঞর্থক	....	Negative
নার্ভীয়	...	Neural
নার্ভতন্ত্র	....	Nervous system
নাটন	...	Dramatization
পরিপক্বতা	...	Maturity
প্রক্ষোভিক	....	Emotional

প্রমাণ বিধান	...	Standardization
প্রত্যক্ষ	....	Perception
প্রতিরূপ	....	Image
প্রক্ষোভ	....	Emotion
প্রতীক	....	Symbol
প্রত্যাবৃত্তি	....	Regression
প্রকারণ	....	Variation
প্রকল্প	...	Project
প্রতিন্যাস	....	Attitude
প্রতিবর্ত	....	Reflex
প্রেষণা	....	Motivation
বিমূর্ত	...	Abstract
বোধ	...	Understanding
ভাব	...	Idea
শব্দজ্ঞান	....	Vocabulary
শারীর বৃত্তীয়	....	Physiological
শিক্ষা সহায়ক	....	Teaching aid
সমন্বয়	...	Co-ordination
সংবেদ-চেষ্টীয়	...	Sensory-motor
সংবেদন	....	Sensation
সমানুভূতি	....	Empathy
সদর্থক	....	Positive
সংজ্ঞাবহ নার্ভ	...	Sensory Nerve
সাফল্যাঙ্ক	....	Score
সামর্থ্য	....	Ability
সাড়া	....	Response
সিদ্ধান্ত	...	Theory

যাঁহারা শিক্ষার কার্যে ব্রতী হইতে চলিয়াছেন তাঁহাদের জন্যই বইটি প্রধানতঃ লেখা হইয়াছে। অনুরাগী সাধারণ পাঠক পাঠিকাও বইটি পড়িয়া শিশুপালন ও শিক্ষায় মনোবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগ বুঝিতে পারিবেন।

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও কার্যকরী অভিজ্ঞতার ফল বইটিতে স্থান পাইয়াছে। দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিকে শিক্ষক শিক্ষিকা কিভাবে শিক্ষার কার্যে পূর্ণ উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির সহিত কার্যকরীভাবে কাজে লাগাইতে পারেন তাহা প্রচুর দৃষ্টান্ত সহ সরল ও সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।